আঘাত

শক্তিপদ রাজগুরু

বসাক বুক ষ্টোর প্রাইভেট লিমিটেড
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

শক্তিপদ রাজগুরুর এই উপন্যাসটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

ধন্যবাদান্তে

প্রকাশক

আঘাত আঘাত
আঘাত আঘাত
আঘাত আঘাত
আঘাত আঘাত
আঘাত আঘাত

আ ঘা ত

মাটি এখানে নেই বললেই চলে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ গাং, ঘোলা নীলাভ জল, বিশাল নদীর বিস্তারে ঢেউগুলো যেন বিষধর সাপের ফনা তুলে ফুঁসছে, কাছে গেলেই মৃত্যুছোবল হানবে।

নদী ঠিক নয়, দক্ষিণ সমুদ্রের বিশাল থাবাটা যেন এই বনভূমিকে গ্রাস করে এর অন্ধিসন্ধিতে সেই থাবাটা বসিয়েছে।

এ নদী ঠিক নয়, সমুদ্রেরই অগ্রদূত, ধ্বংস দূত, এর জল লবনাক্ত, বিস্বাদ। এত জল তবু এর এক বিন্দু জলে কোন প্রাণ রস নেই যা মাটিকে করবে ফলবতী, শস্যশ্যামলা। বরং এর বিষাক্ত স্পর্শে সব সবুজই মুছে যায়। এক বিন্দু জল মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করতেও পারে না।

এ জলে আছে কামট, ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। তাজা রক্তের স্বাদে মাতাল হয়ে মানুষকে ছিঁড়ে খায়, কেউ গাং-এ পড়লে নিস্তার নেই। আছে কুমীর, নিমেষের মধ্যে ডাঙ্গার মানুষ, গরুকে ল্যাজের ঝাপটায় গাং-এ ফেলে অতলে টেনে নিয়ে যায়।

একমাত্র এই বিস্তীর্ণ গাং-এর বেড়াজালে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ম্যানগ্রোভের জঙ্গল— সেগুলোও নদীর বেড়াজালে ছোট বড় দ্বীপে পরিণত। নির্জন জনহীন সে সব দ্বীপে হরিণ, বনশুয়োর, গোসাপ, বিভিন্ন বিষধর সাপই টিকে আছে আর আছে, সুন্দরবনের অধিরাজ রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

এ তাদেরই রাজত্ব! মানুষকে প্রকৃতি এখানে বলে তফাৎ যাও, এ মৃত্যুপুরী, প্রাণের কোন সন্ধান এখানে করোনা। এ এক স্বতন্ত্র জগত!

ওই দ্বীপভূমিকে তবু প্রকৃতি সাজিয়েছে ঘন সবুজ হলুদে মেশা কেওড়া-গরাণ-পশর, বাইন-ধুন্দুল-সুন্দরী গাছে, আছে হলুদ রং-এর হিতালের ঘনবন, বাঘের নিভৃত বিশ্রাম ক্ষেত্র। এখানে রং এ রং মিলিয়ে হলুদ ছায়াকালো পরিবেশে বাঘের বসত, আছে গোলপাতার ঘন বেষ্টনী।

সৌন্দর্য্য! হ্যাঁ নিষ্ঠুর সৌন্দর্য্যে ভরা এই বিস্তীর্ণ গাং ঘেরা সুন্দরবন।

এককালে আজকের কলকাতার কাছ থেকেই ছিল এর বিস্তার। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পুবে আজকের বাংলাদেশের খুলনা ছাড়িয়ে বরিশালের প্রান্ত অবধি।

ক্রমশঃ মানুষ জমির সন্ধানে এই সুন্দরবন কেটে বসত, চাষের জমি বের করতে শুরু করলো।

অতীতে চা বাগান অঞ্চলে ইংরেজ নিয়ে গেছল বিহার, উড়িষ্যার মালভূমি অঞ্চল থেকে আদিবাসীদের, তারা আসাম তরাই অঞ্চলে বন্যজন্তু, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের সঙ্গে লড়াই করে ইংরেজদের জন্য বন কেটে চা বাগান বানিয়ে তাদের রোজকার, প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল।

তেমনি তখনকার দিনে জমিদাররাও বিহারের মালভূমি থেকে আদিবাসীদের দলে দলে এনে সুন্দরবনের ঘন জঙ্গল কেটে নদীতে বাঁধ দিয়ে— সারা দ্বীপভূমিকে বাঁধের বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে বসত—ধানক্ষেত বানিয়ে তাদের জমিদারীর পাট পত্তন করেছিল।

ধীরে ধীরে বনের অনেক অংশ কেটে, নোনা গাং-এর জল আটকাবার জন্য বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘের বাঁধ দিয়ে বসত করে চাষ আবাদ শুরু করে।

তবু বন্যজন্তুর আক্রমণ, সাপের কামড়ে মৃত্যু, বান, কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের হাতে মরা, গাং-এ নৌকাডুবিতে মরা এসব ছিল এদের জীবনের অঙ্গ। মৃত্যু এখানে সর্বত্র ছড়ানো, জলে স্থলে চারিদিকেই।

ফল ফসলের নিশ্চয়তা নেই, এখানের সব গাং-এ দিনে দুবার জোয়ার আসে, সমুদ্রের জল মারমুখী হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠে এখানে হানা দেয়, সেই প্রবল বিষাক্ত নোনা গাং-এর তোড়ে ঘেরিবাঁধও মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যায়, সবুজ ধানক্ষেতে ঢোকে সমুদ্রের অভিশাপ হয়ে ওই নোনা জল, সব শেষ।

তারপর অনাহার, উপবাস।

একমাত্র উপায় নদীতে মাছ ধরা, মাছ এখানে প্রচুর। সে সব মাছও যায় দরিদ্র জেলেদের জাল থেকে আড়তদার মহাজনদের কবলে। এরা পায় সামান্যই আর লাভের সিংহভাগই যায় মহাজনের কবলে।

নদীতে ডোবে এরাই, বনে মহাজনের হয়ে কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের থাবায়, সাপের ছোবলে মরে এরাই, উপবাসে অভাবে মরে এরাই।

বলে, এদের চোখের জলেই নাকি গাং-এর পানি নোনা হয়ে গেছে।

তবু মানুষ এখানে বাঁচে, লড়াই করে বাচার চেষ্টা করে, এর মাঝেও গড়ে তোলে বসত, গঞ্জ।

সুন্দরবনের ওই জঙ্গল অঞ্চলকে বলে বাদা, কথাটা বোধহয়, এসেছে আবাদ থেকেই। শ্যামপুর গঞ্জ এমনি করে কোন কালে শ্যামবিহারী নামে কোন জমিদারের চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল।

আজ সেই জমিদারী প্রথা আর চালু নেই।

স্বাধীন ভারতে জমিদারদের অপমৃত্যু ঘটেছে, তবে জমিদারের জায়গাটা সমাজে

শূন্য থাকেনি। সেখানে এসে গেড়ে বসছে নূতন গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ী সমাজ, এসেছে সরকারী কর্মচারীর দল, যারা এই বাদাবনে নিজেদেরই জমিদার কেন আরও বড় কেউকেটাই মনে করে।

রতন নস্করের ঠিকুজী কুষ্ঠি অবশ্য শ্যামপুর গঞ্জের পুরোনো দু'একজন মানুষ কিছুটা জানে। রতনের পিতৃদেব এই আবাস পত্তনের সময় জমিদারের গোমস্তা হয়ে এসেছিল। রতনের পিতৃদেব তখন থেকেই তার বংশধরের জন্য কিছু সংস্থান করার জনাই দুহাতে লুণ্ঠন পর্ব শুরু করেছিল। কাঠ, মজুরী সবকিছুই। গঞ্জের বেশ কিছু সরেস জমিও রেখেছিল বেনামী করে, আর রতনের পিতৃদেব যুধিষ্ঠির তখন থেকেই এখানে কায়েম হয়ে ছোট করে মাছের আড়ত চালু করেছিল।

মহাজনরা এখানকার জেলেদের কিছু খোরাকীর টাকা দাদন দিত, দরকার মতো নৌকা, জালও দিত। তারা মাছ ধরে, এনে যুধিষ্ঠিরের আড়তে দিত। মাছের দাম থেকেই দফায় দফায় দাদনের টাকা, নৌকা ভাড়া, জাল ভাড়া বাবদ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকা জেলেদের হাতে দিত।

যা পেতো তারা, তা সামান্যই, কিন্তু এ ছাড়া আর করার কিছুই নেই তাদের, তাই মুখ বুজে কাজ করতো তারা।

ফুলে ফেঁপে উঠেছিল পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির। বনে কাঠের অভাব নেই, বসত যেখানে শেষ হয়েছে কোন গাং-এর ধারে, ওপারেই শুরু হয়েছে আদিম সুন্দরবন। সেখানে কাঠের অভাব নাই।

বাইন গাছের গুড়ি থেকে ফেড়ে হয় চায়ের পেটি, গরাণ কাঠের ছালও দামী, ট্যানারিতে ভালো দামে বিকোয়, কাঠ এর দাম তো আছে। ধুন্দুল কাঠ দিয়ে খেলনা, পেন্সিল এসব তৈরী হয়। সুন্দরী কাঠের খুটিও দামী। কলকাতার বাজারে পাঠাতে পারলেই নগদ টাকা, হাজার হাজার টাকা।

যুধিষ্ঠির এবার বড় বড় দুহাজার মণি নৌকা বানিয়ে লোকজন এর দল তৈরী করে বন থেকে কাঠ কাটাই এর ব্যবসাও শুরু করে।

এ কঠিন কাজ।

ক্রমশঃ তস্য সুপুত্র রতনও দেখে বাবার এই সাম্রাজ্য। বাদাবনেও টাকা উড়ছে। রতন অবশ্য তখন স্কুলে পড়ে।

সারা আবাদ অঞ্চলে গঞ্জ তখন শুধু ছিল হাতেগোনা। মানুষ যেখানে জীবিকার লড়াই-এ দিনরাত ব্যস্ত, সেখানে এইটুকু বাচ্চাকেও সেই বাঁচার লড়াই-এ সামিল হতে হয়। তাই পড়াশোনা তাদের কাছে বিলাসিতাই। আর স্কুলও সহজলভ্য নয়।

সেদিন ওই লাটের জমিদার মশাই-ই গঞ্জের উন্নতিকল্পে স্কুলও তৈরী করেন;

তখন ছিল মাইনর স্কুল। পরে অবশ্য এখন গঞ্জের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্কুলেরও উন্নতি হয়েছে। এখানের হাইস্কুলের নাম সারা আবাদে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন সরকার থেকেই স্কুল চালানো হয়, অবশ্য মাতব্বরী করে ওই যুধিষ্ঠিরের সুপুত্র রতন নস্করই।

নিজে অবশ্য ওই মাইনর পাশ করতে গোঁফ দাড়ি গজিয়ে ফেলেছিল। তার আমলেই মাটির স্কুলের খড়ের চাল এসব পড়ে গিয়ে পাকা দালান হয়েছিল, স্কুলের পদোন্নতি ঘটেছিল।

রতন মাইনর অবধি পড়েই ক্লান্ত হয়ে পড়া ছেড়েছিল। যুধিষ্ঠির বলে— এক এক কেলাসে তিনবছর করে পড়ছিস রতন, পোক্ত হয়ে উঠেছিস বাপ, যা শিখেছিস ওইই ঢের। ওতেই করে খেতে পারবি। এবার ব্যবসা বাণিজ্য দ্যাখ—

রতন অবশ্য এটা ভালোই বোঝে।

ব্যবসা তার রক্তে আর ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। স্বাধীনতার মধুটুকু লোটার মত বুদ্ধিও তার যথেষ্ট। তাই সে অঞ্চলের পঞ্চায়েতের ভোটে দাঁড়ায়। সারা এলাকায় গ্রামে-গঞ্জে তার চর অনুচরও আছে। এরমধ্যে রতনও শিখেছে কি করে সাধারণ মানুষকে চমকাতে হয়, মিথ্যা কথা গুছিয়ে বলতে হয়।

রতন বুঝেছে বাবাদের দিন বদলেছে' জমিদার আর নেই। অথচ সমাজের মধুলোভী মানুষ থাকবে চিরকালই, শাসন করার মত একটা শ্রেণীও তৈরী হবে। তাদের হাতে সরকার কিছু ক্ষমতাও দেবে।

শুধু ব্যবসা করলেই চলবে না, সেই ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তাই রাজনীতি, ভোট এসবে থাকতেই হবে।

যুধিষ্ঠির তখন প্রায় অবসর নিতে বসেছে, বয়সও হয়েছে, ইদানীং ধর্মেও মতি হয়েছে তার। তিল তিল করে জমিয়ে সে অর্থের, সম্পদের তাল করেছে, বিরাট ব্যবসা গড়ছে।

এখন হরি মন্দির তৈরী করে নামগান করে অতীতের পাপের যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে।

রতন তখন ভোট যুদ্ধে নেমেছে। আবাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়, নৌকাই এখানের যাতায়াতের প্রধান বাহন, নিজেরই বহু নৌকা, ডিঙ্গি, পানসী রয়েছে।

তবু মাঠে গ্রামে যাতায়াত করার জন্য একটা ঘোড়া কেনে রতন, এতে সুবিধা হবে যাতায়াতের।

গণেশ যুধিষ্ঠিরের আমলের পুরোনো চাকর, কর্তাবাবুর কাছের মানুষ। যুধিষ্ঠির অবশ্য রতনের এই ভোট যুদ্ধে নামা পছন্দ করেনি।

বলে ছেলেকে—ব্যবসা বাণিজ্য করছিস তাই কর। আবার ভোট ফোট কেন? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবি?

রতন বলে,

—ও তুমি বুঝবে না বাবা, দিন বদলেছে, এখন কোন দলের মাথা না হতে পারলে কেউ তোমাকে মাথায় তুলবে না। তাই ভোটে জিততেই হবে, এতে দেখবে আখেরে লাভই হবে।

লাভ হবার কথা শুনে বুড়ো কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কারণ জীবনে সে ওই লাভটাকেই চিনছে ভালো করে। তবু মন তার সায় দেয় না ওই সব ব্যাপারে। কিন্তু ছেলে এখন লায়েক হয়েছে। তাকে বাধা দিলেও শুনবে না, যুধিষ্ঠির অবশ্য ছেলের বিয়ে থা দিয়েছে স্কুলে পড়ার সময়ই। ঘর সংসার করছে রতন, ব্যবসাতেও লাভ করছে, তবুও দু চারটে কথা তার কানে আসে ছেলের সম্বন্ধে সেগুলো খুব ভালো কথা নয়, কিন্তু ছেলেকে কিছু বলতেও পারে না।

একটু ম'কারান্ত দোষ বাদাবনের পয়সাওয়ালা মানুষদের ইদানীং যে হয়েছে তা জেনেছে যুধিষ্ঠির। দিন বদলেছে— তাদের সময় এসব চরিত্র দোষ-টোষ ছিল না। এসব যুগেরই হাওয়া।

সেদিন যুধিষ্ঠির মন্দিরে বসে আছে, গণেশ এসে খরব দেয়,

—বাবু! দাদাবাবু ঘোড়া কিনেছে। অনেক টাকা দাম গো।

টাকার কথা শুনে চমকে ওঠে যুধিষ্ঠির।

—সে কি রে? এতগুলো টাকা জলে দিল রতন?

রতনও এসে পড়ে। বাবার কথায় বলে সে,

—জলে দিই নি বাবা। এখানে ওখানে যাতায়াত করতে হবে।

বাবা শুধায়— কত পড়লো?

রতন বলে— আড়াই শো টাকা। তারপর খড়, ভূষি, ছোলা খেতে দিতে হবে।

চমকে ওঠে যুধিষ্ঠির—এ্যাঁ, আড়াই শো টাকা!

তারপরই মনে পড়ে যুধিষ্ঠিরের অতীতের সেই সংগ্রামের দিনগুলো! বন কেটে আবাদের দিন, নিজে গাছ কেটেছে, ঘাড়ে করে বয়েছে। মাটি কেটেছে—বয়েছে ঝুড়ি, ঝুড়ি।

বলে, রতন—আমাকে দিনে একপো করে ছোলা ভিজেই না হয় দিতিস বাপ, আমিই ঘাড়ে করে তোকে এ বাদায় সে বাদায় ঘুরতাম। বোঝা বওয়ার দাগ এখনও কাঁধে ঘ্যাঁটা হয়ে পড়ে আছে আমার।

রতন বলে—ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন দিন বদলেছে।

যুধিষ্ঠিরের মনে হয় দিন বদলেই গেছে একেবারে।

যুধিষ্ঠির অবশ্য সেটা নিজেই বুঝেছে। তখন গঞ্জে আর কত মানুষ ছিল? নদীর ধারে, ভেড়ির পাশে হাটতলা। তখনকার দিনে বাবুরা বাঁধ বরাবর শিরীষ গাছ লাগিয়েছিল। গাছপালা সবুজ তেমন কিছুই হয় না নোনা মাটিতে। এই শিরীষ গাছগুলো তবু বেশ নধর হয়ে বেড়ে উঠেছিল, দু চারটে সামান্য দোকান, আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু বসতি। তখন ক্যানিং স্টেশনে যেত হতো ছোট—গাং থেকে বড়—গাং মাতলা বিদ্যা নদী ধরে। বিশাল নদী, নৌকা দুলতো মোচার খোলার মত।

এদিকে বসিরহাট, সেখানেও বড় দুর্বার নদী। তবু প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হতো। বর্ষার সময় এইসব গাং হয়ে উঠতা দুর্বার। তুফান শুরু হতো। আর গ্রীষ্মে কাল বৈশাখীর ঝড়ে কত নৌকা তলিয়ে গেছে বিদ্যা—মাতলা—রায়মঙ্গল বা আরও কত নদীতে তার সীমা সংখ্যা নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে যেতো হতো মানুষকে, তাই সভ্যজগতের সঙ্গে এর যোগসূত্রও থাকতো কম।

এ যেন রহস্যাবৃত এক জগৎ।

এখন? এখন লঞ্চ চলাচল করে নিয়মিতভাবে। শ্যামপুরের গঞ্জে এখন সরকার থেকে জেটিও গড়ে দিয়েছে, পাকা জেটি। লোকজন মালপত্র অনায়াসে আসা যাওয়া করে।

সকালে বের হয়ে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ক্যানিং স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে কলকাতায় গিয়ে জরুরী কাজ সেরে সেইদিন শেষ লঞ্চেও ফেরা যেতে পারে রাত্রে।

যুধিষ্ঠির এসব দেখে যেতে পারেনি।

এসব হয়েছে স্বাধীনতার পর— এই রতনবাবুদের কালে।

রতন নস্করের দূরদৃষ্টি ছিল, তার সঙ্গে ছিল বাবার ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর ওই বিনয়! রতন জোরে কথাটি বলে না। এমনিতে খুবই মিষ্টভাষী। এত বড় ব্যবসা, এত টাকা—নৌকা, কাঠের ব্যবসা, কলকাতার কাছে করাতকল, আরও অনেক ধান্দা, এখানের সে এখন বাঁধা অঞ্চল প্রধান। তবু বিনয়ী ভাবটা মুছে যায়নি।

অবশ্য গোলাবী বলে—ওসব ঢং গো। গেরস্থের বেড়াল দ্যাখোনি? যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না। ঝিম মেরে বসে থাকে যেন তপ্যিসে করছে। কিন্তু ইন্দুরের গন্ধ পেলেই লাফ মারে, ওই রতন নস্করও তাই গো।

গোলাবীকে শুধু এই শ্যামপুর গঞ্জ কেন এই এলাকার অনেকেই চেনে। ওর

স্বামী কুড়োন রতনের কাঠ ব্যবসার নৌকাতে ছিল বাওয়ালী। সতেজ পুরুষ, তেমনি যোয়ান।

এই গাং-এর মর্জি মেজাজ ছিল তার নখদর্পণে। হালে বসলে দু'হাজারমণি বোঝাই নৌকাখানাও বুঝতো একজন মরদ বসেছে হালে। গাং এর দুর্বার ঢেউ—ফোঁসানি তার কাছে তুচ্ছ, তার হাতের মোচড়ে নৌকাখানা ঢেউ-এর মাথায় উঠে যেন পা দিয়ে ঘা মারে ঢেউকে।

বাদাবন, মা বনবিবির আটন।

খালে থাকতো কাঠমহাজনদের ছোট বড় নৌকা বহর। ফরেস্টের বাবুরাও থাকতো ফরেস্টের পানসী বোটে। বনে নেমে গাছে গাছে হাতুড়ি মেরে দাগ দিত, কেবল সেইসব গাছই কাটা যাবে, বনের বিবাক কচিকাঁচা ভালো গাছ কাটার নিয়ম নাই।

অবশ্য রতন নস্করের নিয়ম আলাদাই। কারণ বনের বাবুদের অফিস ওই শ্যামপুর গঞ্জের একদিকে।

বিরাট এলাকা জুড়ে বেশ গাছগাছালি দিয়ে সাজানো। কৃষ্ণচূড়া— গুলঞ্চ, জবা নানা ফুলে সাজানো বাগান, ওদের এলাকায় একটা মিঠে জলের পুকুর, তার পাড়ে বনবাবুদের কাঠের মাচার উপর সাজানো বাংলো কয়েকটা, ওদিকে গার্ড-বোট-ম্যানদের কোয়ার্টার।

কাঠ মহাজনদের ওই ফরেস্ট অপিস থেকে দাগ, কাঠ কাটাই— এর অনুমতি নিতে হয়। কে কত মণ কাঠ কাটবে, নৌকার মাথানে সাদা দাগ দেওয়া থাকে, সেই অবধি নৌকা জলে ডুবে থাকলে বোঝা যাবে হাজার—দেড় হাজার— কি দু হাজার মণ কাঠ আছে। সেই দেখে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে পয়সা দিতে হয়।

আর গাছ তো বনবিভাগের বিট বাবুরাই মার্কা দিয়ে দেয়—ঠিক মার্কা মতো কাঠ কাটা হয়েছে কিনা তাও দেখা হয়, যাতে যত্রতত্র ভালো গাছ কেটে বন নষ্ট না করে কেউ।

এসব আইন অন্যদের জন্য।

রতনবাবু গঞ্জের মাথা, অঞ্চল প্রধান, ধনী লোক, বনবাবুদের রতন খুশি করতে জানে। কোন কাঠ মহাজনের উড়িয়া কুলি বাঁকা নিরেস গাছ নিতে নারাজ। সে ওই দুর্গম বনে বনবাবুকে দেশজ ভাষায় বলে

—বঙ্কা গাছ কাটিব কাঁই? মোর টঙ্কা কি বঙ্কা অছি?

তবু সেই বাঁকা নিরেশ গাছই তাকে নিতে হয়, কিন্তু রতনের লোকজনরা সেরা গাছই পায় আর তাদের ওজনের ও মারপ্যাঁচ আছে।

ওই কুড়োনই শির মাঝি। বাদাবনে তার ভরসাতেই আসে ওই বাওয়ালির দল। সন্ধ্যার পর নৌকা বসতে ফেরে তারা। সকালে ওই খালের বুকে ভেড়ানো নৌকা থেকে ভাত আর আলু লঙ্কার ঝোল খেয়ে বের হয়ে যায় ছোট ডিঙ্গিতে, বনের গভীরে ছোট ছোট খাল বেয়ে কাঠ কাটে, সঙ্গে দুপুরের ভাত, হাড়িতে খাবার জল নিয়ে যায়। শেষ দুপুরে সূর্য বনের মধ্যে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ডিঙ্গি বেয়ে ফিরে আসে খালের নৌকা বসতে।

মানুষের বসতি থেকে দূরে বহুদূরে গহন অরণ্যের বুকে আদিম অন্ধকার নামে, বাতাসে ওঠে বড় নদীর মত্ত গর্জন, সমুদ্রের ধার কাছ হলে সমুদ্রের গর্জন জাগে, তার মাঝে ভেসে আসে আর্ত হরিণের আর্তনাদ, বাঘের গর্জন, সেই গর্জন বাতাসে, নদীর বুকে স্পন্দিত হয়ে আরও সোচ্চার আরও ভীষণতর হয়ে ওঠে।

—হুঁসিয়ার! বড় শিয়ালের হানা পড়েছে ঘেরে!

অর্থাৎ মানুষের সন্ধান পেয়েছে সুন্দরবনের বাঘ।

তবু তাদের বনের মধ্যে যেতে হয়। বন কাটাই করার সময় বিদ্যুৎ শিখার মতো হলুদ কালো ডোরার একটা ঝলক, তারপরই শোনা যায় অন্যদের ভীত আর্তনাদ!

—বদনাকে নে গেছে গো!

অর্থাৎ বদন নামের কোন হতভাগা বাঘের মুখে গেছে, ওরা চেষ্টা করে গোল পাতার মশাল জ্বালিয়ে, পটকা ফাটিয়ে ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘের মুখ থেকে দেহটাকে ছিনিয়ে নিতে।

বাঘও নিপুণ, চকিতের মধ্যে ঘাড়ে ধরে শিকারের তারপর সুন্দরবনের মাটিতে গজানো নানা গাছের নাসিক্যমূলের তীক্ষ্ণ ফলার উপর দিয়ে দেহটাকে টেনে নিয়ে যাবার সময়ই ফালা ফালা হয়ে যায় দেহটা। ফলে বাঘে যাকে ধরে, খুব ভাগ্যজোর না হলে সে আর বেঁচে ফেরে না। তবু সঙ্গীরা দেহটা আনার চেষ্টা করে।

কখনও পারে, তখন তার কবর দেয় না হয় দাহ করে ওই বনের সহযাত্রীরা। না হয় চলে যায় বাঘের পেটেই, তবুও ঐ সঙ্গীরা কাছের কোনও গাছে একটা ছেঁড়া মাদুর, না হয় সতরঞ্চির টুকরো, একটা লুঙিতে কিছু চাল বেঁধে কাছের গাছের ডালে বেঁধে রেখে আসে। হারানো বন্ধুর জন্য তারা এই আদিম অরণ্যে রেখে গেল শয্যা-বস্ত্র-অন্ন।

আর অন্য কোন নৌকার যাত্রীরা সুন্দরবনের যত্রতত্র নির্জনে কোন গাছের ডালে ঝোলানো পুঁটুলি দেখে হুঁশিয়ার হয়, এখানে বাঘে কাউকে মেরেছে।

বনের নীরব নিভৃতে ওই চিহ্ন অন্যদের মনেও আনে আতঙ্কের আভাষ।

আদিম রাত্রির রূপও এখানে ভয়ানক, বাওয়ালিরা তাই রহস্যময় তুক্‌তাক্, দেহবন্ধন, নানা মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাদের রক্ষাকর্তা এই বনে বাবা দখিণ রায়, আর মা

বনবিবি। তার নাম করেই বনে ঢোকে তারা।

কখনও ফেরে, কখনও যায় বাঘ না হয় সাপের মুখে, কখনও ডোবে গাং-এর অতলে।

ওই গোলাবীরও তাই ভয় হয়!

কুড়োনকে বলে, বাদাবনে না গে ইখানের অন্যকোন কাজই করো, ধানকলে না হয় হাটে।

কুড়োন বলিষ্ঠ হাতে দু হাতে গোলাবীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে

—তুই কি চাস তোর মরদ শির বাওয়ালি গিরি ছেড়ে ওই ধান কলে ধানের বস্তা বইবে, হাটতলায় ভ্যান রিকসো চালাবে? আরে বাদাবনের শের এই কুড়োন দফাদার, হাতের মোচড়ে আড়াই হাজার মণি নৌকাকে তুফান কাটিয়ে আনে, ওই গাং— ওই বনের বাঘ অবধি চেনে কুড়োনকে, তুই ডরাস কেনে?

রতনও কুড়োনের কাজে খুবই খুশি। সে থাকলে ঠিক সময়মত বন কাটাই হবে—মালও আসবে নৌকা বোঝাই, তাই রতন নস্করও মাঝে মাঝে আসে কুড়োনের বাড়িতে।

নদীর ধারে ভেড়ির নীচে বসতির এদিকেই ঘর বেঁধেছে কুড়োন, লোকটার অন্যদের মত বদখেয়াল নাই। বলে,

—লিশা কি করবো রে গোলাবী, তুর গোলাবী লিশাতেই ডুবে আছি, কি লেশায় যে ফেললি রে—

গোলাবীর সারা মনে জাগে খুশির সাড়া।

বলে গোলাবী— বড় ভয় হয় গো?

—কেনে? কুড়োন ওকে তার বিশাল বুকে টেনে নেয়।

গোলাবী বলে—ভয় হয় গো, এত সুখ কি সইবে?

হাসে কুড়োন—পাগলী!

বাইরে কার ডাক শুনে চাইল গোলাবী,

—কুড়োন আছিস? কুড়োন?

ঢুকছে স্বয়ং রতন নস্কর, সঙ্গে তার অনুচর কপিল; কপিলের ইয়া ঝাকড়া চুল, চোখ দুটো ইয়া ভাটার মতো, লোকটার চেহারাও অসুরের মতো, আর অন্ধকারে মিশে যায় এমনি ভূষোকালির মত গায়ের রং।

গোলাবীও অবাক হয় রতনবাবুকে এখানে দেখে।

রতন নস্কর এর আগে এদিকে বড় একটা আসেনি, কুড়োন বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে জানে। এর মধ্যে ঘরটাকে সাজিয়েছে গোলাবী, নিজে নিকিয়ে পদ্মফুল

এঁকেছে, একটা গরুও কিনেছে, গঞ্জে দুধও ভালো দামে বিকোয়।

উঠানের একপাশে কিছু লাউগাছ-শাক-বেগুনও লাগিয়েছে, গড়েছে একটা তুলসী মঞ্চ, সব দেখে রতন।

এর মধ্যে কুড়োন একটা মোড়া এনে দেয়— বসেন।

রতনের নজর থেমে যায় গোলাবীর উপর! দেখছে রতন, লোকটার চোখ দুটো কি আদিম লালসায় চক্ চক্ করে ওঠে! অবশ্য রতন নস্কর গিরগিটির জাত, সহজেই সে প্রয়োজন মত রং বদলাতে পারে। তার রাগেরও যেমন বহিঃপ্রকাশ নেই, তেমনি আনন্দেরও। ওটা ওর মনের গভীরেই থাকে।

রতন বলে—বাঃ! সুন্দর ঘর বানিয়েছিস কুড়োন।

কুড়োন বলে—আমি তো বাইরে বাইরেই থাকি গো, যা করার ওই গোলবীই করে মালিক।

রতন মন্তব্য করে—লক্ষ্মী বউ।

গোলাবী এর মধ্যে সামলে নিয়েছে, হাজার হোক মালিক, অন্নদাতা, তাই প্রণামও করে, রতন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ওর নরম নিটোল পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—থাক, থাক!

মাঝে মাঝে রতন দরাজ দিল হয়ে ওঠে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে! না হলে এক পয়সাও সে কাউকে ছাড়ে-না, বরং অন্যের সব কিছু কেড়ে নিতে পারলেই তার আনন্দ। আজ পকেট থেকে কড়কড়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে বলে,

—কুড়োন, তোর বউকে একটা শাড়ি কিনে দিবি এই হাটে, রাখ।

হ্যাঁ, যার জন্য এসেছিলাম, শোন কালই বনে যেতে হবে, দু'নৌকা কাঠের পারমিট বাড়িয়েছি, করাতকলে মাল নাই, আজই আড়তে গে সব ব্যবস্থা করতে হবে, আয়।

রতন চলে যায়, কপিল জানে মুনিব কখন চালু হবে, তার এক হাতে লাঠি, বগলে ছাতা সব সময়ই থাকে, রতন একপা বাড়াতেই কপিলও ফটাস্ করে ছাতাটা খুলে মালিকের মাথায় ধরে।

যেন রাজছত্র ধরে চলেছে সে, রতন বের হতে কুড়োন বলে,

—কেমন দরাজদিল মালিক দ্যাখ।

গোলাবীর ব্যাপারটা ভালো ঠেকে না, ওই লোকটার অনেক কিছু আছে, গঞ্জ দাপিয়ে বেড়ায়, কিন্তু চোখের চাহনি দেখে মনে পড়ে রাতের অন্ধকারে দেখা শিয়ালের কথাই।

গোলাবী বলে—টাকাটা নিলে।

—কেন নোব না? দিল তোকে।

গোলাবী কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল, কুড়োনকে এসব ঠিক বলে বোঝানো যাবে না, গোলাবী অবশ্য বুঝেছে ব্যাপারটা, তাই ভাবনায় পড়েছে সে।

—কেদারবাবু এখন খুবই ব্যস্ত।

এই আবাদে এসেছিলেন কেদারবাবু বেশ কয়েক বছর আগে। তখন যুধিষ্ঠির নস্কর বেঁচেছিল। এই অঞ্চলে প্রথম হাইস্কুল হচ্ছে, সারা এলাকার মানুষ, থানার দারোগাবাবু, সহরের বি-ডি-ও, কোন সরকারী অফিসার, এস-ডি-ও সবাই লঞ্চে এসেছিল স্কুলের উদ্বোধনে।

কেদারবাবু তখন ক্যানিং-এর দিকে কোন স্কুলের শিক্ষক, সেখানের কোন বড় ব্যবসায়ীই তাকে নিয়ে আসে এই শ্যামপুরগঞ্জের নতুন স্কুলে।

জেলা শিক্ষাদপ্তরে অফিসারও কেদারবাবুকে চেনেন, তিনিও খুশী হন। কেদারবাবুর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে তিনি অবহিত। তাই তিনি বলেন যুধিষ্ঠির নস্কর অর্থাৎ তৎকালীন সভাপতিকে— একে রেখে দিন নস্করমশাই, কেদারবাবু থাকলে স্কুলের জন্য ভাবতে হবে না, কাজের লোক।

কেদারবাবুর এই শান্ত নিভৃত লোকালয়, নদীর ধার, ছায়াঘেরা বনবিভাগের কলোনী, ওদিকে থানার এলাকা, হাট-বাজারও ভালো লেগে যায়। জায়গাটা তিনগাং-এর মোড়। সহরে যাবার গাং অন্যদিকে, এ পাশে আবাদের অন্য অঞ্চলে যাবার গাং, এদিকে বনে যাবার গাং। চলাচলের পথ এখানে ওই গাং-ই। তাই তিন গাং-এর জংশনে এই গঞ্জের সম্ভাবনা অনেক। স্কুল এখানে ভালোই চলবে। কেদারবাবু রয়ে গেছেন সেই তখন থেকেই।

ক্রমশঃ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে, বিল্ডিংও তৈরী হয়েছে। তৈরী হয়েছে বোর্ডিং, ওদিকে খেলার মাঠ।

কেদারবাবুরও মায়া পড়ে গেছে এখানের মানুষদের উপর। তাদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে রয়ে গেছেন তিনি। ক্রমশঃ তার স্ত্রীকেও এনেছেন, তাদের একটি মেয়েও হয়েছে। শিখা এখন আট ন বছরের, এখন মেয়েরাও পড়ছে স্কুলে।

প্রথম প্রথম মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে এখানের চাষীবাসী সাধারণ মানুষ ইতিউতি করতো। অবশ্য তার আগে কেদারবাবুই দেখেছেন এখানের মানুষজনের

অধিকাংশই চাষী, চাষই করে। কেউ কেউ অবশ্য গাং-এ মাছ ধরে নৌকায়, কেউ বনে কাঠ কাটতে যায়, গরু বাছুরও আছে অনেকের।

তাদের ঘরের ছেলেরা ইতিপূর্বে স্কুলে আসতো না বিশেষ। অভাব তার অন্যতম কারণ। নিজেদের অন্ন জোটে না, বাড়তি আর একটা ছেলেকে পড়াতে হবে! কারোও বা একাধিক সন্তান, অনেক বোঝা, তাই পড়ানোর হাঙ্গামায় না গিয়ে তাদের এখান ওখানে, কাউকে চাষের কাজে, কারোকে গরু চরানোর কাজেই লাগিয়ে দিত। তবু নিজেদের খাবার নিজেরাই খেটে খুঁটে সংগ্রহ করে নিত, ছেলেদের পড়াবার কথাও অনেকে ভাবতো না।

কেদারবাবুই এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করেন, নিজেই সদরে মহকুমায় যাতায়াত করে অনেক চিঠিপত্র লিখে শেষ অবধি ডে মিলের ব্যবস্থা করেন স্কুলে বাচ্চাদের জন্য। স্কুলে এলে একবেলা খেতে পাবে, পড়তেও পাবে, আর ক্রমশঃ ওই সাধারণ মানুষও বুঝেছে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে।

কেদারবাবুই তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে ছেলেদের এনেছেন প্রাথমিক বিভাগে। স্কুলের প্রচার প্রসারও ঘটেছে।

সাধারণ মানুষও দায়ে অদায়ে ছুটে আসে কেদারমাস্টারের কাছে। কোথায় কোন দরখাস্ত করতে হবে, কোথায় ঋণপত্র লিখতে হবে, সহরে কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, মামলা মোকদ্দমা যাতে কম খরচে হয়, তার জন্য উকিলের সাহায্য নিতে হবে। কেদারবাবুই তাদের ভরসা।

তাই ছেলেদেরও স্কুলে পাঠাতে থাকে, দু-চার জন ছেলে পাশ করে, সহরে চাকরী পেতে সাধারণ মানুষ বোঝে— লেখাপড়া শিখলে ভালোভাবে বাঁচতে পারবে তাদের ছেলেরা, তাই এখন স্কুলে অনেকেই আসছে।

এ যেন কেদারবাবুরই কৃতিত্ব। অন্ধকার এই বাদাবনে তিনিই শিক্ষার প্রদীপ জ্বেলেছেন, স্কুলের রেজাল্টও ভালো হচ্ছে।

মেয়েরাও ক্রমশঃ আসতে থাকে স্কুলে। কেদারবাবু তার মেয়ে শিখাকে স্কুলে পাঠাতে অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদেরও পাঠাতে থাকে। কেদারবাবু এখন স্কুল নিয়েই ব্যস্ত।

মথুর জানার পূর্বপুরুষ এখানে এসেছিল মেদিনীপুরের দিক থেকে। এখানে তখন চাষীর দরকার। যারা নিজেদের জমি চাষ করতে পারবে, এখানে বসত গড়ার কাজে হাত লাগাবে। মথুরের বাবা সেই যুধিষ্ঠির গোমস্তার আগে থেকেই খোদ জমিদারের কাছ থেকে কয়েক বিঘা জমি নিয়ে চাষ ফেঁদেছিল।

ক্রমশঃ মথুর এখন ওই নদীর ধারে আরও কিছু জমি নিয়ে চাষ-আবাদ করছে। ছোট্ট সংসার তার, ছেলে রাজা আর মেয়ে কলিকে নিয়ে সংসার মথুরের। সাবিত্রী তার সংসারে নিজেই খাটে। মথুরেরও আশা ছেলে রাজাকে সে পড়াবে। লেখাপড়া শিখে রাজা সংসারের হাল ফেরাবে, শহরে ভালো কাজ করবে। সবাই বলবে মথুরের ব্যাটা পাঁচজনের একজন হয়েছে।

তাই মথুর নিজেই ছেলেকে নিয়ে আসে কেদারবাবুর কাছে, অবশ্য মথুর-এর আগে তার সামান্য বিদ্যা দিয়েই রাজাকে কিছুটা পড়িয়েছে। বর্ণপরিচয়, প্রথমভাগ ও শেষ করেছে। এখন লিখতেও শিখে গেছে রাজা।

স্কুলে কেদারবাবু ভর্তির সময় ছেলেদের নিজেই এক আধটু পরীক্ষা করেন। অবশ্য তিনি জানেন এদের বিদ্যের দৌড়, আর ফেরৎ তিনি কাউকেই পাঠান না। তবু কিছুটা লেখাপড়ার স্বাদ এরা পায়।

তবু এদের মধ্য থেকেই এরমধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন ছাত্রকে সগৌরবে পাশ করিয়েছেন এই স্কুল থেকে লেটার, স্টার পেয়েও অনেকে পাশ করে জীবনে কৃতি হয়েছে।

ভবেশ মাইতির ছেলে, কুমীরমারির নটু দফাদারের ছেলে তো ডাক্তারী পড়ছে। দু'একজন এম-এ-ও করেছে, এরা কেদারবাবুর গর্ব।

রাজাকে দেখে বলেন কেদারবাবু—পড়বি তো রে? না পালাবি মীন ধরতে?

আজকাল আর এক ব্যবসা শুরু হয়েছে আবাদ অঞ্চলে। বনের কাঠকাটাই এখন প্রায় বন্ধই। কারণ এখন শুরু হয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্প। বাঘদের বাঁচাতে হবে। তাদের জন্য চাই শান্ত বনভূমি, আশপাশের বনেও কাঠকাটা প্রায় বন্ধ।

আগে সুন্দরবনের অর্থনীতির অনেকখানি নির্ভর করতো বনজ সম্পদ, কাঠ, মধু ইত্যাদির উপর। বহু লোকই এই পেশায় নিযুক্ত ছিল।

ক্রমশঃ বনবিভাগ দেখলো এভাবে কাঠ-কাটাই চললে সুন্দরবনও শেষ হয়ে যাবে। বিপন্ন হবে পরিবেশ, বন্য প্রাণী। তাই কাঠ-কাটাই বন্ধ হয়ে যেতে শুরু হল গাং-এ মাছ ধরার কাজ।

সে-ও যথেষ্ট নয়, ইলিশ-পার্শে-ভেটকি, পায়রাচান্দা-শিলেট, পমফ্রেট এসব মাছের যোগানও সীমিত, তারমধ্যে কদর বেড়ে গেল বাগদা চিংড়ির।

ক্রমশ নদীতে নয়— শুরু হলো নোনা গাং-এর ধারে, ভেড়িবাঁধ দিয়ে নোনা জলে বাগদার চাষ। বিদেশে এর দাম প্রচুর, কোটি কোটি টাকা আমদানী হয় বাগদা চিংড়ি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাজা রেখে বিদেশে চালান দিয়ে।

ফলে এবার আবাদ অঞ্চল নোনা গাং-এর ধারে যেসব মাঠ ছিল তার দিকেই

নজর গেল ধনী মহাজনদের, এই জমি আকাশ নির্ভর। মিঠে জলের যোগান আসে বর্ষার মেঘ থেকে, তাতেই কিছু ধান চাষ হয়।

সুবিধা হলে ধান কিছু হয় জমিতে, বর্ষা না হলে চাষীর সর্বনাশ। এছাড়া আছে ভেড়ি বাধ ভাঙার ভয়, ষাড়াষাঁড়ির কোটালে নদী ফুলে ফেটে উঠে হানা দেয় জরা-জীর্ণ বাঁধে, ওসব বাঁধ তৈরি হয়েছিল জমিদারদের আমলে আবাদের পত্তনের সময়। জমিদাররাই নিজের স্বার্থে প্রজাদের যাতে ধান নিরাপদে হয় তার জন্য ওই ভেড়ি বাঁধ মেরামত করাতো, বাঁধে মাটি দিত নিয়মিত।

তারপর জমিদারী চলে যাবার পর ওসব বাঁধ গেল সেচ দপ্তরের অধীনে। সরকারি আমলাদের ওপর পড়লো এসব তদারকের ভার, এলো ঠিকাদারের দল। তারা মোটা টাকার বাঁধ মেরামতের কাজ পেল কিন্তু তার বেশ কিছু গেল প্রণামী বাবদ নেতা আর কর্তাদের পকেটে। বাকী যা রইল তার থেকে সামান্য কিছু লোক দেখানি কাজ করে বাকীটা ঠিকাদার মশাই ঘরে নিয়ে গেলেন।

বাঁধের অবস্থা ক্রমেই জীর্ণতর হতে থাকে, তাই মাঝেমাঝেই বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢোকে আবাদে। ধানক্ষেতও নির্মূল হয়, চাষীরও সর্বনাশ হয়, অভাব কষ্ট বাড়ে।

এই অভাবের সুযোগই নেয় মহাজনরা। ওদের ধানী জমিতে ভেড়ি করে সামান্য টাকার বিনিময়ে, আর সেখানে বাগদা চিংড়ির চাষ করে বিদেশে চালান দিয়ে মোটা টাকা রোজকার করে।

ওই সব অসংখ্য গজিয়ে ওঠা ভেড়িতে বাগদার চাষ করার জন্য দরকার হয় বাগদার কচি-বাচ্চার, তাকে চলতি কথায় এরা বলে মীন।

ওই মীন গাং-এর জলে ভেসে আসে— প্রকৃতির নিয়মেই।

ওই মীন-এর চেহারা তখন খুবই ছোট, মশার লার্ভার মত, অবশ্য ওই গাং-এর নোনা জলেই ওদের জীবন।

সারা এলাকার ছেলেমেয়েরা নামে নাইলনের সরু জাল নিয়ে নোনা গাং-এর জলে মীন ধরে, ওই মীন বাগদা ভেড়ির মালিকরা ভালো দাম দিয়েই কিনে নেয়।

কাঠের ব্যবসা যেতে এবার বনের মানুষের সামনে ওই মাছ ধরা আর মীন ধরাই কিছু রোজগারের পথের সন্ধান দিয়েছে।

ভোর থেকেই গাং-এর নোনা জলে নামে ওরা জাল নিয়ে — কাজ করে দুপুর অবধি। নোনা গাং-এ কামটের ঝাঁক ঘোরে, ছোট হাঙর জাতের প্রাণী, ধারালো দাঁত এদের। মানুষের পায়ের মাংস নোনাজলের মধ্যে নিঃসাড়ে কেটে ছেটে নেয়, তখন বুঝতেই পারে না, জল রক্তে লাল হতেই বোঝা যায় বিপদটা।

তার আর্তনাদে ছুটে আসে মানুষজন। পায়ের মাংস আর নেই। কাছাকাছি

হাসপাতালও নাই, সহরে পৌঁছানোও দুষ্কর। ফলে পা বিষিয়ে মরে অনেকে, কেউ পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকে।

তবু মীন ধরতে নামবেই নগদ পয়সার জন্য ওই নোনা গাং-এ।

মথুর ওসব কাজে যায় না। নিজের জমিতেই সে কাজ করে। ধান লাগায়, কাছের জমিতে কিছু আনাজপত্রও করে পুকুরের জল সেচ করে তার স্ত্রী সাবিত্রী, দরকারে হালে হাত লাগায় মথুর।

মথুর বলে— না-না মাষ্টার মশাই, ওই মীন ধরার কাজে কুর্না নেই যাই না, ছেলে-মেয়েদেরও যেতে দিই না, রাজা পড়াশোনাই করবে।

ছেলেটার খুবই বুদ্ধি, সুন্দর নধর গড়ন, স্বাস্থ্যও ভালো, হাতের লেখাও সুন্দর। কেদারবাবু দু একটা প্রশ্ন করেন, সাধারণ প্রশ্নই। তাও এখানের অনেকে উত্তর দিতে পারে না।

কিন্তু রাজা চটপট সঠিক উত্তরই দেয়, এমনকি আহ্নিকগতি, জোয়ারভাটার সঠিক কারণও বলে দেয়।

কেদারবাবু খুশি হন, বলেন— ঠিক আছে স্কুলে নিচ্ছি তোকে, তবে ঠিকমত পড়াশোনা করতে হবে।

রাজা বলে— খেলা করতে পারবো না?

হাসেন কেদারবাবু— কি খেলা করিস?

— ফুটবল, আর এই!

জামার নীচ থেকে কোমরে গোঁজা একটা গুলতি বের করে বলে, নিজের হাতে বানিয়েছি, নগাকেও একটা দিইছি।

— নগা কে?

নগেন ওরফে নগাই রাজার বাল্যবন্ধু, তাদের বাড়ির ওদিকে নগাদের ঘর। নগার বাবা মাধব ওই রতনবাবুর আড়তে মাছ ধরে।

কেশববাবু বলেন— ফুটবল খেলবি স্কুলের মাঠেই, ওসব গুলতি টুলতি ছুড়িস কেন?

রাজা এর মধ্যে রামায়ণের গল্পও জেনেছে। তার মনে হয় নিজেকে যেন বীর হনুমান সে। ওই লোভী শয়তান রাবণকে সে গুলতি দিয়েই শেষ করে দেবে।

এই শ্যামপুর গঞ্জেও বদলোকের অভাব নেই। দেখেছে রতনবাবুর সরকারকে, লোকটা আড়তে নগার বাবাদের নানাভাবে ঠকায়, পয়সাও ঠিক মত দেয় না, তাই নগাদেরও ঠিকমত খাওয়া জোটে না।

নগা স্কুলেও আসে না। কখনও হাটতলায় চায়ের দোকানে কাজ করে, কখনও মাঠে-ঘাটে, না হয় গরু চরায় বাবুদের।

বলে নগা— ওই সরকার কেন ওই রতনবাবুও মহা পাজীরে! বাপটা এত কষ্ট করে মাছ ধরে গাং-এ সে মাছের দামও দেয় না।

রাজার মনে হয় জোরে ছুঁড়বে গুলতি ওই সরকারের টাকে। রতনবাবুকেও দেখতে পারে না সে, কিন্তু বড় লোক, তার বাবাও খাতির করে লোকটাকে।

গুলতিটা আপাততঃ মাস্টারমশায়ের কথায় কোমরে চালান করে মনের ওই প্রতিবাদের ভাবটা চেপেই রাখে রাজা।

স্কুলটাকে দেখছে, এতদিন অবশ্য পথ থেকে দেখেছে। এই বিল্ডিং-এ ছেলেমেয়েদের দেখেছে, আজ সে এখানেরই একজন।

মাস্টার মশাই বলেন, কাল থেকে বইপত্তর নিয়ে স্কুলে আসবে। আর মন দিয়ে পড়াশোনা করবে রাজা।

রাজা ঘাড় নেড়ে বাবার সঙ্গে বের হয়ে আসে ওই কলরবমুখর স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে।

শ্যামপুরগঞ্জের হাটতলা এখন বেশ জমজমাট। আশপাশে-ওদিকে বনের দিকের মাঠ অঞ্চলে আর এত বড় হাট নেই।

এখানে বন অফিস, থানা-আরও দু'একটি ছোটখাটো সরকারি অফিসও গড়ে উঠেছে, তিন নদীর মোহানা। বনে যে সব নৌকা কাঠ, মধু আনতে যায়, তারা এই হাটেই তাদের রসদপত্র কেনে, টিউবওয়েল থেকে নৌকায় রাখা বড় বড় মাটির জালায় খাবার জল তুলে নিয়ে বনের দিকে যায়। তাছাড়া আশপাশের অঞ্চলের মানুষের মালপত্র কেনাবেচার জায়গা এই গঞ্জ।

এখানেই লঞ্চ এসে থামে, যাতায়াতের পথও এখানেই শুরু। তাই অনেক মানুষের আনাগোনা এখানে। ওদিকে বিরাট এলাকা জুড়ে রতনবাবুর কাঠগোলা, ওপাশে আড়ত, গুদাম।

আর গঞ্জের বাইরে নদীর ধারে রতনবাবু ইদানীং বেশ সুন্দর একটা বাগান-বাড়িও বানিয়েছে, চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা। ওখানে সেচ বিভাগ-বনবিভাগ-ফুড বিভাগের নানা কর্তাদের আপ্যায়ন করা হয়, বাইরে থেকে সারবন্দী নারকেল, সবুজ আমগাছ এসবও দেখা যায়।

সব মিলিয়ে গঞ্জ এখন জমাট।

অবশ্য হাট বসে সপ্তাহে দু-দিন। সেদিন তো গাং নৌকা ডিঙিতে ভরে ওঠে।

আসে নৌকো নিয়ে মুদিখানার দোকান, কাটা কাপড়ের পশারী, নানা জিনিষপত্র বিরাট খোপবন্ধী ডালায় বত্রিশরকম ভাজা মিলিয়ে উৎকৃষ্ট চানাচুর, নানা মশলা সাজানো পানওয়ালাও।

আসে নৌকো বোঝাই কুমড়ো, আলু, পিয়াঁজ, লঙ্কা। নোনা গাং যারা যায় তারা তো ওই আলু, পিয়াঁজ, কুমড়োই বেশী কেনে।

অন্যসব শব্জীও আসে।

অন্যদিন অবশ্য হাটতলায় এত সোরগোল হয় না। তবু বেশ কয়েকটা বাঁধা দোকান খোলা থাকে, দু'চারজন শব্জী, মাছ নিয়েও বসে।

ওদিকে চরণ ডাক্তারের ডাক্তারখানা। চরণ ডাক্তার এই গঞ্জের চলমান গেজেট। একটা শিরিষগাছের নীচে দরমার ঘরে টিনের ছাউনি, সামনে একটা বোর্ডে লেখা।

রাজা লেখাগুলো পড়তে পারে— ডাঃ চরণদাস মান্না, তার পরের লেখাগুলো কেমন বিবর্ণ। সেগুলো নাকি ওর নিজেরই নেওয়া নানা ডিগ্রি।

চরণ অবশ্য সব বিদ্যাতেই পারদর্শী।

মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচা পাকা চুল আর ঝুরো গোঁফ জোড়াটা বেশ পুরুষ্টু, চোখের ওপর ভ্রূটাও বেশ পুরু লোমে ভর্তি, ধুতি একটা সার্ট, সার্টটা ধুতির নীচে গোঁজা, আর সেটার কি রং, কবে কাচা হয়েছিল তা অবশ্য বোঝা যায় না। পায়েও ধূলি ধূসর রংচটা কেডস্। ওটা থাকে বড়জোর চারমাস, তারপর বৃষ্টি বাদল তো এখানে লেগেই থাকে। তখন খালিপায়েই ঘোরে চরণ ডাক্তার। অবশ্য তার একটা বেতো ঘোড়াও আছে।

দূরের গ্রামে কলে যেতে হলে তখন ঘোড়ার পিঠে কয়েকটা ভাজ করা পুরু বস্তা চাপিয়ে তার উপর সমাসীন হয়ে যায় চরণ। বাকী সময় ঘোড়াটার সামনের দুটো পা বেঁধে দিয়ে চতুষ্পদ থেকে ওকে ত্রিপদে পরিণত করে মাঠে ছেড়ে দেয়, দিনভর লেংড়ে লেংড়ে ঘাসপাতা খেয়ে ঘোড়াটা নিজের রসদ নিজেই সংগ্রহ করে আর দরকার মত চরণ দাস ওর পিঠে চেপে ধান্দায় বের হয়। একাধারে সে এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজও। চিকিৎসাবিদ্যার তিন ধারাতেই সে পারদর্শী। রোগীর বাজেট বুঝে চিকিৎসা করে। হাটতলায় চরণ সেদিন বসে আছে তার ডাক্তারখানার হাতলভাঙা চেয়ারে। রোগী দু'একজন রয়েছে, অবশ্য হাটেবারে রোগীর ভিড়ই বেশী হয়।

আজ চলছে মথুর রাজাকে নিয়ে নটবরের দোকানে, হাটতলায় নটবর পালের দোকানই বড়, এটাকে ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরই বলা যেতে পারে।

ওর ভাই হাসনাবাদ শ্যামপুরগঞ্জ লঞ্চের সারেং, সহরে লঞ্চ নিয়ে রোজই যাতায়াত করে, তাই নটবরের দোকানে সহরের নানা মালই মজুত থাকে। একদিকে মুদিখানা, সঙ্গে স্টেশনারী—ওদিকে কিছু ওষুধপত্র—ওপাশে কিছু রড, সিমেন্ট, সঙ্গে বই-স্কুলের খাতা পেন পেন্সিলও মেলে। ডাকটিকিট, খাম পোস্টকার্ডও পাওয়া যায় তবে কিঞ্চিৎ মূল্য বেশি দিতে হয়।

মথুর চলেছে নটবরের দোকানের দিকে ছেলেকে নিয়ে, চরণ ডাক্তার এর প্রতিদ্বন্দ্বীও অবশ্য হাটে আছে। সে গিরিধারী ডাক্তার, সবে এসেছে এখানে হোমিওপ্যাথি পাশ করে।

চরণ বলে—ও আবার কি শিখেছে হে? কালকের ছোকরা!

তবু রোগীদের সম্বন্ধে সাবধান থাকে চরণ, যাতে বেহাত না হয়। মথুরকে দেখে হাঁকে চরণ—মথুর যে হে? খবর সব ভালো তো? এসো—ছেলের কি হলো? ভয় নাই—এসো।

চরণ ভাবছে অসুখ বিসুখ কিছু হয়েছে ছেলের। কিন্তু মথুর বলে—আজ সময় নাই ডাক্তার। ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করলাম—বই খাতা সেলেট কিনতে যাচ্ছি গো।

চরণ হতাশ হয়—এ্যাঁ! ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করলে?

যেন একটা মহাঅপরাধের কাজই করে ফেলেছে মথুর। মথুর চলে যেতে চরণ উপস্থিত রোগীদের বলে—দিনকাল বদলে গেল হে, সবাই ইস্কুলে যাচ্ছে, তাহলে দেশের কি হাল হবে বলো? দেখবে মাঠে খাটবার জনও আর পাবে না।

রাজার কাছে যেন নতুন জগতের দরজা খুলে যাচ্ছে—নতুন বই, খাতা, পেন্সিল এনে দাওয়ায় চট পেতে পড়তে বসেছে রাজা।

বই-এর লেখাগুলো কি যেন রহস্যময় এক স্বপ্নজগতের সন্ধান আনে তার সামনে। ওদিকে ছোটবোন কলি উঠানে খেলছে, সে দেখে দাদা আজ খেলতেও আসছে না।

একা একা খেলে ক্লান্ত হয়ে কলি দাদার কাছে আসে—এগুলো কি বই রে দাদা?

রাজা বলে— এখন পড়ছি, ইস্কুলের পড়া, গোলমাল করিস না কলি।

কলি সরে আসে। এদিকে মা ধান সেদ্ধ করে উঠানে শুকোতে দিচ্ছে, সাবিত্রীই বলে, দাদা পড়ছে, গোলমাল করবি না কলি। ধান শুকুতে দিয়েছি, তুই আগলা—যেন কাকে মুখ না দেয়।

দাদাও যেন ওই বই পেয়ে কলির কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

নগা এসেছে অন্যদিনের মত রাজার কাছে।

—রাজা!

কলি বলে— দাদাকে ডাকিস না।

— কেন?

কলি বলে— দাদা এখন পড়ছে, আরও বড় বড় বই পড়বে। ইস্কুলে যাবে। বাবা ওর সঙ্গে কথা বলতে না করেছে।

নগা অবাক হয়, পীরখালির জলায় অনেক পাখি বসছে। গুলতি নিয়ে আজ দুজনে অভিযানে যাবার প্ল্যানই করেছিল। কিন্তু হতাশ হয়।

রাজার টিপ নির্ভুল। কাশবনের আড়ালে চুপিসাড়ে গিয়ে রাজা নির্ভুল লক্ষ্যে গুলতি মারে, দু'একটা বুনো হাস তারা মেরে এনে খেয়েছেও। আজও মাংস জুটতো, কিন্তু রাজার ইস্কুল যে এমনি বাদ সাধবে তা ভাবেনি নগা।

তবু সে একটু সরে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে গাং, এদিকের মাঠে মথুর ধান কাটছে, শীতের শুরু, এবার ধান বেশ ভালোই হয়েছে। বর্ষার জলে পুরুষ্ট ধানগাছগুলো এখন সোনা ধানের মঞ্জরীর ভারে নুয়ে পড়েছে। এখানে এক লপ্তে মথুরের পাঁচ বিঘে সরেস ধানী জমি আছে, তার ওদিকে রয়েছে রতন নস্করের কিছু জমি।

লোকটার কতো বিঘে জমি কতদিকে ছড়ানো কে জানে! যার যেখানে জমি বিক্রি হয় তা ওইই কেনে, আর বেশীরভাগ জমিই তার কাছে অভাবের দায়ে অনেকে বন্ধক রেখেছে না হয় টাকা নিয়েছে দিতে পারেনি, তার জমিই রতনবাবু তার লাঠিয়ালের দলকে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই দখল করেছে। কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজে অন্য লোকের নাম। কিন্তু তাদের করার কিছুই নাই, দখল রতনবাবুর, ও জমি তারই।

এদিকে জমিগুলোও রতন নস্কর ওইভাবেই দখল করেছিল। ওখানের চারবিঘের ওই নস্কর মশায়ের জমি মথুর ভাগে করে। ওদিকে মথুরের বাড়ির লাগোয়া পুকুর একটা আছে, তাতে মাছও করে আর তারই জল তুলে শাকশব্জী ফলায়, সংসারও চলে, ফি হাটে কিছু আনাজপত্রও বিক্রি করে।

কোনমতে চলে যায় তার সংসার কষ্টে সৃষ্টে। এখন স্বপ্ন তার ওই রাজাকে ঘিরে। ছেলেকে পড়াবে। পীরখালির গোবর্দ্ধন দাসের ছেলে ওই স্কুল থেকে পাশ করে কলেজে জলপানি নিয়ে পাশ করে এখন ভালো সরকারী চাকরী করে, বাড়িতে আসে— গোবর্দ্ধনের এখন পাকাবাড়ি হয়েছে। ভালোই আছে। রাজাও অমনি মস্ত লোক হবে, মথুরের দিন বদলাবে।

রাজা স্কুলে আসছে ভেড়ির পথ ধরে, হঠাৎ নগাকে দেখে চাইল।

—তুই!

নগা দেখছে রাজাকে। পরণে ফর্সাপ্যান্ট, জামা, কাঁধে ইস্কুলের ব্যাগ। নগা বলে,

—আয় বাপ্, একেবারে ভোল বদলে গেছে যে রে!

রাজা বলে—স্কুলে যাচ্ছি, বল কি বলছিলি?

নগার পরণে ময়লা একটা রং জ্বলা প্যান্ট, খালি গায়ে খড়ি উঠছে, নগা বলে,

—তুইও ওদের দলে ভিড়ে গেলি, আর বলে লাভ নাই।

রাজা বলে— নারে, বল!

নগা বলে— পীরখালির বিলে বালিহাস নামছে, ইয়াসাইজ! যা তেলালো মাংস হবে না! যাবি মারতে? তোর গুলতির্ যা টিপ।

রাজা বনে বাদাড়ে ঘুরতে ভালোবাসে। এমনিতে সে খুব সাহসী, মাঝে মাঝে অবশ্য বিপদেও পড়ছে। সেবার গাং-এ ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে, তখন অবশ্য সবে সাঁতার শিখছিল।

তারপর রাজারও যেন জেদ চাপে, নৌকা বওয়া—সাঁতার তাকে আরও ভালো করেই শিখতে হবে।

এ বিষয়ে নগাই তার প্রকৃত বন্ধু। ওর বাবা গাং-এ মাছ ধরে, কখনও দূর ভাটিতে বড় গাং রায়মঙ্গল ঝিলার ওদিকে চলে যায় জাল নিয়ে।

নগাও থাকে বাবার সঙ্গে, দাঁড় টানে জাল ফেলে, নগাদের নৌকাটাতেই অবসর সময়ে রাজা বের হয় নগাকে নিয়ে, নগাই তাকে বড় গাং এ নিয়ে যায়, রাজাও শিখে গেছে নৌকা বাইতে, হাল মারতে, মাঝে মাঝে দুস্তর গাং এই নেমে পড়ে কিছুক্ষণ সাঁতরে আবার নৌকায় ওঠে।

সেবার খয়ের কাঠির বিলে পাখী মারতে গিয়েছিল নগাকে নিয়ে। কাশবনে পাখীরা যাত্রে তাদের উপস্থিতির খবর না পায় তাই সাবধানে বুকে হেঁটে এগিয়ে যায় কাছাকাছি, গুলতির সীমার মধ্যে পেয়ে রাজা গুলতি ছোঁড়ে—পাখীগুলো শনশন শব্দে উড়ে যায়, একটা পাখীর মাথাতেই লেগেছে গুলতির শক্ত বাটুলটা, এটেল মাটি গোল করে মার্বেলের মতো পাকিয়ে রোদে শুকিয়ে নেয়, ফলে বেশ শক্তই হয় ওটা।

ওর আঘাতেই পাখীটা ছিটকে পড়েছে ঘাসবনে, ছটফট করছে রাজা ছুটে তুলতে যাবে, হঠাৎ সামনে ঘাসবন থেকে মাথা তুলেছে বিদ্যুৎগতিতে একটা গোখরো সাপ! ফনাতে কালো দাগ, চোখ দুটো পিট পিট করছে—চেরা সরু জিবটা বের হয়ে আছে, আর ফনাটা নাড়ছে মাঝে মাজে গর্জন করে—হিস্ স্!!

নগা চীৎকার করে—রাজা!

রাজাও দেখেছে সাপটাকে, ওইখানে দাঁড়িয়েই গুলতি দিয়ে সজোরে একটা বাঁটুল মারতে সেটা লাগে ওর ফনাতে, সাপটা মাথা নামিয়ে সর্ সর্ শব্দে পালাল রণে ভঙ্গ দিয়ে, ওরা ছুটে গিয়ে পাখীটাকে ধরে।

নগা জানে রাজা সঙ্গে থাকলে কোন ভয় নাই, কাজ যে ঠিক হাসিল করেই আসবে।

রাজাও ওই বই স্কুলে নিয়েই ডুবে থাকতে চায় না, রাজা বলে—কাল ভোরে বের হবো। তুই শিরীষতলায় থাকবি আমি এসে যাবো।

নগাও খুশী হয়।

স্কুলে রাজা ভালো ছেলে। ক'দিনেই স্কুলের রমেশ স্যার, ভূধরবাবুও চিনেছেন রাজাকে। পড়াশোনাতে ভালো, ইংরাজী অঙ্কের পড়া ঠিক মতই করে, আরও সরেস সে ফুটবল খেলায়।

স্কুলের মাঠে ভূধরবাবুই খেলার সময় থাকেন। দেখেছেন তিনি রাজাকে যেমন দৌড়াতে পারে, তেমনি সটে জোর, আর দুটো পা'ই ওর চলে স্বচ্ছন্দগতিতে। ফরোয়ার্ডে খেলে ওকে আটকাতে পারে না ছেলেরা। ঠিক ফাঁক খুজে সে গোল করবেই।

কেদারবাবুও সেদিন ওর হাফইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে অবাক হন।

—বাঃ বেশ ব্রিলিয়ান্ট ছেলেটা তো রমেশ!

রমেশবাবু বলেন—হ্যাঁ স্যার। ওর দিকে একটু নজর রাখবেন।

এর মধ্যে অবশ্য রাজা অনেকেরই নজর কেড়েছে খেলার মাঠেও। সেদিন পাঠানখালি স্কুলের বি টিম খেলতে এসেছে এখানে। রতনবাবু তার বাবা যুধিষ্ঠিরের নামেই শিল্ডও দিয়েছে। তারই ফাইনাল খেলা।

তাদের স্কুল টিম ফাইনালে উঠেছে, এবার জিততে পারলে শিল্ড পাবে শ্যামপুর গঞ্জের স্কুল। সারা এলাকার মানুষ ভেঙে পড়ছে মাঠে।

গ্রামের মেয়েদেরও অনেকে এসেছে, স্কুলের ছাত্রীরাও রয়েছে। আছেন কেদারবাবু, অন্য মাস্টাররা। এসেছে রতনবাবু বিশেষ সম্মানীয় অতিথি হয়ে, সঙ্গে রয়েছে চরণ ডাক্তার, বাজারের পাল মশাই অন্যরাও। থানার দারোগা গতিরামবাবুও রতনবাবুর খুবই বন্ধু, ইয়া গোল পিপের মত চেহারা, গোল ভরাটি মুখে পুরুষ্ট নধর পালং শাকের সতেজ ঝাড়ের মত নধর একজোড়া গোঁফ, সকলেই ভিড় করেছে।

এক গোলে হারিয়েছে শ্যামপুর গঞ্জের স্কুল হাফটাইমের আগে, হাফটাইম অবধি পাঠানখালি স্কুলই চেপে আছে। দর্শকরা নীরব। এ যেন সমগ্র শ্যামপুরেরই হার। হাফটাইমের বাঁশী বাজার আগেই পাঠানখালি এদের জয়ের আশা নির্মূল করে আর একটা গোলই দিয়ে বসল।

ভূধর স্যার এর মুখ বিবর্ণ, পাঠানখালির দল তখন উদ্দাম নৃত্য শুরু করেছে। ভূধর স্যার কি ভেবে বলেন,

—রাজা, এবার তুই নামবি,

রাজাও ছটফট করছিল, সে দেখেছে পাঠানখালির বাঁদিক একেবারে অরক্ষিত। ব্যাকটাও নড়বড়ে, এরা সেদিকে কোন চেষ্টাই করেনি। শ্যামপুর দল গোল আটকাতে ব্যস্ত, আক্রমণে যায়নি। রাজা তার মতলব স্থির করে নেয়।

এবার নেমেই রাজা ওই বাঁদিক থেকেই উঠতে থাকে। পাঠানখালির দল সবাই তখন এদিকে। দলের রক্ষণভাগে যে এমনি কেউ হানা দেবে তা ভাবতেই পারেনি ওরা।

রাজা বল নিয়ে দৌড়াচ্ছে হরিণের মতো। এরা তার কাছে যাবার আগেই রাজা ব্যাককে কাটিয়ে হঠাৎ ডান পায়েই সেকেন্ড বারে বলটা মারতে আকাশবাতাস বিদীর্ণ করে কলরব ওঠে

—গো-ওল।

পাঠানখালির দল ভাবতেই পারেনি যে এইভাবে গোল হবে! ওরা একটা ধাক্কা খেয়েছে।

আর শ্যামপুরও এবার নতুন উদ্যমে চেপে ধরেছে। রাজাও নজর রাখছে এর মধ্যে বলটা পেতে দেখে দু তিনজন তাকে ঘিরে রেখেছে—সে দৌড়াচ্ছে, আরও দু'একজন ডিফেন্সের প্লেয়ারকে নিজের কাছে টেনে এবার বলটা ওদিকের রাইট উইং নরুকে পাশ দিতে নরুই ফাঁকা গোলে অনায়াসেই গোল করে।

এখন সমান সমান।

এবার দুপক্ষই প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারে না। শেষ মুহূর্তে রাজাই বল নিয়েছে, সারা মাঠে চীৎকার ওঠে—রাজা! রাজা!

ওই যেন শ্যামপুরের শেষ আশা। রাজা দুতিনজনকে কাটিয়ে এবার দূর থেকেই বলটা মেরেছে, আর নদীর এলোমেলো বাতাসে বলটা আশ্চর্যজনকভাবে একটা বাঁক খেয়ে ফার্স্টবার দিয়েই গোলে ঢুকে যায়।

জিতে গেল শ্যামপুর স্কুল!

সারা মাঠের লোক রাজাকে আজ চিনেছে, মাঠে তখন ছেলেদের নৃত্য চলছে।

নগাও খেলা দেখছিল, এ যেন তারই জয়। সে ও নেমে পড়ে নৃত্য শুরু করে।

ভূধরবাবু, কেদারবাবু বলেন—আজ তুই মান বাঁচিয়েছিস রাজা।

পরদিন স্কুল থেকে ফিরছে রাজা। গঞ্জের হাটতলায় স্কুলে আজ তারই জয় জয়কার। নদীতীরের পথ দিয়ে ফিরছে, সে শিখার ডাকে চাইল।

হেডমাস্টার মশাই ওই কেদারবাবুর মেয়ে শিখা। তার চেয়ে দু ক্লাশ নীচে পড়ে। শিখা বলে,—কাল যা খেললে তুমি!

রাজা জবাব দেয় না। আজ হেডমাস্টার মশায় নিজে ওকে বলেছেন— ও বেলায় আমার বাড়িতে আসবে রাজা। ওখানেই খাওয়া দাওয়া করবে।

রাজা বলে—আজ হেডস্যার যেতে বলেছেন।

শিখা বলে— আসবে তো?

রাজা এর আগে গঞ্জের ভদ্রসমাজে বিশেষ আসেনি। ওদের জগতটা খুবই ছোট। মথুরও কাল মাঠে ছিল। দেখেছে তার ছেলের খেলা। সারা গঞ্জের মানুষের মুখে রাজার নাম শুনে তার বুকটাও কি গর্বে ভরে ওঠে।

বাড়ি এসে বলে মথুর—বুঝলি বৌ, রাজা খেলেছে বটে! সারা শ্যামপুরের মুখ রেখেছে আজ রাজা।

সাবিত্রী বলে—তাই নাকি গো!

রাজা ফেরে বিজয়ীর মত। সঙ্গে নগা। সেও আনন্দে অধীর। বলে—দ্যাখো কেমন একখান কাপ দে'ল রাজাকে। সাবিত্রী দেখে, ছেলের কৃতিত্বে আজ সেও গর্বিত। মনে মনে বলে ঠাকুরকে—ওকে বাঁচিয়ে রাখো ঠাকুর, মানুষের মত মানুষ করো।

কেদারবাবু রাজাকে চিনতে ভুল করেননি। তার প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল ছেলেটা আর পাঁচজনের মত অতি সাধারণ নয়। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বুদ্ধির দীপ্তি, আর নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার আছে। ওই ধ্বসে পড়া টিমকে সেইই লড়াই করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, যুদ্ধ জয় করে ফিরেছে।

কমলা স্বামীর সঙ্গে এই আবাদে প্রথম এসে আশপাশে ধূ ধূ মাঠ, ওই দুরন্ত গাং-এর বিস্তার দেখে বলে।

—এ কোথায় আনলে গো? এই বাদাবনে মানুষ থাকে? চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ আর গাং।

কেদারবাবু বলেন— তবু মানুষ তো আছে। আর দেখবে এই গঞ্জের চেহারাও

বদলে যাবে।

ক্রমশঃ কমলা এখানেই সংসার পাতে। তাদের সংসারে আসে নতুন অতিথি, শিখাও বড় হয়ে ওঠে। বেড়ে ওঠে গঞ্জের পরিসর, জেটি তৈরী হয়, কয়েকটা লঞ্চ সার্ভিসও যাতায়াত শুরু করে। স্কুল-এর নতুন তিনতলা বিল্ডিং তৈরী হয়, তৈরী হয় বোর্ডিং, শূন্য মাঠ ভরে ওঠে ছেলেদের কলরবে।

কমলা এই জায়গাকেই মেনে নিয়েছে।

সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন ছেলে মাস্টারমশায়রা এসেছে। কেদারবাবু বিজয়ী ছেলেদের আজ খাবার জন্য ডেকেছে। এসেছে রাজাও। ভীরু সন্ত্রস্ত চাহনি, সবাই কমলাকে প্রণাম করে। শিখাই বলে,

—মা এই সেই রাজা। এর জন্যই স্কুল শীল্ড পেয়েছে।

কমলা দেখছেন ছেলেটিকে, কালো রোদে পোড়া চেহারা তবু মুখটা কেমন কচি, দেখলেই ভালো লাগে।

কমলা বলে—তাই নাকি, কোথায় থাকো?

রাজা বলে—ওই তো হাটতলার ওপাশে পীরখালির পথের ধারেই আমাদের বাড়ি।

শিখা বলে—শুধু খেলাধূলাতেই নয় মা পড়াশোনাতেও ফাস্ট বয় রাজা।

রাজা এই প্রশংসায় লজ্জাই পায়।

কমলা বলে—শিখা, ভাত হয়েছে। তোর বাবাকে বল— ওদের খেতে বসিয়ে দিতে। বাড়ির কাজের মেয়েই জায়গা করে দেয়, শিখা তবু অনভ্যস্ত হাতে জল দেয়। কমলাদেবী ওদের পরিবেশন করেন, রাজা আজ যেন তাদের সমাজের গণ্ডীর বাইরে স্বীকৃতি পেয়েছে। গরম ভাত, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, আলুপটলের তরকারী, দুরকম মাছ, চাটনী, শেষ পাতে পায়েস।

রাজা তৃপ্তিভরে খায়, কমলা বলে,

—আর একটু পায়েস রসগোল্লা দিই রাজা?

রাজা বলে—অনেক খেয়েছি। আর পারবোনা।

কমলা বলে— তাহলে থাক, পরে একদিন খেয়ে যাবে।

শিখা বলে— মায়ের পাল্লায় পড়েছ রাজা! মা খাইয়ে তোমাকে শেষ করবে। আমাকে জোর করে গেলায় শুধু।

কমলা বলে—থামতো। কেবল বাজে কথা।

রাজা ফিরছে। তখন রাত হয়ে গেছে, গাং-এর বুকে জোয়ার চলছে, ঢেউগুলো তীরে ভাঙছে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে। শিরীষগাছে হাওয়া কাঁপে, বাদাবনের দুরন্ত

হাওয়া। তারাগুলো নদীর জলে দোল খায়। রাজার মনেও কি যেন তৃপ্তির জোয়ার। তাকে আরও বড় হতে হবে, লেখাপড়া করতে হবে।

—রাজা!

হঠাৎ রাজা কার ডাক শুনে চাইল। গাং-এর দিক থেকে একটা নৌকা থেকে উঠে আসছে নগা। মাথার গামছাটা খুলে হিম-জলো হাওয়া থেকে বাঁচার জন্যই গামছাটা গায়ে জড়ায় নগা।

মাছের একটা ঝুড়ি মাথায়, নগা শুধায়,

—কোথায় গেছলি রে বাবু হয়ে সেজেগুজে?

—হেডস্যারের বাড়িতে নেমতন্ন ছিল।

নগা বলে—ভালোমন্দ খেয়ে এলি! আছিস ভালো রে! আর নগা ব্যাটা এই বাওড়ে হাড় হিম করা গাং-এ কাঁপতে কাঁপতে মাছের ঝুড়ি নে চলেছে রতনবাবুর আড়তে।

রাজা বলে—চল, ওদিকেই তো যাচ্ছি।

দূরে দেখা যায় রতনবাবুর আড়তে তখন হেজাক জ্বলছে দুটো। সন্ধ্যার পর দূর দূরান্তরের জেলেরা সারাদিন-ভোর যা মাছ ধরে সব নৌকায় করে আনে দূর দূরান্ত থেকে।

ওদের কিছু টাকা আগাম দিয়ে রাখে রতনবাবু। নৌকা, জালও সকলের নাই। তাও দেয়, রতন নস্কর। আর যত মাছ তারা ধরবে সব আনতে হবে তার আড়তে।

রতন নস্করের এই আড়ত শুরু করেছিল তস্য পিতৃদেব ঈশ্বর যুধিষ্ঠির নস্কর। সে দেখেছিল মাছ এর ব্যবসা এখানে ভালোই চলবে, আর নিজেই এই আড়ত থেকে তখন ক্যানিং-এর মহাজনদের মাছ চালান দিত।

এখন রতন সেই আড়তকে অনেক বাড়িয়েছে, তার নিজেরই প্রায় সত্তরখানা নৌকা, জালও করেছে। জেলেদের দাদন দিয়ে রেখেছে। এছাড়াও অন্য লোকরাও তার আড়তেই মাছ আনে।

সন্ধ্যার পর থেকেই আড়তে মাছ আসতে থাকে দূর দূরান্ত থেকে। ঘাটে এসে লাগে মাছ বোঝাই নৌকাগুলো। ঝুড়ি ঝুড়ি ইলিশ, পমপ্লেট, ভোলা-ভেটকী, গুর্জালি, সিলেট, রূপাপেটিয়া নানা ধরনের নোনা গাং-এর মাছ আসে।

কয়েকটা হেজাক্ জ্বলে, ওদিকে কাঁটায় রাশি রাশি মাছ ওজন হচ্ছে, সরকার ওদিকে জাবেদা খাতায় এক এক জনের নামের পাশে তার মাছের ওজন—বাজারদর কত দাম এসব লিখছে।

ওই সব মাছ লঞ্চের ঘাটে বরফ দিয়ে বোঝাই করা হচ্ছে, পুরো বোঝাই হলে

রাতারাতি ওই লঞ্চ মাতলা দিয়ে চলে যাবে ক্যানিং-এর জেটিতে। সেখানে ট্রাকও মজুত। ভোরের আলো ফোটার আগেই হাজার হাজার টাকার মাছ পৌঁছে যাবে কলকাতার বাজারে। রতন নস্করের সেখানেও বাড়ি— আড়ত আছে। নিজেও যায় মাঝে মাঝে টাকার হিসাব নিতে।

নগার বাবাও এসেছে আড়তে আজ দু ঝুড়ি মাছ নিয়ে। নগার সঙ্গে আড়তে এসেছে রাজা। সে মাছের আড়ত দূর থেকে দেখেছে মাত্র। আজ এসেছে এখানে।

দেখে মাছ জেলেদের কাছ থেকে নেবার জন্য একদিকে বেশ বড় বড় বাটখাড়া রাখা আছে।

আর অন্য মহাজন যখন মাছ কিনছে তার জন্য আলাদা কাঁটা অন্যত্র, সেখানেও রয়েছে আর এক সেট বাটখাড়া।

সরকার নগার বাবাকে বলে—ওহে তোমার মাছ হয়েছে দু মণ সাত সের।

নগার বাবা বলে—পুরো দু'ঝুড়ি বোঝাই মাছ ওজন হলো মাত্তর দুমণ? আজ্ঞে সরকার মশায়, নিদেন তিন মণ তো হবেই। আরও দু'একজন জেলে বলে,

—সরকার মশাই ওজনটা একটু দ্যাখেন। এত মাছ আনি।

নন্দ সরকারের শীর্ণদেহ তখন জ্যামুক্ত ধনুকের মত বেঁকে ওঠে।

—কি বললি? আড়তে ওজনে মারি। এ ধম্মের কাঁটা বাপ ধন, দেখে নে। দ্যাখ—

এরপর আর বলার কিছুই নাই। রতন নস্কর নিজে এসে পড়ে। সেও শুনেছে ওজন নিয়ে এদের কথা। রতন বলে,

—ধম্মের কাঁটা এ নিয়ে কতা বললে অধম্ম হবে রে। আর যদি ত্যামন সন্দেহ হয় বাপু, আমার আড়তে মাছ আনিসনা। কেন আনবি?

লোকজন চুপ করে যায়। জানে দাদনের টাকা, জাল, নৌকা ভাড়া সহজে আর কোথাও পাবে না। অন্য আড়তও সেই গোসাবা না হয় ক্যানিং-এ। সেখানের মহাজনরা তাদের এসব দেবে না। তাই তারাও চুপ করে যায়।

নন্দ সরকার এবার আর এক কোপ মারার জন্য তৈরী। জাবেদা খাতা খুলে জনে জনে ডেকে বলে—আজ মাছ বাবদ তোর আমদানী তিনশো বাইশ টাকা, আড়তদারি শতকরা দশ টাকা, জাল ভাড়া, নৌকা ভাড়া দিনে একশ টাকা করে দুদিনে দুইশো, আর দাদন, তস্য সুদ বাবদ আশি টাকা, বাকী টাকা এই নে।

রতন বলে—নগদ কড়ি চুকিয়ে দাও হে সরকার। বাকী বকেয়ার কারবার করি না। দাও বিশ টাকা ছাড়ই দাও হে সরকার। অর্থাৎ দুদিন দুজনে গহিন গাং দিনরাত

খেটেছে প্রাণ হাতে করে তার দাম মাত্র— গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা, তাই নিয়ে ফিরে এলো।

নগা, নগার বাবা অবশ্য ওই হিসাবের ব্যাপারটা তত বোঝে না। রাজা বলে,

—দুদিন রাত খেটে শেষে এই পেলি?

নগার বাবা বলে—নির্ঘাত ওজনে মারে গো।

নগা বলে—দামেও ঠকায়। সিদিন লবুকাকা বললে গোসাবায় ভোলা মাছের মণ আড়াই শো টাকা, ই কত দিলেন? ওই শালা ঠ্যাঁটা সরকার, ওই রতন বাবু?

নগার বাবা বলে—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রতনবাবুর চেয়ে ওই সরকার আরও প্যাঁচালো রে।

ওরা বাড়ির দিকে চলে যায়। রাজা ফিরছে বাড়ির দিকে। ও বুঝেছে—ওই রতন নস্কর তার আড়তে ওই গরীব মানুষগুলোর সর্বস্বই লুটছে।

এর কোন প্রতিকারই নাই, বলারও কেউ নাই, রাজার মনে হয় সে যদি পারতো তাহলে এর প্রতিকারই করতো। রতন নস্করকে ক্রমশঃ চিনছে রাজা।

.....বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে গেছে, স্কুলের ছেলেদের প্রমোশন। কেদারবাবু এবার রাজার রেজাল্ট দেখে খুশী হন। ছেলেটা এবার ফার্স্ট হয়েছে আর অঙ্কে পেয়েছে একশোর মধ্যে একশোই। ইংরাজী বাংলাতেও ভালো নম্বর পেয়েছে।

রমেশ স্যার বলে—ছেলেটা দারুণ মাস্টারমশায়। খেলাধূলোতেও যেমন, পড়াশোনাতেও তেমনি।

কেদারবাবু বলেন—ছেলেটার উপর নজর রাখা হে, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দেখবে জেলার মধ্যে ফার্স্ট হতে পারে। স্কুলেরও নাম বাড়বে। শহরের মানুষরাও দেখুক বাদাবনের এঁদো স্কুলেও ভালো ছেলেরা পড়ে।

কেদারবাবুর মনের অতলে একটা বেদনাই রয়ে গেছে। অতীতে শহরেরই ছিলেন তিনি। সেখানের স্কুলেই চাকরীর চেষ্টা করতে শহরের স্কুলের কর্তারা পরোক্ষে তার বায়োডাটা দেখে বলেন।

—গাঁয়ের লোক শহরের স্কুলে এখানের ছেলেদের কি পড়াবেন?

কেদারবাবু তাই এই বাদাবনের স্কুলেই এসেছিলেন, বলেছিলেন,

—বুদ্ধিমান—ধনী শহরের ছেলেদের তুলনায় বাদাবনের তেজী ছেলেদেরই তিনি বেশী গুরুত্ব দেন। তাই তাদের মাঝেই যাবেন, দেখাবেন সেখানের ছেলেরাও কম নয়।

তাই করেছেন ক'বছরের চেষ্টায়। এ কালের অপরিচিত অতি সাধারণ ঘরের

ছেলেদের আজ কলকাতার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধীরেন নস্কর বড় ডাক্তার হয়েছে, ডাক্তার হয়েছে আরও অনেকেই, এখানের বেশ কিছু ছাত্র ইনঞ্জিনিয়ার উকিলও হয়েছে। হয়েছে কলকাতার স্কুলের শিক্ষকও।

রাজার মধ্যেও সেইরকম সম্ভাবনাই দেখেছেন তিনি।

রতন নস্কর এখন আরও বড় হবার স্বপ্ন দেখে।

অঞ্চল প্রধান এর পদে সে কয়েকবারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সারা আবাদ অঞ্চলে তার জাল ছড়ানো। এখানেও রাজনীতির ঢেউ এসে লেগেছে নিভৃত সুন্দরবনের গাং-এ, আকাশ বাতাসে।

এখন সমাজে টিকে থাকতে গেলে, কিছু করতে গেল রাজনীতির যষ্ঠিতে ভর করতেই হবে। রতনের জাল সদর শহর, মায় কলকাতা অবধি বিছানো! সেখানেও তার আড়ত, অন্য সব ব্যবসাপত্র রয়েছে।

তাই এখানের রাজনীতিতে সে একজন নামী মানুষ। আর কলকাতার নেতারাও তাকে পেয়ার করে। এখন গোবর্দ্ধনবাবু এদিকের এম এল এ।

শুধু এম এল এ-ই নয়, এম পি অর্থাৎ দিল্লীর এম পি নির্বাচনেও দরকার হয় রতনবাবুকে। রতনবাবু জানে এইভাবেই তার আধিপত্য বজায় রাখতে হবে।

তাই এম এল এ হলে কলকাতায় যাতায়াত করতে হবে, অঞ্চল প্রধান হয়েই যা করে সেটা এম এল এ হলে করা যাবে না। আর লেখাপড়ারও দরকার, সেটাও নাই। তাই রতন নস্কর এম এল এ, এম পি-দের বানায় তার এলাকা থেকে। তার মনোমত ব্যক্তিদেরই ভোটে জেতায় নিজের স্বার্থে।

সেই জন্যই রতন গোবর্দ্ধন বাবুকেই এম এল এ বানিয়েছে। গোবর্দ্ধন আঁশও বেশ করিতকর্মা লোক। বাদাবনের ওদিকে একেবারে সুন্দরবনের লাগোয়া অঞ্চলের কোন গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের টিচার ছিল।

অবশ্য স্কুল বলতে কিছুই নাই। গোবর্দ্ধনের একটা চালাঘরেই স্কুল দেখিয়ে খাতায় ইস্কুলের নাম তুলে সেখানে দু'চার দিন কয়েকটা ছেলেকে এনে বসিয়ে রেখে স্কুলের পত্তন হলো। আর পত্তন হয়েই মাস্টাররের মাইনের বিল চালু হতেই সেই চালাঘরের ছাত্ররাও চলে গেল।

বর্তমানে সেখানে গোবর্দ্ধনের গরু বাঁধার গোয়াল। তবে স্কুল চলছে, মাইনে যাচ্ছে গোবর্দ্ধনের নামে রতনবাবুর সুপারিশের।

সেই গোবর্দ্ধনকেই নেতা করেছে রতন।

আগে গোবর্দ্ধনের ছিল সিটকে পাকানো চেহারা। গ্রীষ্মে সাইকেলে চেপে মাঠ

ভেঙ্গে আসতো রতনের কাছে, পঞ্চায়েতের কৃষিঋণ, কার বার্দ্ধক্যভাতা, কার বলদঋণ, পাম্প সেট-এর ঋণের জন্য।

ওসব ঋণের জন্য তদবির তদারক করে ভালো টাকাই কেটে নেয়, গোবর্দ্ধন তার ভাগও রতনকে দেয়। আর বাঁধ বাঁধার কাজের ঠিকাদারীও করতো রতনের হয়ে।

সেই গোবর্দ্ধনকেই এম এল এ বানিয়েছে ক'বছর আগে রতনবাবু। সিট্‌কে গোবর্দ্ধন এখন নেতাগিরি করে কলকাতার পাইপের জলের মহিমায় আর নগদ বেশ কিছু পেয়ে গিরি গোবর্দ্ধনেই পরিণত হয়েছে। ইদানীং গোবর্দ্ধন পরের পয়সায় (নিজে আগে ধেনো গিলতো) বিলাতী দ্রব্য পান করে ঘাড়ে গর্দানে হয়ে উঠেছে। মেদবহুল দেহ, চোখ দুটো পিট পিট করে ধূর্ত শিয়ালের মত।

এখনও অবশ্য রতনবাবুর বশংবদ লোকই। গোবর্দ্ধন জানে ওই নেতাগিরি বজায় রাখতে গেলে তাকে রতন ভজনা করতেই হবে। রতনের আমদানী বৃদ্ধি যাতে হয় তাই দেখতে হবে। দেখেও, তাহলে নিজে একদিন মন্ত্রীও হতে পারবে! রতনবাবুও সেটা জানে।

গোবর্দ্ধন আসে মাঝে মাঝে এখানে। রতনবাবু মানী অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গঞ্জের বাইরে, তার বাগানেই একটা বাংলো করেছে। বাদাবন হলেও সেখানে সব ব্যবস্থাই আছে। মোজাইক করা হল ঘর, ওদিকে গেস্ট রুম, জেনারেটারও আছে বাগানে বিশেষ অতিথিরা এলে আলো জ্বালা হয়, কুয়ো থেকে পাম্প করে ছাদের ট্যাঙ্কে জল তোলা হয় লাগোয়া বাথরুমের জন্য।

সময় সময় বিশেষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও করা হয়। গোবর্দ্ধন এসেছে এখানে রতনবাবুর জন্য একটা বিরাট স্কিম নিয়ে। রতনবাবুই মতলবটা দিয়েছিল। তাই নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে, সেটা গোপন ব্যাপার।

অবশ্য অন্যকারণও আছে গোবর্দ্ধনবাবুর এখানে আসার। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে স্থানীয় এম এল এ থাকবে না তা কি হয়!

কেদারবাবু চেয়েছিলেন কোন প্রবীণ শিক্ষাব্রতীকে আনতে। কিন্তু এতদূরে লঞ্চের ঠাসাঠাসি ভিড়ে কলকাতা থেকে কেউ সহজে আসতে চান না। এসব অঞ্চল অবহেলিতই রয়ে গেছে এখনও দুর্গমতার জন্যই।

তাই ওই গোবর্দ্ধনের মত নেতারাই এখানে শোভা পায়।

স্কুলের মাঠে সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সারা এলাকার মানুষ জন শহরের দু'একজন পদস্থ লোক, বিডিও সাহেবও রয়েছে। মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করছে

গোবর্দ্ধনবাবু, রতন নস্কর প্রভৃতিরা।

ছেলেদের ভিড়, সারা মাঠ ভরে গেছে। এবার খেলাধূলা আর পড়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। হাততালির শব্দ ওঠে।

—রাজা দাস।

রাজা ভাবতে পারে না তাকেই ডাকা হচ্ছে মঞ্চে। বন্ধুরা বলে,

—যা রাজা, তোর নাম ডাকছে।

রাজা উঠে যায়। হাততালির শব্দ, রাজা মঞ্চে ওঠে। ওই রতন নস্করই তার গলায় পরিয়ে দেয় লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা বড় চকচকে মেডেল। আর পুরস্কার পায় জলপানি বাবদ একটা খামে নগদ একশো টাকা।

আজ রাজা খুশী হয়ে ফিরছে।

পথের ধারে দেখে নগা দাঁড়িয়ে আছে ভিড়ের মধ্যে, এসেছে গোলাবীও। কুড়োন সবসময় ঘরে থাকে না। রতনবাবুর কাঠ এর ব্যবসার জন্য সুন্দরবনের গহণে যায় কাঠ আনতে। ফলে হাট বাজার করতে হয় গোলাবীকেই, ইদানীং গোলাবীর গরুটার একটা বাচ্ছা হয়েছে, বেশ দুধ হয়। গোলাবী গঞ্জের দু'একটা ঘরে সেই দুধ রোজ পৌঁছে দেয়, কিছু পয়সাও পায়।

আজ গোলাবীও দেখেছে ওই সমারোহ। আর তাদের চেনা জানা মথুর খুড়োর ছেলে রাজাকে ওইভাবে সম্মানিত হতে দেখে সেও খুশী হয়েছে।

নগাই ছুটে যায়—রাজা! আরিব্বাসঃ ইটা কি রে গলায় চক্‌চক্ করছে!

রাজা বলে, মেডেল। নগা নেড়ে চেড়ে দেখে বলে—সোন্দর! তা পড় ভালো করে, উসব তো আমার কুনদিন হবে না। মেলা পড়ে পণ্ডিত হলে শেষে ভুলে যাবি না তো আমাদের?

গোলাবীও দেখে মেডেলটা। গোলাবী বলে—সবাই ভুলে যায় রে আমাদের।

রাজা বলে—না গো গোলাবী দি, তোমাদিকে ভুলে যাবো কেনে?

—না গেলেই ভালো। গোলাবী মন্তব্য করে।

রাজার পকেটে নগদ এত টাকা, তার বোনকে কোনদিন কিছু দিতে পারেনি। দশমীর মেলাতে একটা হার কিনে দিতে বলেছিল কলি বাবাকে।

মাই ধমকে ওঠে—এখন তোর দাদার পড়ার কত খর্চা বেড়েছে। তোকে হার দেব কোত্থেকে?

বাবা বলে—ধান উঠুক, হার দেব। কিন্তু দেখেছে রাজ ধান ওঠার পর ওই রতনবাবুর সরকার ধানের ভাগ, গতসনের দেনা, তার সুদ এই সব হিসাব জুড়ে অনেকটাকার ফর্দ দিয়ে প্রায় সব ধানই নিয়ে চলে গেল। ঘরে খাবার মত ধানও

তেমন রইল না। সুতরাং হারও কেনা হয়নি কলির।

আজ্ বোনের সেই বিষাদ করুণ মুখটাই মনে পড়ে তার। তাই বলে

—চল নগা, হাটতলায়।

নগা বলে—সিখানে কি করবি এখন?

—চলতো।

রাজা ওকে কিছু না বলে নিয়ে আসে হাটতলায় একটা দোকানে, ওখানে কিছু নকল গহনা—নানারকম চেনও পাওয়া যায়। সেখানেই দরদাম করে পছন্দমত একটা হার কেনে, লকেটটাও সুন্দর। দাম অবশ্য একটু বেশীই নিল, কিন্তু সুন্দর লকেটটা দেখেই কেনে রাজা। নগাও বলে—ভারী সুন্দর হার, লকেটটাও হেভি!

মথুর জানা এর মধ্যে স্কুলেও গেছল। তাকে কেউ আদর করে ডাকেনি। বসতেও বলেনি। তবু ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখেছে তার ছেলের ওই সম্মান।

বাড়ি ফিরেই হাঁক পাড়ে,—কই গো, শুনছো? বলি গেলে কোথায়? অ বউ!

সাবিত্রী চাল পাছড়াচ্ছে, ওদিকে কলি খেলছে। ইদানীং দাদার পুরোনো বই সেলেট নিয়েও সে বসে, আজও বসেছে। দাদাই অ আ লিখে গেছে শ্লেটে, সেগুলোয় দাগ বুলোচ্ছে। মথুর বলে—তোমার ছেলের কি নাম যশ গো! কত লোকজন এসেছিল!

—তুমি গেছলে? শুধোয় সাবিত্রী।

—যাবো নি? আরে আমাকে লুকে না চিনুক, দেখবে তোমার ব্যাটা একদিন কেউ কেটা হবেই। এক ডাকে এলাকার মানুষজন চিনবে রাজাকে।

সাবিত্রী বলে—বেঁচে থাক বাছা! তা কই এখনও এল না রাজা।

মথুর বলে—আসবে, আসবে, কত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে তো। ওই তো এসে গেছে।

ঢুকছে রাজা গলায় ঝুলছে লাল ফিতেয় সেই মেডেল। কয়েকটা নতুন বইও পেয়েছে। কলি ছুটে যায়। দেখছে মেডেলটা।

বলে সে—বেশ সুন্দর রে।

রাজা বলে—তোর জন্যও সুন্দর একটা জিনিস এনেছি।

—কই দেখি! কলিও ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

রাজা বলে—চোখ বোজ, একদম চোখ খুলবি না।

কলি দাদার কথামত চোখ বুজে থাকে। রাজা পকেট থেকে হারটা বের করে বোনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বলে—এইবার চোখ খোল।

কলিও চমকে ওঠে! সে আশা করেনি যে এমনি সুন্দর একটা হার সে এত

সহজে অবাঞ্ছিতভাবেই পেয়ে যাবে, খুব খুশী হয়।

—দ্যাখো মা, দাদা কেমন হার দিয়েছে, কি সুন্দর হার, সাবিত্রীও খুশী হয়। বলে—দাদাকে প্রণাম কর কলি।

হার পরে কলি দাদা, মা বাবাকেও প্রণাম করে। সাবিত্রী শুধায়, —এর দাম তো অনেক রে, টাকা কোথায় পেলি রাজা?

রাজা পকেট থেকে খামটা বের করে মায়ের হাতে দিয়ে বলে—হার ওই পঁচিশ টাকা দাম নিল, বাকী পঁচাত্তর টাকা ওতে আছে, রেখে দাও ইস্কুল থেকে জলপানি পেয়েছি।

সাবিত্রী টাকা মাথায় ঠেকিয়ে রাখে।

রাজা বলে—কলি এখন ওটা পর, পরে দেখবি একদিন তোকে আসল সোনার হারই গড়িয়ে দেব বড় হলে। কলি খুবই খুশী। বলে সে—দ্যাখ দাদা। আমাদের কৃষ্ণচূড়া গাছটা কেমন পাতা ফেলেছে, কখন ফুল ফুটবে রে?

সাবিত্রী বলে—ওতো এখন ছোট তোর মতই। তোর বিয়ের ফুল ফুটলেই ওর ডালেও ফুল ফুটবে।

—ধ্যাৎ! কলির কথাটা যেন ঠিক পছন্দ হয় না।

গোলাপীর মনটা ভালো নাই। কুড়োন কতদিন জঙ্গলে গেছেন এখনও ফিরল না, একা ঘরে মন বসে.না। ভেবেছিল তার ঘরেও আসবে একটি ছোট শিশু। তবু তাকে নিয়েই দিন কাটবে, কিন্তু তাও অসেনি। কুড়োন থাকলে ঘরের কাজ অনেক বাড়ে। তার ফাই ফরমাস তো আছেই, এছাড়া কুড়োন আড়ত থেকে রকমারি মাছ আনে। গোলাবী বলে—মাছের বাজার বসাবে নাকি গো? মাছ বিচবে নাকি?

কুড়োন বলে—মাছ তো এখানে অনেকেই বেচে, আমি মাছ আনি খাবার জন্য। রতনবাবুর আড়তে কত মাছ, দামও দিতি হয় না। বেশ গরগরে করে রাঁধ ধনে পাতা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে। আর ওই পারশেগুলো কড় কড়ে করে ভাজবি।

খেতেও পারে কুড়োন, দশাসই মরদ। হাতের পেশীগুলো ঠেলে ওঠে, বলে—না খেলে গাং-এর তুফানের সঙ্গে লড়বো কি করে রে?

কুড়োন থাকলে গোলাবীর দিনগুলো কোনদিকে কেটে যায় জানতে পারে না। গোলাবী বলে—বনে জঙ্গলে না গেলেই নয়? গঞ্জেই কাজ নাও না বাপু।

হাসে কুড়োন—দূর পাগলী, সুন্দরবনের মায়াও কম লয় রে—গাং, সবুজ হলুদ বন, ওখানে যে গেছে, বন তাকে ডাকে বারবার।

—আমার দিকেও লজর নাই তুমার? গোলাবী অনুযোগ করে। শক্ত হাতে

গোলাবীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে কুড়োন।

—আছে রে আছে। বনে গেয়েও তুকেই মনে পড়ে, ভাবছি দু'একক্ষেপ বনে যেয়ে আর যাবো নাই।

গোলাবী স্বপ্ন দেখে সেই নিবিড় স্পর্শের, হঠাৎ কার ডাকশুনে চাইল, এসেছে নন্দ সরকার, ওই রতনবাবু লোক।

নন্দ বলে, নস্কর মশাই একবার ডেকেছে তোকে, গোলাবী ওই রতন নস্করকে ভালো করেই চেনে। লোকটা মাঝে মাঝে আসে এদিকেও ওর চোখে লোভী শিয়ালের চাহনি। গোলাবী শুধায়—কেনে গো?

নন্দ বলে—তাতো জানি না, বল্লেন একবার দেখা করতে। তা বৈকালে বাগানে থাকবে, সিখানেই গেলে দেখা পাবি, যাবি কিন্তু।

নন্দ সংবাদটা দিয়েই চলে যায়।

গোলাবীর মনে হয় কুড়োনের কোন খবরই আছে বোধহয়। অবশ্য খরচ পত্র আনতে গোলাবীকেও যেতে হয রতনের গদি ঘরে, আজ বৈকালে বাগানে যেতে বলে গেল কেন ঠিক বুঝতে পারে না গোলাবী।

গোবিন্দবাবু এখন বাগানেই রয়েছে, রতনও রয়েছে। টেবিলের উপর একটা বড় নক্সা, নক্সাটা এই শ্যামপুর, কলসকাটি, পীরখালির তামাম জমির নক্সা। জমি-বাস্তু-কার জমি এসবের দাগনম্বর খাতিয়ান নং, মৌজার নাম এসব লেখা আকিবুঁকি কাটা, চারিদিকে এর নদীর সীমানাও দেওয়া আছে।

বুদ্ধিটা রতনবাবুর মাথাতেই এসেছিল, কারণ খুবই উর্বর ওর মস্তিষ্ক। কলকাতার আড়তে মাছের ব্যবসাও করে, দেখেছে ইদানীং হঠাৎ বাগদা চিংড়ির বিদেশে খুবই দাম। এক কেজি মাছ সেখানে কম করে, ছ'সাতশো টাকায় রপ্তানী হচ্ছে, তাও শুধু ধড়টুকুই।

বাজারে চিংড়ির দাম এখন সোনার মতই। দু চারজন তাদের মেছো ভেড়িতেই চিংড়ির চাষ করছে। আবাদের অনেক অঞ্চলে নোনা গাং-এর ধারের ধানজমিতেই বাঁধ দিয়ে নদীর জোয়ারের সময়, বাক্স কল বসিয়ে জোয়ারের জলে সেই ভেড়ি পূর্ণ করে ধান জমিকে ভেড়িতে পরিণত করে সেখানে বাইরের ছেলে মেয়েদের ধরা চিংড়ির মীন কিনে সেই জলে চিংড়ির ফলাও চাষ করে হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে বিদেশে চালান দিয়ে।

এখানের বেশী জমিতে শুধু একবার ওই ধানই হয়। তাও বৃষ্টি হলে হবে, ভেড়ি না ভাসলে তবে হবে। কিন্তু বৃষ্টিরও স্থিরতা নাই আর বাঁধ মেরামতের নামে টাকার

শ্রাদ্ধ হয়, মায় অঞ্চল প্রধান, নেতারা আর ঠিকাদারদা সব খান, বাঁধ জীর্ণতর হতে থাকে, ভেঙ্গেও যায়। নোনা জল মাটিতে বসলে নিদেন একবছর ধান হবে না।

সেই সব জমিতে বাঁধ দিয়ে চিংড়ির ভেড়ি করতে পারলে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা এসে যাবে। রতন নস্করও চায় এই পীরখালি মৌজার বিস্তীর্ণ ধান জমি নিয়ে চিংড়ির ভেড়ি বানাতে।

গোবর্দ্ধন বলে—ব্যাঙ্ক থেকে জমি ফমি দেখিয়ে লাখ পাঁচেক টাকা লোনও করে দেব রতনদা। ঘরের টাকাও লাগবে না, তোমার ভেড়িও হয়ে যাবে, নিদেন বছরে আমদানী হবে আট দশ লাখ টাকা। তবে আমার কিঞ্চিৎ—

রতনও জানে গোবর্দ্ধন এখন এইভাবে পরের ঘাড়ে খেয়ে গিরি গোবর্দ্ধন রূপে বিরাজমান। অবশ্য গোবর্দ্ধন রতনদাকে ভেড়ি মেরামতের মোটা ঠিকেই দেয়।

এখান থেকে নদীপথে বাংলাদেশের দূরত্ব তেমন বেশী নয়, অবারিত নদীপথ, উন্মুক্ত প্রায় সীমান্ত। রতনবাবু এখন রাতের অন্ধকারে বিদেশী মালও আনে—আর এদিক থেকে পাঠায় কাপড়-সাইকেল-যন্ত্রপাতি, ওষুধ, এসব বেচেও লাভ করে—ওদিক থেকে মাল এনেও লাভ।

এ যেন শাখের করাত, আসতেও কাটে! যেতেও কাটে, দুদিকের ডবল লাভের কারবারে পুলিশের হ্যাঁপা সামলায় গোবর্দ্ধনবাবু, এখানের থানার দারোগাও রতনের পোষ্য।

তাই গোবর্দ্ধনকে কিঞ্চিৎ দিতে বাধে না রতনের, কিন্তু রতন জানে এই মৌজার বেশীরভাগ জমি তারই স্বনামে বেনামে সব আছে, এছাড়াও গ্রামের অন্যদের অনেক জমিও রয়েছে। বিশেষ করে নদী থেকে জল তুলে ভেড়িতে পুরতে হবে, দরকার মত বের করে দিতে হবে ভাঁটার সময় নদীতেই। সেই নদীমুখের পাঁচ বিঘে ধানজমি ওই মথুর জানার, ওপাশেই তার বসত বাড়ি, সেটা অবশ্য একটু দূরে।

কিন্তু ওই পাঁচ বিঘে জমি না পেলে দু হাজার বিঘের ভেড়িই হবে না, মধ্যেও অন্যলোকের জায়গা আছে।

গোবর্দ্ধন বলে, ব্যাঙ্কের টাকা। কিছু দাম বেশী দেবে, ওরা ঠিক বিক্রি করবে, নাহলে বোঝাও বছরে ওই জমি থেকে যা পাস, তার দ্বিগুণ টাকা বছরে লিজবাবদ দেব। বসে বসে টাকা পাবি, আর ভেড়িতেও বহু লোকের কাজের ব্যবস্থা হবে, তোরাও ভেড়িতে কাজ করবি-রোজ পাবি। জমির বছরের লীজের টাকায়, হাত দিতে হবে না।

রতনও ভাবছে কথাটা, লীজের নগদ টাকা আগাম দিয়ে জমির দখল পেলে তারপর কি করবে সে জানে।

হঠাৎ বাগানের ফটক দিয়ে গোলাবীকে ঢুকতে দেখে গোবর্দ্ধন চেয়ে থাকে।

বৈকালের হলুদ রোদ ছায়া কালো ডোরা কাটছে মাটিতে, শান্ত পরিবেশ ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে আসে যোয়ারে মাতা গাং-এর উচ্ছাস, পাখীর ডাকভরা শান্ত বনভূমিতে ওই যৌবনবতী মেয়েটা আসছে, যেন গোবর্দ্ধনের বুকে তুফান ওঠে।

রতন নস্করের মুখের ভাবটায় কিছু প্রকাশ পায় না। তবে রতন দেখেছে গোলাবী যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। গোবর্দ্ধনকে হাতে আনার একটা অস্ত্র সে পেয়েছে। রতন হিসাব করে শুধু গোবর্দ্ধন কেন আরও অনেককেই এই টোপ দেখিয়ে সে খেলাতে পারবে। গোলাবী বলে,

—কি গো মালিক, জরুরী তলব? কি ব্যাপার?

রতন খুব সহজভাবেই বসে—আয়-আয় গোলাবী। কেমন আছিস?

গোলাবী এমনিতেই মুখরা। তার জিবটাও ওর রূপের মতই শানানো, ঝকঝকে। বলে গোলাবী অনুযোগের সুরে।

—আর ক্যামন আছি? একা এককোণে পড়ে থাকি, খপরও নাও না।

তা আমাদের ঘরের লুকটা কোথায় গো?

হাসে রতন—ফিরবে, ফিরবে। তাই তো ডেকেছি। পরশুই কলকাতার করাতকলে মাল খালাস করে ফিরবে।

হ্যাঁ, খর্চার টাকা শ তিনেক রাখ। আর দরকার হলে বলবি। টাকাটা দিয়ে বলে রতন।

—একখান শাড়ি এনেছিলাম, নিয়ে যা। পরবি।

গোলাবী টাকাটা খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলে—শাড়ি, শাড়ি কেনে গ?

—দিতে নাই? রতন নিষ্পাপ কণ্ঠে বলে আপনজনের মত।

তা লয়। তা এনেছো দাও। চলি। —গোলাবী বলে

শাড়িটা নিয়ে গোলাবী চলে যায় যৌবনের লহর তুলে। সেই ঢেউ যেন নদীর দুকূলকেই কি সোচ্চার কলতানে আঘাত করে নদীতে আবর্ত তোলে। আবর্ত তোলে এদের দুই জনসেবকের বুকেই। গিরি গোবর্দ্ধন বলে,

—কে হে মেয়েটা?

রতন বলে—ব্যাঙ্কের অফিসারকেই আনো, লোনের ব্যবস্থা হয়ে যাক। ওই মেয়েটারও খবর ঠিকই পাবে,

হাসছে গিরি গোবর্দ্ধন, ভুঁড়িতে মৃদু মন্দ ঢেউ তুলে হাসে। বলে সে—হয়ে যাবে রতনদা, ভেড়ি তোমার হবেই। লেগে যাও। জমিগুলো দখল করো।

কেদারবাবু রাজাকে এবার বৃত্তি পরীক্ষায় পাঠাতে চান, অবশ্য আরও তিনজন ছেলে এই প্রাথমিক বিভাগ থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, তবু কেদারবাবুর বিশ্বাস রাজা

জেলার মধ্যে ফার্স্ট হতে পারে, তাই তিনিই বলেন—রাজা, স্কুলের পর বৈকালে আমার বাড়িতে আসবে, ইংরাজী অঙ্ক বাংলা এগুলো দেখিয়ে দেব।

রাজা তাই আসে এ বাড়িতে। ছোট বাড়িটার চারিদিকে বেশ কিছু ফুলের গাছ, মাস্টার মশাই নিজের হাতে এসব করেন। বলেন—যেখানে থাকবে সেই পরিবেশটাকে সুন্দর করে রাখবে, এতে কাজে নিষ্ঠা বাড়ে।

রাজা এখানে আসে, কমলাও ছেলেটাকে ভালোবাসে, স্কুল থেকে আসে সে আর শিখা, মা ওদের দুজনের জন্যই মুড়ি-শশা-গুড় এসব রাখে।

—নে খা রাজা।

রাজা মুড়ি দেখে বলে—এতো!

শিখা বলে—লজ্জা করছে ওর মা!

কমলা বলে—লজ্জা করবে কেন? ওতো ঘরের ছেলের মতই। খা রাজা।

রাজা পড়তে বসে জলখাবারের পর, শিখার পড়ায় তেমন মন নেই।

ও বসে ওদিকের ঘরে হার্মোনিয়াম নিয়ে। কমলা অতীতে গান গাইত, এখানে এসে সেই চর্চাটা তেমন ছিল না। হার্মোনিয়ামটা পড়েই ছিল। শিখা বড় হতে ক্রমশঃ সেই নাড়াচাড়া শুরু করে। কমলার জীবনেও যেন হারানো সুর ফিরে আসে আবার। শিখাকে সে ও গান শেখাতে শুরু করে, এখন শিখা ভালোই গায়, এই বাদাবনে যেটুকু গান শেখা সম্ভব সে শিখেছে।

রাজা পড়তে পড়তে ওই গান শোনে। তার গান ভালোই লাগে। এখানে নৌকার মাঝি, বাওয়ালিরা গায় ভাটিয়ালী, মুর্শেদী গান, গঞ্জের হাটতলায় মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকরা যাত্রা গানও করে।

সোনাভানের পালা, বাবা দক্ষিণারায়ের গান, মা বনবিবির বন্দনা এই সবই শুনেছে সে, লোকগীতি বলা যায় তাকে, সহজ সরল ভাষায় গ্রাম্য জীবনের গান।

কিন্তু শিখার গান সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। রেডিওতে শুনেছে এমনি গান, এর ভাষার বাঁধুনিও সুন্দর, ভাবময় আর সুরও মনকে স্পর্শ করে। গঞ্জে অনেকেরই রেডিও আছে, তাতে শুনেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, মনকে সহজেই স্পর্শ করে এই গান।

রাজা তন্ময় হয়ে শোনে শিখার গান, গানটা যেন এর আগে রাজা রেডিওতে শুনেছিল কোন বড় গাইয়ের গাওয়া এই গান। রাজা ওই গানের বানীগুলো উৎকর্ণ হয়ে শোনে, নিজেই ওই সুরে গুণ গুণ গায়।

ওই গানটা শিখা প্রায়ই গায়। রাজা তখন উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

মাস্টারমশাই কেদারবাবু ততক্ষণ তৈরী হয়ে আসেন—কতদূর হলো পড়া?

পড়ার মধ্যে ডুবে যায় রাজা, পড়তে পড়তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত নামে। হঠাৎ

খেয়াল হয় কেদারবাবুর,

—ইশ্ রাত হয়েছে, আজ যা রাজা।

কমলাও কাছেপিঠেই ছিল বলে—খেয়েই যা রাজা, আজ ইলিশ মাছ হয়েছে, ভালো মন্দ কিছু হলে কমলা ওকে না খাইয়ে ছাড়ে না, রাজাও এ বাড়ির যেন একজন হয়ে গেছে।

শিখা বলে—রাত হয়েছে, একা ফিরতে পারবে তো?

—কেন?

শিখা বলে—ভূতের ভয় করবে না?

রাজা হাসে, বলে—ভূত পেত্নী আমার ধারে কাছেও আসবে না।

বের হয়ে যায় রাজা তারাজ্বলা অন্ধকারে। শিখা বলে,—সাবধানে যেও।

অবশ্য রাজা এমনিতেই সাহসী, ডাকাবুকো।

সেদিন স্কুল থেকে কিছু ছেলেমেয়ে পিকনিক করতে চলেছে গঞ্জের একটু দূরে বড় নদীর ওখানে একটা সুন্দর জায়গা আছে, গাছ গাছালিও রয়েছে সেখানে রাজা যাবে না। শেষ অবধি শিখাই বলে—তুমি না গেলে আমিও যাবো না।

আসল কারণটা শেষ অবধি বলে রাজা,

—পিকনিকে পাঁচটাকা করে চাঁদা ধরেছে, আমার তো নেই।

শিখা হেসে ওঠে, বলে

—ওমা, কি বোকা তুমি।

—কেন?

—কথাটা আমাকে বল্লে শেষকালে, আরে বাবা আমার নিজেরই পঁচিশটাকা আছে, তার থেকে আমিই দেব।

রাজা বলে কুণ্ঠিত স্বরে—শোধ দেবো কি করে? এত টাকা?

শিখা বলে—সে পরে দেখা যাবে। চলোতো।

রাজাও গেছে পিকনিকে দল বেঁধে নদীর ধরে। দিনভোর বেশ হৈ চৈ করেই কাটে, খাওয়া দাওয়ার পর ওরা ফিরছে নৌকায়।

এমনিতেই নৌকায় উঠেছে অনেকেই, একেবারে টইটম্বুর ভিড়। গাং দেশের ছেলে, ওরা গাং-এর তীরেই মানুষ। তবু এই গাং এমনিতেই মারমুখী, এর নোনা জলে কুমীর কামটের আনাগোনা।

ওরা ফিরছে তখন ভরা জোয়ার। নদী দু কানায় বইছে আর সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে সে তখন মাতাল, নৌকা স্কুলের ঘাটের দিকে আসছে, ছেলেরাও হুড়োহুড়ি করতে

স্রোতের টানে নৌকা টলতে থাকে, একদিকে কাৎ হয়ে যায় আর ওদিকে বসেছিল শিখা, ছেলেদের চাপে সে ছিটকে পড়ে গাং-এ।

গেল গেল রব ওঠে। স্রোতের টানে ভেসে চলছে, রাজা এদিকে ছিল নৌকায় ওই ব্যাপার দেখে সে ও লাফ দিয়ে পড়ে।

নিপুণভাবে সাঁতার কেটে রাজা গিয়ে ধরেছে ডুবন্ত শিখাকে, শিখার চোখের সামনে মৃত্যুর করাল ছায়া, আর্তনাদ করে ওঠে—বাঁচাও!

রাজা ওর হাতটা ধরেছে, স্রোতের টান ওদের টেনে নিয়ে যেতে চায় মাঝ গাং-এর দিকে, রাজা শক্ত করে ওর হাত ধরে কোনমতে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করে। ততক্ষণ খবরটা ছড়িয়ে পড়ছে, কেদারবাবু অন্য শিক্ষকরাও ছুটে বের হয়ে আসেন স্কুল থেকে।

দু'একজন চীৎকার করে। এর মধ্যে একটা মাছ ধরার নৌকা ওদের দেখে কাছে এসে পড়ে, রাজা ওই স্রোতের টানেও ছাড়েনি শিখাকে। নৌকাটা আসতে রাজাই নৌকার হাল বেয়ে উঠে পা রেখে ডুবন্ত শিখাকে মাঝ গাং-এর বুক থেকে টেনে নৌকায় তোলে।

তীরে আনে তখন শিখা প্রায় অচেতন। খবর পেয়ে চরণ ডাক্তারও এসে পড়ে, দেখে শুনে বলে সে,

—বাবারা ভিড় হঠা, কিছুই হয়নি, হাওয়া আসতে দে, একডোজ ওষুধ যা দিয়েছি জ্ঞান ফিরে আসবে এখুনিই।

জ্ঞান ফেরে, বেশ কিছুটা নোনা জলও বমি করে একটু ধাতস্থ হয় শিখা, কমলাও খবর পেয়ে বাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে মেয়েকে উঠে বসতে দেখে সেও নিশ্চিন্ত হয়।

কেদারবাবু ওই জোয়ারে ভরানদীর বুকে শিখাকে বাঁচাবার জন্য রাজার ওই লড়াইটা দেখেছেন, এত ছেলেদের মধ্যে কেউ জলে নামেনি, রাজাই আজ তার একমাত্র মেয়েকে বাঁচিয়েছে, গোলাপীও দুধ দিতে যাচ্ছিল গঞ্জে, সে তো দেখে রাজার ওই লড়াই, আজ যেন সেও ছেলেটাকে চিনছে নতুন করে।

কমলা বলে রাজাকে—আজ তুই যা করেছিস তার জন্য জীবনভোর ঋণী থাকলাম রাজা।

রাজা শীতে কাঁপছে, প্যান্ট জামা ভিজে গেছে, কেদারবাবু স্কুলটিমের প্যান্ট আর জারসী দিয়ে বলেন—ওই জামা প্যান্ট ছেড়ে শুকনো এগুলো পর রাজা। ওরে কেউ একটু গরম দুধ নিয়ে আয়!

রাজা বলে—ওসব কিছুই লাগবে না স্যার, আমি বাড়ি গে ছেড়ে নেবো এসব।

দৌড়াল সে বাড়ির দিকে। আজ রাজাও খুশী, স্যার তার জন্য এত করেছেন—সে নীরবে ওর দান গ্রহণই করেছে, আজ তবু কিছু করতে পেরেছে তাতেই খুশী রাজা।

রতনবাবু পা ফেলে হিসাব করে, এখন তার ধ্যানজ্ঞান ওই চিংড়ির ভেড়ি তৈরী করা। অঞ্চল প্রধান হিসাবে রতনের কাছে অনেকেই কৃষি ঋণের দরখাস্ত করে, পাম্পসেটের জন্যও লোন নিতে আসে। সে সব ক্ষেত্রে জমি বন্ধক রাখতে হয়। পঞ্চায়েতের কেরানী হরিও রতনের লোক। রতন এসব জায়গাতে তার পেটোয়া লোকেদেরই রেখেছে। এবারও ওই পীরখালি মৌজার অনেকেই লোনের জন্য ফর্ম দিয়েছে, রতনও দেখেছে তাদের জমি যা বন্ধক রাখতে হবে সেগুলো পীরখালি মৌজাতেই রয়েছে তার পরিকল্পিত ওই ভেড়ির মধ্যেই।

রতন জানে কিভাবে বাঁকা পথে কাজ হাসিল করতে হয়। পঞ্চায়েতের কেরানী হরিকে বলে,

—ওদের দলিল বন্ধক রয়েছে আমার কাছে তাই দলিলে পরে নাম বসিয়ে দেবে, এখন ঘরটা খালিই রাখবে হে দরখাস্তের ফর্মে।

হরিও বেশ চালু পুরিয়া। সে বুঝেছে ওখানে কিছু ব্যাপার আছে, তাই বলে—ওটা কি করে হবে? বন্ধকদার তো সরকার, ঋণ দিচ্ছে সরকারই।

রতন পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে হরির দিকে এগিয়ে দেয়। হরিও জানে এর পর কি করতে হবে, সেও ওটা পকেটস্থ করে বলে,—তাই হবে, এখন ওখানটা ফাঁকাই থাকবে।

রতন জানে ওইভাবেই কিছু জমির মালিককে হাতে আনা যাবে। তবুও সে সব জমির মালিকদেরই ডাকিয়ে আনে তার বাড়িতে। সেদিন ওদের জন্য মাছের চপ আর চায়ের আয়োজন করে রতন ভাষণ শুরু করেন।

—আমাদের এলাকায় ব্যাপক কর্মসংস্থান এর কথাই ভাবছি হে, আর কিছু টাকা আনতে পারলে সেটা এখানের মানুষদের কাজে লাগবে।

সকলেই এই মহৎ উদ্দশ্যেকে সমর্থন করে।

—তাতো ঠিকই, কিছু করুন প্রধান মশাই!

রতন বলে—তাই ভাবছি আশপাশে মালঞ্চ, মীনাখাঁৎ, হাড়োয়া অঞ্চলে ওরা চিংড়ির ভেড়ি করেছে, এখন চিংড়ি মাছ বিলেতে পড়তে পাচ্ছে না। পাঁচ-ছ'শো টাকা কিলো, নগদ পয়সা। তোমরা জমিতে সারা বছর খেটে কি পাও? তাও বৃষ্টি

হলে কিছু হয়, কখনও বন্যায় সব ভেসে যায়, তাই বলছিলাম বিঘে পিছু বছরে দু হাজার টাকা করে সেলামী পাবে।

কেউ বলে—জমি নে পড়ে আছি। খাটি ওখানেই, লোকেও মজুরীর পয়সা পায়। জমিতে ভেড়ি হলে—

নন্দ সরকার তার মনিবের থেকেও চালু, সেইই বলে

—ভেড়িতে তো কত লোক রোজ লাগবে বল? ভেড়িতে কাজ করবি, তার জন্যও মজুরি পাবি।

রতন বলে—ভেবে দ্যাখো সবাই, বছরে বিঘে প্রতি দু হাজার করে টাকা পাবে, আর ভেড়িতে কাজ পাবে রোজ নগদ দাম মিলবে।

চাষ করে বিঘে প্রতি এই টাকা লাভ পাও খর্চা— বাদ দিয়ে? বলো?

ওরা তা পায় না জানে, তবু মাটির টান বড় টান।

রতন বলে—এখন জমি ছাড়লি বিঘে প্রতি হাজার টাকা করে আগাম পাবে, আর রোজ কাজও মিলবে।

একটা গুঞ্জন ওঠে, রতন দেখে এর মধ্যেই দুটো দল হয়ে গেছে, একদল রাজী, অন্যদল এখনও কথাটা ভাবছে, রতনবাবু বলে—কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখো তোমরা, তারপর জানাবে। অবশ্য আগাম টাকাটা যদি বাড়াতে পারি চেষ্টা করবো।

মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে, কথাটা নিয়ে সারা আবাদের ক'খানা বসতিতে আলোড়ন শুরু হয়, রতন লক্ষ্য করছিল মথুর জানা ওই মিটিং-এ আসেনি।

নন্দ সরকারও বলে—লোকটা একটু বাঁকা ধরণের কত্তা!

রতন ভাবছে কথাটা।

এদিকে পাঁচ লাখ টাকা হাতাতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। গোবর্দ্ধনবাবু অবশ্য এর মধ্যে শহরের এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে এখানে নিয়ে আসবে, আরও বলে গেছে সে সেদিন যেন একটু বিশেষ ব্যবস্থা থাকে আপ্যায়নের।

গোবর্দ্ধন সেই গোলাবীর কথাটাও ভোলেনি। ওই ব্যাঙ্কের সাহেব নাকি একটু বিশেষ কিছু পেলে খুশি হয়। রতন ভাবছে কথাটা।

কুড়োন এসেছে কদিন আগে। গোলাবী এখন যেন এক স্বপ্নজগতে বাস করছে। কুড়োন সেদিন গেছে গঞ্জের হাটে, সকালেই রতনবাবুকে আসতে দেখে গোলাবী একটু অবাক হয়।

ঘরের কাজ করছিল, কাপড়চোপড়ও বেসামাল অবস্থায় রয়েছে। রতনবাবু থমকে দাঁড়ায় ওকে দেখে। একটি উচ্ছল যৌবনা মেয়েকে এত কাছ থেকে এভাবে

দেখেনি সে, তার বুকে ঝড় ওঠে।

গোলাবীরও নজর এড়ায় না, মেয়েদের চোখে পুরুষের মনের ঝড়ের খবর অজানা থাকে না।

তবু সহজ হবার চেষ্টা করে বলে সে,

—বসেন গো।

রতন বলে— বসবো না, শোন!

কি যেন ভেবে নেয় রতন। তার মাথায় শয়তানি মতলবগুলো অতি সহজেই খেলে যায়। অবশ্য মুখে তার কোনও রেখাপাতই করে না। বলে রতন,

—কুড়োন নাই?

—উ গঞ্জের হাটে গেছে।

রতন বলে— এলেই আমার ওখানে যেতে বলবি। খুব দরকার।

চলে যায় রতন।

তার মাথায় তখন একটা মতলব গজিয়ে উঠেছে। সে জানে কিছু পেতে গেলে একটা পথ বের করতেই হবে। এই মতলব হাসিল করতে পারলে রতন এক ঢিলে দুটো পাখী মারতে পারবে।

ব্যাঙ্কের লোনও পাবে। পেতেই হবে তাকে। তার জন্য টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে গোলাবীকে আর তারপর গোলাবী আসবে তার হাতে!

এই গঞ্জের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ওই রতন। তার চাওয়ার পথে কোন বাধাই সে রাখবে না। তার জন্য যা করার তাই করবে।

খবর পেয়ে কুড়োন এসেছে রতনবাবুর গদিতে, রতন তখন হিসাবপত্র নিয়েই ব্যস্ত। কুড়োন বলে,

—কি ব্যাপার গো মালিক, সবে ক'দিন এলাম বাদাবন থেকে। শহরের গাং টহল দে মাল পৌঁছে দিলাম, হঠাৎ আজ তলব?

রতন ভেবেই রেখেছিল, বলে— একটা জরুরী কাজে আজ সন্ধ্যার সময় তোকে ক্যানিং-এ যেতে হবে। ওরা রাতে আড়তে থাকবে— সেখানে চিঠিখানা নে গিয়ে সরকারকে দেখাবি। ও চিঠি লিখে দেবে ওই ভোরের মধ্যে ফিরে এসে খবরটা দিবি, খুব জরুরি কাজ রে— ত্যামন কেউ নাই তুই ছাড়া যে ভরসা করে পাঠাই। ওই ছোঁড়াগুলোকে বিশ্বাস নাই, ঠিকমত খবর না পৌঁছালে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে রে।

কুড়োনের কাছে এ এমন কঠিন কাজ কিছুই নয়। এক জোয়ারে ডিঙি নিয়ে চলে

যাবে, ফিরতি ভাঁটায় ফিরে আসবে।

রতন একটা কড়কড়ে একশো টাকার নোট দিয়ে বলে—এটা রাখ, সন্ধ্যার মুখে এসে চিঠিখানা নে যাবি।

কুড়োন বলে, ঠিক আছে।

কুড়োন বাড়ি ফিরতেই গোলাবী বলে, —কি ব্যাপার গো, হঠাৎ রতনবাবু এলো?

কুড়োন বলে, —ঠ্যালায় পড়লে ঢ্যালায় দণ্ডবৎ করে, তাই হয়েছে রতনবাবুর। কি জরুরী কাজে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ক্যানিং-এর আড়তে যেতে হবে, ডাক কুড়োনকে। এসব কাজ অন্যকে দিয়ে ভরসা পায় না। নে রাখ— টাকাটা বের করে দেয় কুড়োন। গোলাবী বলে, —আবার বেরুতে হবে?

কুড়োন তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—সন্ধ্যায় যাবো, সকালে ফিরবো। একটা রাত তো, তারপর তো থাকছিই, এবার বলে দেবো মালিককে গঞ্জের আড়তেই কাজ দাও, বনে বাদাড়ে আর নাই।

—ঠিক তো? গোলাবীও ঘর বাঁধতে চায়, বলে কুড়োন—হ্যারে! দেখিস, কুড়োন এবার তোর হাতেই বাঁধা পড়বে, কুড়োনও এবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে, ওই বনের জীবন থেকে সে সরে আসতে চায় পল্লীর শান্ত গৃহকোণে।

সন্ধ্যার পরই কুড়োন গেছে রতনবাবুর কাছে, চিঠি নিয়ে বের হয়ে যায় সে। রতনবাবু বলে।

—সাবধানে যাবি, জরুরী চিঠি কিন্তু জবাব নে কালই ফিরবি কুড়োন!

—ও হয়ে যাবে গ। কুড়োন বের হয়ে আসে।

গাং-এর ধারে রতনবাবুর নৌঘাটিই বলা যায়। ছোট বড় অনেক নৌকা মজুত থাকে। অনেক নৌকা মেরামতও করা হয়।

সার সার ডিঙ্গি রয়েছে, শরৎ গুণীন ওইসব ডিঙ্গির তদারক করে, সেইই বলে—ওই কোণে ডিঙ্গিখানেই নে যাও কুড়োন।

কুড়োন ওই ডিঙ্গি নিয়েই রওনা দেয়। ছোট নদীটা বেয়ে গিয়ে মাতলায় পড়তে হবে, জোয়ার চলছে, জল ঠেলছে এখন উপরের দিকে তীব্র বেগে। যেন সমুদ্র হানা দিতে তার দূতদের পাঠিয়েছে। ছোট ডিঙ্গিখানা একাই বাইছে সে। বাইতে হয় না। হালকা ডিঙ্গি স্রোতের টানে তরতর করে ছুটে চলেছে, হাল ধরে বসে আছে কুড়োন।

বিস্তীর্ণ গাং, পুরন্দরের মোড়, মাতলা এখানে মাতাল, সীমাহীন। আবছা তারার আলোয় দেখা যায় শুধু জলের বিস্তার, আসমানে ঝকঝক করছে তারাগুলো।

নির্জন নদী, একা চলেছে কুড়োন। এই সীমাহীন জলরাশির মধ্যে একটা চলিষ্ণু বিন্দুর মত ডিঙ্গিটা চলছে। নৌকার গায়ে ঢেউ ভাঙ্গার কলকল শব্দ ওঠে। কুড়োন চলেছে, হঠাৎ চমকে ওঠে, খেয়ালও করেনি সে।

ডিঙ্গির নীচেকার একটা পাটাতনের চারিপাশ থেকে ফিনকি দিয়ে জল উঠছে, তীর ভূমির দেখা নাই। উত্তাল মাতলার মাঝখানে এই বিপদ, তলের তক্তটা বোধহয় আলগাই ছিল, ওর চারপাশের যোড়পুটিং, পাট এর ফেঁসো সব উঠে গেছে এখন আর কিছুই নাই, গাং-এর জল ঠেলে উঠছে নৌকায় তীর বেগে ফিন্‌কি দিয়ে।

করার কিছুই নাই, তবু হাল এ মোচড় দিয়ে তীরের সন্ধান করে, তীরভূমিরও সন্ধান মেলে না কোথাও। আশপাশে এই গহনরাতে কোন নৌকাও নাই।

ওদিকে নৌকার খোল তখন আধ বোঝাই হয়ে গেছে গাং-এর জলে, মনে হয় ভাঙ্গা তক্তাখানা বোধহয় খুলেই গেছে, ঠেলে উঠছে গাং-এর ঠাণ্ডা মৃত্যুর পরোয়ানা আনা জল।

পায়ের কাছে জল এসে ঠেকে, ভারি নৌকাটা এবার তলিয়ে যাচ্ছে, কুড়োনও লাফ দিয়ে পড়ে ওই সীমাহীন মাতাল মাতলার বুকে পুরন্দরের মোড়ে, সেখানে প্রায়ই নানা দুর্ঘটনাই ঘটে।

ঠাণ্ডা উত্তাল জলরাশির মধ্যে কুড়োনের মত একটা বিন্দু কিছুক্ষণ ভেসে চলেছে তারপর তলিয়ে গেল গাং-এর অতলে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে দুদিন পর। পুরন্দরের মোড়ে নৌকাটা ডুবেছে, কিন্তু কুড়োনের ভাসমান দেহটা (কিছুটা মাছে খেয়ে ফেলেছে, তবু মুখটা অক্ষতই ছিল) গিয়ে ঠেকে কুমড়াখালির খালে, সেখানের লোকজনদের অনেকে কুড়োনকে চিনতো।

তারাই খবরটা আনে শ্যামপুরগঞ্জে, নৌকায় তুলে আনে কুড়োনের বিকৃত দেহটাও।

রতন নস্কর তখন আড়তে মাছ চালানের হিসাবে করছে, সে জানে কুড়োনের পাকা ব্যবস্থাই সে করেছে, ওই রাতেই রতনের অন্ধকারের অনুচর তেলিয়া, ভুলোর দল ওই ডিঙ্গির নীচের তক্তা বেশ কায়দা করে আলগা করে রেখেছিল তারই নির্দেশে।

অবশ্য তেলিয়াও চেয়েছিল রতনের সামনে কুড়োন যেভাবে মাথা তুলছে তাতে তাদের গুরুত্ব কমে যাবে, তাই কুড়োনকে সরানোর মতলবেই ছিল তারা। রতনের নির্দেশ পেতে তাই ওই ডিঙ্গিতে কারচুপি করে রেখেছিল তারাই, কিছুক্ষণ ডিঙ্গি

ঠিকই চলবে, তারপর বড় গাং জলের বেশী তোড়ে সেই তক্তা আপনিই সরে যাবে।

তবু রতন একটু ভাবনাতেই ছিল, ঠিকমত কাজ যদি না হয়, কুড়োন বেঁচে যাবে। কিন্তু তা হয়নি, পরদিন কুড়োন ফেরো না। ক্যানিং থেকেও খবর আসে কুড়োন যায়নি সেখানেও। খুশী হয় রতন, তবু আসে সে সকালেই কুড়োনের বাড়িতে।

গোলাবী একাই বাড়িতে রয়েছে, লোকটা কাল গেছে, ভোরে ফেরার কথা, হয়তো সেই ফিরেছে।

গোলাবী আগড় খুলে সামনে রতনবাবুকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। রতন দেখছে গোলাবীকে, ডাগর চোখে কি অসীম উৎকণ্ঠা, নিটোল দেহে অফুরান যৌবনদাক্ষিণ্য তাকে মোহময়ী করে তুলেছে।

গোলাবী বলে—আপনি? লোকটা এখনও ফিরল না। রতন বুঝেছে কুড়োন ফিরে আসে নাই, তাই বলে!

—একটু দেরী হবে, মনে হয় বৈকালের গোণেই ফিরবে কাজ সেরে। ভাববি, তাই খবরটা দিয়ে গেলাম। চলি—হ্যাঁ, খরচাপত্র লেগেছে, রাখ এটা।

চলে যায় রতনবাবু, গোলাবী বরং কৃতজ্ঞ হয় বাড়ি বয়ে খবর দিয়ে গেল, পঞ্চাশ টাকাও দিয়ে গেল, লোকটা তাদের জন্য ভাবে।

তারপরও একটা দিন চলে গেছে, কুড়োন ফেরেনি, রতন নিশ্চিন্ত যে শেষই হয়ে গেছে কুড়োন গাং-এর অতলে। এখন পথ পরিষ্কার, চারে মাছ রেডি—শুধু এবার গোলাবীকে খেলিয়ে তুলতে হবে।

এমন সময় ওই খবরটা আসে, গাং-এর ধারে সারাগঞ্জের লোক ছুটে গেছে, তারা কুড়োনের বিকৃত দেহটাকে ডাঙ্গাতে তুলেছে।

রাজা স্কুলে যাচ্ছিল, সেও দাঁড়ায়। খরবটা পেয়েছে গোলাবীও, সেও দৌড়ে এসে ওই বিকৃত দেহটা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এই বাদাবনে মৃত্যুটা বড় কঠিন সত্য। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে সীমা রেখাটা খুবই ক্ষীণ, এখানে জলে মাটিতে জঙ্গলে মৃত্যুদূত পরোয়ানা নিয়েই ঘোরে, কখন কাকে সেই পরোয়ানা ধরাবে তার স্থিরতা নাই।

রাজা দেখছে ব্যাপারটা। কুড়োনের মত বলিষ্ঠ যোয়ান এইভাবে নৌকা ডুবিতে শেষ হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

এসে পড়ে রতন, সেও দেখছে কুড়োনের দেহটা, দেহটা বিকৃত হলেও মুখটা ঠিকই রয়েছে, দুটো চোখ বিস্ফারিত, ওই কঠিন ভাষাহীন নির্বাক চাহনি দিয়ে সে যেন রতনকে কি অভিশাপই দিচ্ছে। রতন চোখ সরিয়ে নেয়, তার নজর এখন

গোলাবীর দিকে।

এলোমেলো কাপড়ে সে কাঁদছে। রতন বলে,

—এই সর্বনাশ হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি রে! একি হলো? কাঁদিস না গোলাবী, কেঁদে কি হবে?

গোলাবী তা জানে, তার আশা স্বপ্ন সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তবু মন মানে না, এর মধ্যে থানার ছোটবাবুও এসে গেছে সে বলে,

—লাশ সদরে পাঠাতে হবে, পোস্ট মর্টেম করা দরকার।

রতন বলে—আর কাটাছেঁড়া করে কি হবে ছোটবাবু? দেখছেন তো জলে ডোবা কেস, আবাদ অঞ্চলের গাং-এ এসব আকচার হয়, এনিয়ে থানা পুলিশ করার দরকার নাই, বেচারার সৎকার করতে দিন। আহা! কোথায় ডুবলো আর নিয়তি এই মাটিতেই টেনে আনলো ওকে—আর বাধা দেবেন না।

ছোটবাবু জানে রতনবাবুর হাত অনেক লম্বা। তাছাড়া অঞ্চল প্রধান সে, ও যখন বলছে আর ঝামেলাতে যাবে না। তাই বলে সে—তাই করুন, আপনি যখন বলছেন।

রতনও চায় তাড়াতাড়ি সব পাট চুকিয়ে দিতে, তাই বলে—সরকার, এ্যাই তেলিয়া, যা সৎকারের ব্যবস্থা কর, আহা—বড় ভালো ছেলেটা রে—কি করলে ভগবান?

রতনবাবু মাঝে মাঝে এমনি ঈশ্বর পরায়ণ হয়ে ওঠে!

এরপর থেকেই গোলাবীর জীবনটাও বদলে যায়, মেয়েটা কঠিন জীবনের মুখোমুখি হয়ে বুঝেছে তার আশপাশে আজ কেউ নাই, বাঁচার লড়াই তাকে একাই লড়তে হবে, তার মনে হয় সেই লড়াই এর ময়দানে সব সময় সাধু সেজে থাকা চলবে না। এই কঠিন অনুভূতিটা গোলাবীকেও বদলে দেয়। শুরু হয় তার জীবন নিয়ে একটা খেলাই, জীবনের লড়াইটাকে সে খেলাচ্ছলেই দেখে।

রতনবাবুও সহসা তার উপর খুবই সদয় হয়ে ওঠে। গোলাবীও ক্রমশঃ চিনেছে রতন নস্করকে। তার মনে হয় কুড়োনকে হঠাৎ ওইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল ওই রতনবাবুই, তার কারণটা সে পরে বুঝেছে।

রতনবাবু পরদিনই আসে তার বাড়িতে, বলে—এখন যা হবার তাতে হলো গোলাবী।

গোলাবী ফুঁসে উঠতে চেয়েছিল, লোকটার মুখের উপর বলতে চেয়েছিল—তুমিই খুনী, তোমার লোভটাকে চিনেছি। কিন্তু পারেনি, চুপ করেই ছিল, বেশ জানে

ওই লোকটা তাকেও দরকার হলে শেষ করে দিতে পারে, কিন্তু তাতে গোলাবীর লাভ হবে না।

সে একদিন বিষ ছোবল মারবেই ওই রতনবাবুকে, কিন্তু তার জন্য সুযোগ, সময় চাই, তাই এখন ওর সঙ্গেই মিশতে হবে তাকে। রতনবাবু বলে—বাঁচতে তো হবে, তুই বরং আমার আড়তে আয়, মাছ দেব। হাটতলায় বিক্রি করবি, এখন কিছু টাকা রাখ, হ্যাঁ—কদিন পর একবার বাগানে আসবি, আমার কাজ করলে আমি তার ভালো দামই দিই রে, ঠকবি না।

গোলাবীর মনের অতলে এক নতুন নারী জন্ম নেয়। সে নারী নয়, নাগিনী! তার বুকে বিষের জ্বালা। তবে গোলাবী সেটা হাসি দিয়েই ঢেকে রাখতে চায়। লোকটাকে হাতে রাখতে হবে, নাহলে এই শ্যামপুরগঞ্জে বাঁচা যাবে না এটা বুঝেছে গোলাবী।

রতনবাবুও খুশী, ওর সবকিছু কাজকর্ম দাবার ছকে সাজানো, এক একটা করে ঘুঁটি চালে আর ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়, এখন তার সামনে ওই ভেড়ির স্বপ্ন।

গোলাবীও হাতে এসেছে, সেই রাতে ব্যাঙ্কের কোন কর্তাকে এনেছিল গোবর্দ্ধন, রতনবাবুর বাগানে আপ্যায়নের কোন ক্রটি হয়নি, গোলাবীই সেদিন ভালোমন্দ রান্না করেছিল বাগানে, সেজেগুজে সাহেবদের বিলিতি মদ, মুরগীর মাংস, তপসে মাছের ফ্রাইও পরিবেশন করেছিল, অবশ্য বাবুরা মদের নেশাতেই কেতিয়ে পড়েন, রাতে ঠিক মত খাবার ক্ষমতাও ছিল না তাদের।

না থাক, সেই সাহেব বেইমানী করেনি, সাতলাখ টাকা ব্যাঙ্ক লোন এর ব্যবস্থা করেছিল, অবশ্য টেন পার্সেন্ট তাকে দিতে হবে, আর গোবর্দ্ধনবাবুকে দিতে হবে কিঞ্চিৎ। অবশ্য সেটা রতনকে ঘর থেকে দিতে হবে না, তাই গায়েও লাগবে না।

রতন, তস্য সরকার আর ওই তেলিয়ার দল পীরখালি, নেবুখালির চাষীদের কাউকে ভালো কথায়, কাউকে উচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে, কাউকে চমকিয়ে ভেড়ির জন্য জমি লীজ দিতে রাজী করিয়েছে।

এখন নেতা গোবর্দ্ধনবাবু প্রচার করছে—ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে, এখানের অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে চিংড়ির প্রকল্প শুরু হলে। অতএব সব চাষীকেই বলা হচ্ছে যেন দলে দলে যোগ দেয় এই কর্ম যজ্ঞে। এ নিয়ে হাটতলাতে ম্যারাপ বেঁধে মিটিংও হলো, এইটাই এখন এখানে আলোচনার বিষয়।

নগার বাবা অবশ্য এসবে নাই, তাই নগা এ নিয়ে ভাবে না। কাজের ফাঁকে নগা আসে রাজার কাছে, রাজাও স্কুলের কৃতী ছাত্র, কিন্তু সেও নগাকে ভোলেনি।

সকাল থেকেই বাদাবনের ছেলে-মেয়ে-বৌঝিরা গাং-এ নেমে পড়ে ছোট ছোট নাইনলের জাল নিয়ে, নোনাজলে কাদায় নেমে জাল পেতে থাকে, মাঝে মাঝে জাল তোলে দুচারটে সূক্ষ্ম ছোট ছোট পোকার মত চিংড়ির বাচ্ছা, না হয় অন্য মাছের বাচ্ছাও পড়ে জালে।

ওরা সেই চিংড়ির বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বাকী সব ডাঙ্গায় ফেলে দেয়। সকাল থেকে দুপুর অবধি নোনা জলে দাঁড়িয়ে হাত পা হেজে যায়, আঙুলগুলোতে ঘায়ের মত হয়, জ্বালা করে নোনা জলে, কিন্তু তবু নামতে হয়। ওর উপরই তাদের রুজি।

নগা নৌকাটাকে মাঝে মাঝে আলকাতরা পাট দিয়ে রং করে, পুরোনো রঙকে খড়ের আগুনে জ্বালিয়ে নতুন তক্তা ফিট করে মেরামত করে, রং করে গাং-এর ধারে। রাজাও হাত লাগায়। নগা বলে,

—বুঝলি গাং-এ ডিঙ্গিই হচ্ছে পরাণ, নরম পচা তক্তা নৌকায় থাকলি ওই কুড়োন সর্দারের মত দশাই হবে মাঝ গাং-এ। তাই বাপ বলে—নগা আমি লই, লা খানাই তুর বাপ, ইগুলোকে দেখভাল করবি, এরাই বাঁচাবে তুকে।

সেদিন রাজা নগা নদীর ধারে কাজ করছে, গোলাবী ফিরছে হাটতলা থেকে। এখন সে আড়ত থেকে মাছ নিয়ে, হাটে বিক্রি করে আরও একটা গরু করেছে, তারও দুধ বেচে কোনমতে একটা পেট চলে যায়।

রাজা নগাকে দেখে এগিয়ে আসে গোলাবী, শশাও হয় তার বাড়িতে, কিছু শশাও বিক্রি করেছে, কয়েকটা বিক্রী হয়নি, তাই নিয়ে ফিরছে। ওদের দেখে গোলাবী থামে। বলে,

—এই নগা, নিজে যা করছিস কর রাজার মত ভালো ছেলে মেডেল পাওয়া ছেলের পড়া লস্ট করছিস?

রাজা বলে—না গো গোলাবী দি, পড়াশেষ করেই এসেছি। গোলাপী বলে—তা কি মতলব? হাতে গুলতি, পাখী মারবে নাকি? রাজার গুলতির টিপের কথা গোলাবীও জানে, রাজা বলে—না।

দেখে নন্দ সরকার চলেছে কয়েকজন চাষীকে নিয়ে রতনবাবুর গদিতে, নগা বলে—ওই দ্যাখ রাজা, সরকার আবার ক'টা মুরগী ধরে নে চলেছে, শ্যালা ভেড়ি করবি কর, তা লুকের জমি হড়প্ করবি ক্যানে?

রাজাও শুনেছে ভেড়ির কথা। বাড়িতে এ নিয়েও বাবাকে বলতে শুনেছে, লোকের ধান জমি সব কেড়ে নেবে রতনবাবু, রাজা বলে

—মনে হয় গুলতির এক গুলিতে দিই ওই টেকো সরকারের মাথা ফুটিয়ে।

গোলাবী বলে—পারবি না রে, ওদের মাথাও লোহাকাঠের মত শক্ত, ওরা সবার

সর্বস্ব কেড়েই নেয়!

কথাটার মধ্যে একটা জ্বালাই ফুটে ওঠে, ওই জ্বালা গোলাবীর এক ব্যর্থতা! নিঃস্বতার জ্বালাই! কুড়োনকে তারাই শেষ করেছে যাতে গোলাবীকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে পায় ওই রতনবাবু। গোলাবীকে ওদের কাছে মাথা নীচু করতে হয়েছে অনেক বেদনায়।

আজও গোলাবী জবাব দিতে পারেনি রতনের সব শয়তানির, সেই অপমান, নিঃস্বতার জ্বালাটাই গোলাবীকে কুরে কুরে খায়। এই কথা সে কাউকে বলতেও পারেনি, এখানের একটা মানুষকেও সে দেখেনি যে ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে,

একমাত্র ওই মাস্টারমশায়কে দেখেছে যিনি রতনবাবুর মুখের উপর কিছু বলতে পারেন। কিন্তু তার কাছে এ নিয়ে কিছু যে বলা যায় না তা বুঝেছে গোলাবী। তার ভালো লাগে রাজাকে, গঞ্জের ছেলেদের মধ্যে এই সাহসী, বুদ্ধিমান, হয়তো একদিন অনেকের হয়ে এইই কথা বলবে রতনবাবুর মুখের উপর।

ডালা থেকে দুটো শশা বের করে দেয় গোলাবী—নে খা, রোদে বেশীক্ষণ থাকিস না রাজা। বাড়ি যা—

গোলাপী চলে যায়।

শিরীষগাছের ছায়ায় বসে রাজা নগা শশা খেতে খেতে বলে—গোলাবী দি বড় ভালো রে,

নগা বলে—এ জগতে ভালো হতে নাই বুঝলি, তাই তো শালা ভগবানও গোলাবীদির কপালে কষ্টই নিকেছে, আমার বাপ বলে—ভালো কাজ করবি, ধ্যাৎ—উতে দুঃখই বাড়ে, দুনম্বরী কাজ করো আরামসে থাকবি। দ্যাখ না রতনবাবুকে? কেমন ঠাটে বাটে আছে শালা।

ওই শব্দটা নগার মুখে যখন তখন বের হয়, রাজাও ওর ওই অভ্যাসটাকে বদলাতে পারেনি।

রাজা ক্লাশে এবারও ফার্স্ট হয়েছে, ক'দিন স্কুলের ছুটি, মাস্টারমশাই এর ওখানে তবু পড়তে যায় রাজা। একদিন না গেলে কমলা বলে,

—কাল আসিসনি কেন রে রাজা?

শিখা বলে—বাবুর মেজাজ! এখন লায়েক হয়েছে, দেখি নগার সঙ্গে গাং-এ নৌকাবিহার করছিল।

রাজা চুপ করেই থাকে। কমলা বলে—ওই বড় গাং-এ ডিঙ্গিতে ঘুরিস না,

কুড়োনের কি হলো দেখলি তো?

রাজা বলে—সে যখন হবার হবে কাকীমা!

শিখা বলে—শোনো তোমার বীরপুরুষের কথা।

বৈকালে তবু পড়তে হয় কেদারবাবুর কাছে, কেদারবাবু বলেন—পড়ার চর্চাটা ঠিক রাখতে হয় রাজা, রাতে আসবি।

ওদের ক্ষেতে বেগুন-লাউ ভালোই হয়েছে, সাবিত্রী ওর জমিতে সোনা ফলায়, ফি হাটে মথুর বেশ কিছু টাকার শাকসব্জী বেচে। এবার ধানও মনে হয় ভালোই হবে। শরতের শেষ, ধান গাছগুলো নিরাপদেই বাড়ছে সুবর্ষার ফলে। খোড় বুকে নিয়ে গর্ভবতী নরীর মত পূর্ণতার স্পর্শ নিয়ে মাঠে মাথা তুলেছে, বাতাসে শিহর জাগে!

রাজা কলি দুজনের পরিচর্যায় সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে, নতুন ডালপালা মেলে সবুজ হয়ে উঠেছে, কলি বলে,

—কখন ফুল ফুটবে রে দাদা?

রাজা এখন অনেক কিছুই জেনেছে, বলে সে,—এখনও বড় হয়নি, বড় হলে তবে ফুল ফুটবে।

সাবিত্রী সেদিন একটা ডালায় বেশ কিছু বেগুণ, পালংশাক একটা লাউ দিয়ে বলে—রোজ তো কাকীমার ওখানে খাস, আজ এগুলো নিয়ে যা।

কমলাও ওই সব দেখে অবাক,

—এত কি এনেছিস রে রাজা?

রাজা বলে—মা দিল, জমিতে হয়েছে।

গোলাবী এ বাড়িতে দুধ দেয়, গোলাবী আসতে কমলা বলে,

—আজ সেরখানেক দুধ বেশী দিতে পারবি গোলাবী?

—কেন গো? গোলাবী শুধোয়।

কমলা বলে—লাউ এর পায়েস করবো, রাজার মা কচি লাউ পাঠালো।

—দোব।

কমলা বলে—রাজা আজ এখানেই খাবি।

সন্ধ্যার রূপ এখানে আলাদা। বৈকাল থেকেই নদীর রং বদলাতে থাকে, সোনালী রোদের রং ক্রমশঃ গাঢ় তারপর থেকে বেগুনি—তারপর রক্তলাল হয়ে নদীর বুকে তলিয়ে যায়। অন্ধকার নামে চারিদিকে, নদীতীরে শিরীষগাছের বুকে জাগে হাজারো ঘরে ফেরা পাখীর কলরব।

ক্রমশঃ চাঁদের আলোর হালকা পরশ লাগে নদীর জলে সেই আলো বিচ্ছুরিত হয়ে নদীতীরে সবুজ গাছগাছালিকে মায়াময় করে তোলে। বাতাসে জাগে নদীর কলোচ্ছ্বাস। ওই শব্দটাই শুধু ভেসে থাকে আকাশে বাতাসে।

শিখা নদীর ধারে বসে আছে, মাঝে মাঝে সে এসে ওই নদীর ধারে বসে, দিন শেষে সন্ধ্যার আলোয় দেখে নৌকাগুলো চলেছে পাল তুলে। ওরা কোথা থেকে আসে কোথায় যায় তাও জানে না। ভেসে ভেসে অকূল হারিয়ে যায় জীবনের আনন্দ, অর্থহীন ভাবনার মতই।

হঠাৎ সুরটা শুনে চাইল শিখা। আরও অবাক হয় এই গান সেইই গায় মাঝে মাঝে,

— জীবনের পরম লগন করোনা হেলা
করোনা হেলা হে গরবিনী
বৃথাই কাটিবে বেলা
সাঙ্গ হবে যে খেলা—

মায়ের কাছে এই গানটা শিখেছিল সে, আজ এই নির্জন বাদাবনের নদীর ধারে এই গান শুনে চমকে ওঠে শিখা। গানটা ভেসে আসছে ওদিকে একটা শিরীষ গাছের আঁধার নামা ছায়াতল থেকে।

শিখা উৎকীর্ণ হয়ে শুনছে ওই গান, গলাটা কেমন চেনা। আর নিখুঁতভাবেই গাইছে গানটা, শিখা উঠে আসে ওই দিকে। চাঁদের আলো শিরীষ গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে আলোছায়ার মায়াজাল বুনেছে।

শিখা দেখে ওই গাছের নীচে বসে রাজা ওই গানটা গাইছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে শিখা, তন্ময় হয়ে গাইছে রাজা, গান শেষ হতে শিখা বলে ওঠে—চোর কোথাকার!

চমকে ওঠে রাজা, দেখে শিখাকে, রাজা বলে,

—চোর আমি!

—নয়তো কি, এ গান তো চুরি করে শিখেছো!

হাসে রাজা—বিদ্যে চুরি করলে দোষ নাই, তুমি গাইতে শুনে শুনেই শিখে গেলাম।

শিখা বলে—এত ভালো গান গাও কোনদিন বলোনি তো? আগে গাইতে?

রাজা আগে দু'চারবার গ্রামের কেষ্ট যাত্রায় গান গেয়েছে, বলে—ওসব শুনে শুনে গাইতাম।

শিখা বলে—শিখবে?

হাসে রাজা—গান! পড়া নিয়েই হিমসিম খাচ্ছি, এসব শুনলে স্যার মেরে ভূত নামিয়ে দেবে ঘাড় থেকে।

শিখা বলে—তা সত্যি, বাবা বলেন—তুমি জেলার মধ্যে ফার্স্ট হবে সামনের পরীক্ষায়। স্কুলের নাম বাড়াবে।

রাজও স্বপ্ন দেখে সে অনেক লেখাপড়া শিখবে। কলকাতার কলেজে পড়বে, সেখানেও ফার্স্ট হতে হবে তাকে।

মথুর স্বপ্ন দেখে এবার তার দুঃখ ঘুচবে, কয়েকটা বছর কোন রকমে কষ্ট করেও পড়াবে সে ছেলেকে, মাঠে কাজ করে আপনমনে। ওদিকে মাঠে ধানগুলোর ডগে এসেছে মঞ্জরী, এখনও পুরুষ্ট হয়নি, শেষ শরতের রাতে ওই মঞ্জরীর ধান এর আবরণ উন্মুক্ত হয়ে যায়, রাতভোর শিশিরের স্পর্শে তারা ব্যাকুল, সেই শিশিরকণাই বুকে নিয়ে সেই ধানগাছ পরিণত করবে তাকে প্রাণদায়ী সুপক্ক একটি তণ্ডুলকণায়, শ্বেত শুভ্র—প্রাণরসে রসবান একটি দানা।

...ওদিকে আনাজ ক্ষেতে আগাম আলুর ভেলি করছে মথুর, আগাম আলু বুনে সে ভালো দাম পায় হাটে, হঠাৎ ভেড়ির ওদিক থেকে সপরিষদ রতনবাবুকে আসতে দেখে চাইল। রোদের তেজ এখনও তত হয়নি, সকালের দিক, তবু রতনবাবুর চিন্তাশীল মস্তিস্ককে ঠাণ্ডা রাখার জন্য কপিল হুজুরের মাথায় এর মধ্যেই ছাতা ধরেছে, পিছনে রয়েছে নন্দ সরকার।

মথুর দেখে ওদের দূর থেকে। এর মধ্যে অবশ্য দুদিনবার তাকে মিটিং-এ যেতে বলেছিল সরকার। শুনেছে মথুর অনেকেই গেছে রতনবাবুর মিটিং-এ। সেখানে নাকি আলোচনা হয়েছে ভেড়ির কথাও। মহেশ, নিত্য, কালীপদ এরাই বলেছে জমি দেবে তবে একবছরের টাকা আগাম দিতে হবে।

মথুর কোন কথাই বলেনি, মিটিং-এও যায়নি। ও নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ভেবেছিল এসব আলোচনাতেই সীমিত থাকবে। তাই রতনবাবুকে দূর থেকে দেখেও না দেখার ভান করে মাটি কোপাতে থাকে। কিন্তু ভবী ভোলার নয়, নন্দ সরকারই ডাকে,

—এ্যাই মথুর শোন, বাবু ডাকছেন।

মথুর এবার উঠে ভেড়ির দিকে এগিয়ে যায়, রতনবাবু ভেড়ির উপর একটা চট্‌কা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তখন গাং-এর মুখ আর মথুরের জমির অবস্থান ভালো করে দেখে সিদ্ধান্ত নেয়।

এখানেই বাক্সকল বসাতে হবে, বড়নদীর ধারে এই একমাত্র উৎকৃষ্ট জায়গা।

এইখানে হবে প্রধান ভেড়িমুখ, ওদিকে কিছুটা জায়গাতে আলা ঘর ও করতে পারবে, সবই মিলে যাচ্ছে তার হিসাবমত। রতনবাবুর এই জায়গাটা পেলেই কাজ শুরু করতে পারবে, নিজের জমি ছাড়া অন্যদের জমিপাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

মথুর আসতে রতন বলে—কি রে ক্যামন আছিস? ক'দিন থেকে খুঁজছি তোকে।

মথুর বলে—আজ্ঞে, মাঠের কাজে ব্যস্ত থাকি। যেতে পারি নি।

—তা ধান তেমন ভালো তো হয়নি দেখছি।

রতনের কথায় মথুর বলে,

—ওই যা হয়েছে। ঠিকমত সার দিতে পারিনি, জলটানও পড়লো।

রতন বলে—খেটেই মরছিস, খাটুনির দামও পাস না। তাই এবার উন্নত প্রণালীতে মাছ চাষের পরিকল্পনা করেছি মথুর। সবাই রাজী হয়েছে, বিঘে প্রতি বছরে দুহাজার টাকা করে দেব, পাঁচবিঘেতে তুই পাবি দশ, হাজার পাঁচেকই আগাম দেব তোকে।

এখানে চিংড়ির ভেড়ি হবে, তোরা ওই লীজের টাকা ছাড়াও দৈনিক কাজ পাবি, তার মজুরী আলাদা, তুই বাপু ওই জমি ভেড়ি করতে ছেড়ে দে।

এমনি একটা চাপ আসবে তা কিছুটা অনুমান করেছিল মথুর, কি জবাব দেবে তা জানে না, রাজাও এসে পড়েছে এদের দেখে, সেও শুনেছে রতনবাবুর কথাটা।

তার মনে হয় ওই ধূর্ত লোকটা কোনমতে কিছু টাকা দিয়ে জমির দখল নিতে চায়, তারপর আর পাত্তাই দেবে না এদের। সাবিত্রীও ভেড়ির উপর রতনবাবুকে সদলবলে এসে কি সব বলতে দেখে বাড়ির বাইরে থেকেই এদিকে চেয়ে থাকে। কেমন যেন ভালো লাগে না তার ওই রতনবাবুকে। দেখেছে লোকটা সুযোগ পেলেই ঠকায় লোকদের।

মথুর চুপ করে থাকে। কথাটা শুনে সে খুশী হয়নি তা ওর মুখ দেখেই বুঝেছে রতনবাবু, অবশ্য রতন জানে সোজাপথে কাজ উদ্ধার না হলে কিভাবে অন্যপথে কাজ উদ্ধার করতে হয়।

—কি হল? সবাই জমি দিচ্ছে, তুই দিবি না? নন্দ সরকারই বলে ওঠে।

মথুর বলে—না গো।

—কেন? রতনবাবুই প্রশ্ন করে এবার, মথুর বলে,

—বাপপিতেম এই নোনামাটিকে বড় কষ্টে ফলবতী করেছে, এতদিন ধরে এতেই পেট পেলেছি, সংসার চালিয়েছি, ই জমি মায়ের মত মুখের অন্ন যুগিয়েছে, ইকে আবার নোনা জল ঢুকিয়ে বাদা করবো নাই বাবু, চাষের জমি মা লক্ষ্মী, একে

ঘুচোবে না।

রতনের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে,

—ভেবে দ্যাখ, অনেক বেশী টাকা পাবি, তোর ভালোর জন্যই বললাম।

রতন আর কথা বলে না, পা বাড়াতেই কপিলও মাথায় সশব্দে ছাতাটা খুলে ধরে, নন্দ সরকার বলে গলা নামিয়ে মথুরকে পরম বন্ধুর মত,

—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করিস না মথুর, বসে বসে এতগুলো টাকা পাবি, দিন কাজ পাবি, কাল এসে কথা বল। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

মথুর নীরব, নন্দ বলে—তাহলে কাল আয় গদিতে।

কথাটা বাড়িতে আলোচনা করে মথুর সাবিত্রীর সঙ্গে। সাবিত্রী সব শুনে বলে—ভালোই বলেছো বাপু, এ জমিটুকু গেলে কি নে থাকবো? এতেই খেটেখুটে দিন চলে।

এ জমি ছাড়বো না। ওদের ভেড়ি করতে হয় করুক। আমাদের জমি কেন দেব? মথুরও মনস্থির করে ফেলে, এর মধ্যে মহেশ, নিতাই এর সঙ্গেও আলোচনা করেছে, ওদের জমিও ওরা দেবে না, গোবিন্দও এসে বলে—তোমরা না দিলে আমিও দেব না জমি।

রাজা দাওয়ায় পড়ছিল, আজ ওই জমির কথা শুনে সে ভাবনায় পড়ে, ওই রতন বাবুদের বিশ্বাস নাই, একবার যখন জমির দিকে নজর পড়েছে সহজে ছাড়বে না।

পড়তে মন বসে না। সারা বাড়িতে কেমন সেই আনন্দমুখর পরিবেশটাই এক ধমকে যেন বদলে গেছে রাজার মনে হয় রতন নস্কর যেন একটা দৈত্য, সে শক্তহাতে সব কিছু একাই দখল করতে চায়। বাদাবনের বাঘ বলে ওকে, শিকার পেলেই ঘাড় মটকাবে।

নগা রাজার সুখ দুঃখের বন্ধু। নগাকেই সেদিন বলে রাজা ওই রতনবাবুর অভিযানের কথা। রাজা বলে—ওতো বাদাবনের বাঘ!

নগাদের জমি জায়গা নেই। বাপ বেটায় গাং-এ মাছ ধরে, আর মা ছোট বোনটাকে নিয়ে সকাল থেকে গাং-এ নামে মীন ধরতে, তাও বিপদের কাজ। গাং-এ এখন খবর পেয়ে কামটের ঝাঁক ঘুরছে, সেদিন ইস্কুলের ঘাটে একটা বাচ্চা মেয়ের চীৎকারে সবাই ছুটে যায়, হাটতলার ছিদাম ঘোষের মেয়েটা মীন ধরছিল, হঠাৎ জলটা লাল হয়ে ওঠে।

তারপরই চীৎকার করে ওঠে সে, ধরাধরি করে তোলে—দ্যাখে কামটে একটা পায়ের মাংস প্রায় তুলে নিয়েছে, মেয়েটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তারপর নৌকায় তুলে দূরের গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু ততদূরে আর পৌঁছতে পারেনি, পথেই মারা যায় মেয়েটা বেশী রক্তক্ষয়ের জন্য।

ক'দিন গাং-এ নামেনি কেউ। কিন্তু পেটের জ্বালা মৃত্যুর বিভীষিকার থেকেও অনেক তীব্র, মানুষ মরে একবারই, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় তিলতিল করে মরে প্রতিক্ষণ, প্রতিদিন—অহঃরহ! তাই আবার গাং নামছে তারা মীনের সন্ধান, নগার মা বোনও নামে।

নগা বলে—আমাদের জমি জারাত নাই, উসব ঝামেলাও নাইরে, আর ওই যে বল্লি রতন বাদাবনের বাঘ, তালয়, বাদাবনের বাঘ খিদে পেলে মানুষ মারে, কালকের জন্য জমিয়েও রাখে না, উ শালার মানুষ মারা একটা খেলা। কুড়োনদাকে ওই মেরেছিল নির্ঘাৎ। উ শিয়ালের জাত-বাদাবনের শিয়াল, হাড়গোড় অবধি কামড়ে খায়। দ্যাখ কি করে আবার। রাজার মন মেজাজও ভালো নাই।

সামনে পরীক্ষা, কেদারবাবু বলে—রাজা ভালো করে পড়তে হবে, ওসব ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলো।

রাজা কিছু বলতে পারে না।

কেদারবাবু স্কুল নিয়েই থাকেন। ইদানীং তিনি চেষ্টা করছেন যদি গঞ্জে একটা সরকারী হেলথ সেন্টার খোলানো যায়, কারণ দূর এই আবাদঅঞ্চলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নাই, দু'একজন হাতুড়ে ডাক্তার আছে, তাদের কাছেই যেতে হয়।

যেদিন দেখেছিলেন কামটের কামড়ে কষ্ট পেতে সেই মেয়েটাকে, সময়মত চিকিৎসা হলে বাঁচানো যেতো, তা হয়নি, এখন কেদারবাবু ও রতনবাবু গোবর্দ্ধনবাবুদের ধরেছেন, কিন্তু দেখেছেন হয়তো ওরাও চায় না এখানের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা হোক, না হয় তাদের সাধ্যও সীমিত।

তাই তিনি কলকাতার বন্ধুদের ধরে চেষ্টা করছেন, সারা এলাকার মানুষের সাক্ষর, টিপ সই দিয়ে আবেদনও করেছেন।

এবার গঞ্জে ওই চিংড়ির ভেড়ি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে, কেদারবাবু শুনছেন কথাগুলো, অনেকেই হাটতলায়, মন্দিরে আলোচনা করছে।

জমির দরুণ ঠিকমত পয়সা যদি পায় সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে না, কিন্তু অনেকের ভয় রতনবাবু যদি জমির দখল নিয়ে ভেড়ি বানায় তারপর টাকা না দিলেও তাদের করার কিছুই থাকবে না।

কেদারবাবুও তাই রাজাদের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছেন। রতনবাবু কি করবে তা জানা নাই কেদারবাবুর।

মথুর জানা এবার ভাবনায় পড়েছে, সে রতনের গদিতেও যায়নি। কোন খবরই পাঠায়নি, যেন ব্যাপারটাকে সে কোনরকম গুরুত্বই দিতে চায় না, এড়িয়ে যেতে চায়।

ওদিকে রতন নস্কর এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভেড়ি তাকে করতেই হবে, নেতা গোবর্দ্ধনও চায় ভেড়ি তৈরী হোক, তারও মাসিক একটা বাঁধা আমদানী হবে। তাই সেও চাপ দিয়ে অনেককেই জমি লীজ দিতে বাধ্য করিয়েছে।

এর মধ্যে সেই ব্যাঙ্কের সাহেবও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ঋণ দেবার জন্য, কারণ এতে তারও আমদানী ভালোই হবে ব্যাঙ্কের টাকা বিলিয়ে, তিনিও খবর পাঠিয়েছেন তাড়াতাড়ি লোন না নিলে সাংশন বাতিল হয়ে যাবে।

কিন্তু ভেড়ির আসল মুখেই জমি পাওয়া যায়নি এখনও। নন্দ সরকারও দু'একবার যাতায়াত করে বুঝেছে মথুর জমি ছাড়বে না, শুধু তাই নয়, মথুরের ওই প্রতিবাদে যোগ দিয়েছে আরও কয়েকজন চাষী, মহেশ, নিতাই পাল আরও দু'একজন।

নন্দ বলে—ওই লোকটাই ওই মথুরই দল পাকাচ্ছে, নিজের জমি তো দেবেই না, উল্‌টে তাতাচ্ছে ওদের।

গোবর্দ্ধন বলে—লোকটার এত বড় হিম্মৎ?

নন্দ বলে—হবে না? এখন তো ধান পাকছে, চাষীর বলও তাই বাড়ছে।

গোবর্দ্ধন বলে—ধরে আন ব্যাটাকে!

রতনই বলে—এসবের দরকার নাই, কারো জমি জোর করে নেব না।

নন্দ একটু অবাক হয় মালিকের নিপাট ভালো মানুষী দেখে।

রতনের কাজ বেশ নিখুঁত। তার ডান হাতও জানে না বাঁ হাত কি করবে, আর কিছু কাজ সে এমনই করে যাতে তার অন্য লোকজনও টের না পায়।

কুড়োন কেন, অনেককেই সে সরিয়েছে, কিন্তু তার কাছের মানুষরা অনেকেই জানে না। এবারও রতন তেমনিই কিছু করতে চায়, এসব কাজের জন্য তার আলাদা লোক আছে। অন্ধকারে সীমান্ত পার হয়ে মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য তেলিয়া, কালিয়ার দল আছে, তারা সাধারণতঃ গদি ঘরে আসে না। গুদামেই থাকে, আর রতনের বিশেষ কাজগুলো তারাই করে থাকে। এবার তাদেরই কথাটা বলে রতন।

তেলিয়া বলে—এর জন্য ভেব না, এতো সামান্য কাজ বস্, হয়ে যাবে,

রতন বলে—খুব গোপন করতে হবে কাজটা।

মথুর ভেবেছে রতনবাবু তার জমি ছেড়ে দিয়েই ভেড়ি বানাবে, দেখেছে ওদিকে এর মধ্যেই অনেক ধান জমির ধানকাটার সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে লোকজন লাগিয়ে উঁচু

করে মাটির বাঁধ দেওয়া হচ্ছে।

নদীর বাঁধের কাজে লোক পাওয়া যায় না, কিন্তু এই ভেড়ি বাঁধার কাজে লোকের অভাব নাই, রতনবাবুও যায় মাঝে মাঝে। তাই মথুরের মনে হয় অন্যভাবেই ভেড়ি হবে, কারণ নন্দ দু'একবার এসে ফিরে যাবার পর আর কেউ তার কাছে জমির জন্য আসেনি।

জমিতে ধানগুলো এখন হলুদ হয়ে শিষের ভারে মাথা নুইয়েছে, বাতাসে ওঠে পাকা ধানের সুবাস, এবার ধান হয়েছে ভালোই, সেদিন মুঠ আনে মথুর।

সকালে সাবিত্রী স্নান করেছে, দুজনে মাঠে যায়, রাজার হাতে শাঁখ। পাকাধান কাটার আগে বসুমতী মায়ের কাছে, মালক্ষ্মীর কাছে ধানভরা মাঠ থেকে চাষী এক মুঠি ধান পবিত্রভাবে কেটে মাথায় করে ঘরে আনে। আগে আগে বরণডালা নিয়ে সাবিত্রী, রাজা শাঁখ বাজিয়ে চলেছে, পিছনে মথুরের মাথায় সেই পবিত্র ধানের আঁটি।

এই অনুষ্ঠানের দু'একদিন পর থেকেই ধান কাটা শুরু হয়। মথুরও মনস্থ করে আগামী পরশু থেকেই ধান কাটা শুরু করবে। তার আগে খামার তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উঠানের ওদিকে ফাঁকা জায়গাটার ঘাস চেঁছে—গোবরের পুরু প্রলেপ দিতে হবে, সেখানেই ধান ঝাড়াই মাড়াই করা হবে।

ওদিকে গঞ্জের হাটতলায় তখন রতনের দলবল মঞ্চ বাঁধছে, সেখানে অনেক নেতা—বিশিষ্ট লোকরা থাকবেন, চরণ ডাক্তার, হাটতলায় বরফ কল করেছে হারু পাল, সে এখন রতনের কাছের লোক, এতদিন হাটতলায় দোকানই করেছে, বেশ বড় দোকান, সব কিছুই মেলে, হারুপালও রতনের দৌলতে বেশ জমিয়ে কারবার করছে। মডিফয়েড রেশন শপ, কেরাসিন তেলের এজেন্সীও আছে তার, হালফিল বরফ কল করেছে, তার খদ্দের ওই রতনবাবুই, দুষ্টু লোকে বলে কলটা নাকি রতনবাবুরই, হারু তার বেনামীতেই চালায় ওটা।

এছাড়াও দু'একজন শিক্ষকও এখন রতনের খুবই প্রিয়জন, কারণ তারা রতনবাবুকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রণামী দিয়েই চাকরী পেয়েছে।

নবীন সাতরা, হরেন দলুইকে স্কুলে শিক্ষকতার কাজে আনতে চাননি কেদারবাবু, কিন্তু রতনবাবু প্রেসিডেন্ট। সেইই বলে

—মাস্টারমশাই, ওরা দুজনে পঞ্চাশহাজার করে দিচ্ছে, ওটাতে ইস্কুলের নতুন ওই যে যন্ত্রপাতি রাখার ঘর হয়ে যাবে, ওদের চাকরী দিচ্ছি।

লোকে বলে পঞ্চাশ হাজার নয়—ওরা পঁচাত্তর হাজার করে দিয়েছিল, পঁচিশহাজার করে পঞ্চাশ হাজার রতনবাবুই মেরেছে।

কেদারবাবু তবু বলেন—টাকার জন্য অযোগ্য লোকদের এনে স্কুলের শিক্ষার মান নীচুতে নামাবেন?

হাসে রতন, বলে—ইস্কুল তো বাঁচুক, চাকরী থাকুক তারপর ওসব মানকচুর কথা ভাববেন।

কেদারবাবু চুপ করে যান, তার আত্মসম্মানে বাঁধে এরপর কথা বলতে।

সেই হরেনবাবুও রয়েছে, বৈকালে মঞ্চে ওরাই সমাসীন হয়, চরণ ডাক্তারও এসেছে, সেই গলা ফাটিয়ে এখানে ব্যাপক কর্মসংস্থানে অঞ্চলপ্রধান রতনবাবুর নিরলস প্রয়াসের কথা বলে। হরেনবাবু, নবীন সাঁতরাও বলে

—এতে শিল্প গড়ে উঠবে, চিংড়ির ভেড়ি এই গঞ্জের হাল বদলে দেবে।

তুমুল হাততালি পড়ে, থানার দারোগা ভূতনাথবাবু মঞ্চে গোঁফ পাকিয়ে বসেছে, তার বড় বড় চোখ আর হাড়ির মত মাথা সর্বদাই সচল।

রতনবাবু বলে—যারা স্বেচ্ছায় আসবে এই প্রকল্পে তাদের জমিই নেবো, তাদের ন্যায্য প্রাপ্যও ঠিক মত দেব। জোর করে বা অন্য কোন উপায়ে কারোর জমি নেব না, এ হবে স্বেচ্ছায় যোগদানের ব্যাপার, এখানে কোনও জোরাজুরি নাই, সকলের জন্য দরজা খোলা আছে। তুমুল হাততালি পড়ে।

মথুরও দূর থেকে শুনছিল কথাগুলো, নগা-রাজাও অন্যরাও রয়েছে, ওরা বাঁধের উপর থেকে তামাসা দেখছিল। মহা সমারোহে ভেড়ির প্রকল্প জনতার সামনে তুলে ধরা হোল, দুচারজন এখানেই বেশ গরম খেয়ে ঘোষণা করে

—আমিও জমি দেব। আবার হাতহালি পড়ে।

মথুর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়, তার জমিতে হাত দেবে না রতনবাবু এ কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করছে, মথুর বাড়ি ফেরে নিশ্চিন্ত হয়ে। সন্ধ্যা নামছে, হালকা কুয়াসা জমছে নদীর বুকে—ধান ক্ষেতের উপর, কাল সকাল থেকেই ধান কাটা শুরু করবে, মহেশ, নেত্য, উপীনদের বলেছে, ওরা ধান কাটতে আসবে।

কুয়াসাচ্ছন্ন ভিজে ধান নরম থাকে, তখন কাটলে শীষ থেকে ধান ঝরে কম, কাল ভোর থেকেই ধান কাটা শুরু হবে।

রাত কত জানে না মথুর। ঘরে ঘুমুচ্ছে। শীতের আমেজে কাঁথা চাপা দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে মথুর, ওদিকে রাজাও ঘুমে অচেতন, কলি আর তার মা সাবিত্রী ওদিকে শুয়ে ছিল, শীতের দিন, গাং-এর ধার, ঝড়ো হাওয়া আটকাবার জন্য জানলা দুটোও বন্ধ করে রেখেছিল সাবিত্রী।

হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়, কারা যেন দৌড়ে পালাচ্ছে,

সাবিত্রী জেগে ওঠে—জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে আগুনের আভা।

ধড়মড় করে উঠে মথুরকে ডাকে,—ওঠো, ওঠো।

মথুর উঠে পড়ে, রাজাও। সাবিত্রী বলে—আগুন!

চমকে ওঠে মথুর, দরজা খুলে দাওয়ায় এসে দেখে ওদিকে তার পাকা ধানের মাঠে বেড়া আগুন লেগেছে। শিশির মাখা ধান গাছে আগুন।

লাফ দিয়ে বাইরে আসে, চীৎকার করে—আগুন! আগুন!

দৌড়ে সে মাঠের দিকে, রাজাও দৌড়ায় বাবার পিছনে, সাবিত্রী একটা কলসী নিয়ে দৌড়ায়—

কিন্তু ততক্ষণ আগুণ ক্ষেতের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে— আগুনের তাপে ধানগাছগুলো বারুদের মত শুকনো হয়ে জ্বলছে পট্ পট্ শব্দে, আর ওই উত্তাপে শুক্‌নো ধানগাছে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে জ্বলছে।

উন্মাদের মত মথুর একটা লাঠি দিয়ে ধান গাছগুলোকে আঘাত করে আগুন নেভানোর চেষ্টা কর, সাবিত্রী কলসীর জল ছিটুচ্ছে, কিন্তু সারা মাঠকে মাঠ ধান গাছ তখন জ্বলছে বারুদের মত।

ধোয়া আগুনের কুণ্ডলী ওঠে, নদীর মাতাল বাতাস আগুনের সাড়া পেয়ে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, আগুনের অজস্র ফিনকি ছড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিকে—সেখানেই আগুন জ্বলে ওঠে।

লোকজন জুটে গেছে। ছুটে এসেছে মহেশ-উপীন-নেত্য আরও অনেকে। তখন আর করার কিছুই নাই, মহেশ ধরেছে মথুরকে। সর্বাঙ্গে পোড়া ছাই, বলে

—যাস নে মথুর, বেড়া আগুনে তুইও পুড়ে শ্যাষ হয়ে যাবি, আর কিছুই করার নাই রে।

দুঃখের রাত ভোর হয়।

উপীন বলে—তোর ঘর বাড়িখান বেঁচেছে এই ঢের, যা আগুন—এদিকে এলে এও খতম হতো।

মথুর আলের মাথায় বসে আছে, তখনও ধিকি ধিকি আগুন কোথাও জ্বলছে, বাকী সারা ক্ষেত ছাই এর স্তূপে পরিণত হয়েছে, পুড়ে ছাই হয়ে গেল তার সারা বছরের পরিশ্রম, মুখের গ্রাস সব শেষ হয়ে গেল। চিতার আগুনে প্রিয়জনকে পুড়িয়ে ছাই করার পর লোক যেমন বসে পড়ে মথুরও তেমনি বসে আছে মাঠের ওই চিতাভস্মের সামনে।

এবার গর্জে ওঠে সে—এ কাজ কে করেছে জানি।

সকলেই অবাক হয়, রাজা ঘুরছে মাঠের ওদিকে, কি করে শিশিরভেজা ধানে

আগুন লাগলো এটা সে বুঝতে পারে না, হঠাৎ দেখে খালের ধারে দুটো জেরিক্যান পড়ে আছে, এই দিয়ে তো কেরোসিনতেল, ডিজেল এসবই নিয়ে যায় লঞ্চে। দোকানেও দেখেছে। এগুলো এখানে এলো কি করে?

লোকজনরাও এবার ধন্দে পড়ে—তাই তো। তাহলে আগুন লাগানো হয়েছিল, মথুর চুপ করে ছিল, সে এবার ক্যান দুটো দেখে গর্জে ওঠে,

—এ কার কাজ তা বুঝেছি, ধানে আগুন লাগাবে? এমনি অনেক ক্যান সে দেখেছে রতনবাবুর গুদামে, আড়তে আর মনে পড়ে রতনের কথা, তাকে শাসিয়েই গিয়েছিল ওরা, নন্দ সরকারই বলেছিল—জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ করিস না মথুর, জমি দিয়ে দে।

জমি দেয়নি, তাই ওরাই চরম আঘাত করেছে তাকে, মথুর আজ গর্জে ওঠে—যেইই হোক, যতবড় লোকই হোক ছাড়বো না তাকে, থানাপুলিশেই যাবো, ইয়ার পীতিকার চাইব।

মহেশও অনুমান করেছে কিছুটা, তবু বলে

—সাক্ষী প্রমাণ তো নাই, কার ক্যান ওটা?

রাজাই বলে—এই তো নীচে কি লেখা আছে দ্যাখো?

দেখা যায় লাল রং দিয়ে লেখা আছে R.N. দুটো অক্ষর, ইংরাজী জানে না তারা, রাজাই বলে— আর এ রতন এন্ এ নস্কর। রতন নস্করের ক্যান, ওর আড়তে দেখবে সব ক্যানেই ওই কালিতেই রতনবাবুর নাম খোদাই করা আছে।

মথুর বলে—আর কি পেমান চাও, বলো? আমি ভেড়িতে জমি দিইনি তাই ই ক্যান ইখানে তেলপুরে এনে, তেল ছিটিয়ে বিবাক ধান জ্বালিয়ে দে গেছে।

জনতা চমকে ওঠে, এতবড় কাণ্ড ঘটবে তারা কল্পনাও করতে পারেনি, এখন মনে হয় এসব সত্যিই, ভিড়ের মধ্যে পাঁচকড়িও ছিল, সে রতনের আড়তে দালালি করে। তার অন্নদাতা ওই রতনবাবু।

খবরটা রতনবাবুকে পৌছে দিতে হবে। সে ভিড়ের মধ্য থেকে সরে যায় নীরবে।

রতন সকালে স্নান করে কাপড়চোপড় বদলে গদি ঘরে হিসাব নিকাশ দেখার আগে কয়েকটা ধূপ কাঠি জ্বেলে ভক্তিভরে গণেশ, মালক্ষ্মী, মাগঙ্গাকে প্রণাম করে আরতি করে।

হন্তদন্ত হয়ে পাঁচকড়িকে ঢুকতে দেখে বলে রতন,

—এখানে কেন? যা—আড়তে মাল এলো কিনা দ্যাখগে। আবার আরতি

করতে থাকে সে। পাঁচু বলে,

—একটা বেপদ হয়ে গেছে বাবু?

—বিপদ! রতন চাইল।

পাঁচু বলে—মথুরের সারা ক্ষেতের পাকা ধান রাতে আগুনে বিবাক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রতন এই শুভ খবরটা অবশ্য রাতেই পেয়েছে তেলিয়ার কাছে, এখন সেটা বাসী, তাই বলে

—তা আমি কি করবো? দানছত্র খুলিনিতো যে রিলিফ দিতে যাবো।

পাঁচু বলে—তা নয়, ওরা মাঠের ধারে দু'তিনটে বড় জেরিক্যান পেয়েছে,

—তাতে কি হয়েছে, যা তো! রতন দাবড়ে দেয় ওকে।

পাঁচু বলে—ওতে আমাদের মানে আপনার নাম লেখা আছে লাল রং দিয়ে

—সেকি! রতন অবাক হয়, একটু ঘাবড়েও যায়, পরক্ষণেই বলে—

কেউ চুরি করে নে গেছে, তুই যা, কে না কে কি করলো—আমি তার কি জানি?

পাঁচু বলে—মথুর লোকজন নে ওই ক্যানগুলো নে থানায় যাচ্ছে ডাইরী করাতে।

রতন বুঝেছে তেলিয়া ব্যাট কাঁচা কাজই করেছে, ক্যানগুলো কাজ সেরে ওখানে ফেলেই চলে এসেছে। রতন বলে,

—কোন ব্যাটা ক্যান চুরি করেছিল, তোরা কি দেখিস? যা তো!

পাঁচুকে বিদেয় করলেও রতন বুঝেছে একটা মহাভুলই করেছে তেলিয়ার দল, ওদের ব্যবস্থা পরে হবে, এখনই থানাতেই ব্যবস্থা করে রাখতে হবে।

ভূতনাথ দারোগা প্রথম বাদাবনে বদলি হয়ে এসে হালে পানি পায় না। বারাসতের ওদিকে কোন থানাতে ছিল বহাল তবিয়তে। ওদিকটা খুবই উর্বরক্ষেত্র, দারোগাবাবুও শাঁসে জলে ছিল, একটা ডাকাতির কেসটাকে চাপার চেষ্টা করতেই কর্তারা সজাগ হয়ে ওকে এই বাদাবনেই পাঠায়।

কিন্তু ক্রমশঃ ভূতনাথ এখানে এসেও বেশ জমিয়ে বসেছে ওই রতনবাবুর দয়ায়। অদূরেই সীমান্ত, সুতরাং কিছু এদিক ওদিক হয়। রতনবাবুর ব্যবসাও চলে আর ভূতনাথেরও কিঞ্চিৎ আমদানী হয়। মাছ দুধটা কিনতে হয় না। গঞ্জে নৌকায় ডাকাতি এখানে প্রায়ই হয়। তাদের অনেকেই দারোগাবাবুর চেনাজানা। ফলে তারাও করে খায়, দারোগাবাবুও খুশ মেজাজে থাকে।

সকালেই ভূতনাথ কোয়ার্টারে বসে চা খাচ্ছে। রতনবাবু থানাতে বড় একটা যায় না, সকলের নজরে পড়ে যাবে, দারোগাবাবুর বাসাতেই তার যাতায়াত। ভূতনাথ ওকে দেখে বলে—আরে রতনবাবু যে, ওরে চা দে রতনবাবুকে।

দারোগো জানে রতনবাবুর ব্যাপার মানেই তার সুখবরই, বলে—কি হলো?

রতন বলে—আমার আড়তে গদিতে দেখেছেন তো জলটল রাখার জন্য ক্যান, জেরিক্যান থাকে। ওগুলো প্রায়ই চুরি হয়, তাই ওতে নাম লেখার ব্যবস্থা করেছিলাম, আমার সেই ক্যান তবু চুরি হয়ই। আজ শুনলাম ওই যে নদীর ধারে মথুর, ওর ধান জমিতে কারা আগুন দিয়েছে, আর সেখানে নাকি ওই ক্যান দু'তিনটি পেয়েছে।

ভূতনাথ বলে—সে কি। তা ক্যান হারানোর ডাইরী টাইরী আছে?

রতন বলে—সামান্য ক্যান—কে না কে নিল তার জন্য ডাইরী?

হাসে ভূতনাথ—থাকলে এখন কেউ আপনার গায়ে হাত দিতে পারতো না। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতাম। এখন তো আপনাকেই 'ডাউট' করতে হবে। আইন তাই বলে রতনবাবু, আমরা তো আইন মেনে চলি। র‍্যদার চলতে হয়! দেখুন তো—একটা উট্‌কো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন, অগ্নিসংযোগ অগ্নিকাণ্ডও কগ্‌নিজেবল অফেন্স, ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড তাই বলে।

রতন বলে—আরে রাখুন তো আপনার পিনাল কোড, আইন, ওসবে আমি নাই, এটা রাখুন—

রতন পকেট থেকে মোটা একটা দশটাকার বাণ্ডিল বের করে দেয়।

ভূতনাথ বাণ্ডিলটা দেখে বলে—ওনলি ওয়ান বাণ্ডিল, বললেন 'ক্যান পেয়েছে দুটো' তাই—

আর একটা বাণ্ডিল ফতুয়ার এদিকের পকেট থেকে বের করে বলে —হোলো তো?

দারোগাবাবু ঘরে বসে সাতসকালে প্রণামী পেয়ে খুশী হয়, বলে—ঠিক আছে রতনবাবু, ওসব আমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব, আপনি ভাববেন না। নিন চা খান।

রতন বলে—তা জানি, তবে ওই মথুর ব্যাটা খুব ঠ্যাঁটা। একগুঁয়ে, ওটাকে একটু কড়কে দিতে হবে মশাই, এত করে বল্লাম জমিটা দিল না। অথচ ওটা আমার চাইই। নাহলে ভেড়িই করা যাবে না! এদিকে কাজে নেমে পড়লাম—দেখুন তো কি সমস্যা হলো!

ভূতনাথ বলে, —সমস্যা হবে কেন রতনবাবু, আমার দ্বারা যা করা সম্ভব করবো, যেভাবে হোক সমাধান করে নিন।

রতন বলে—আপনার ভরসাতেই তো আছি, আজ চলি।

ভূতনাথ বলে—আমাকেও থানায় যেতে হবে, চলুন।

মথুর শেষ অবধি থানাতেই আসার মনস্থ করে, সাবিত্রী বলে—থানায় গিয়ে কি হবে?

—না, এর প্রতিবাদ করবোই, হাতে নাতে ধরেছি, ছেড়ে দোব? মথুর মহেশ উপীনদের নিয়ে থানাতেই আসে, রাজাও এসেছে ওর হাতে ক্যান দুটো। ছাইমাখা চেহারা মথুরের, চোখ দুটো লাল, উস্কোখুস্কো চুল, হনহন্ করে এসে থানার বারান্দায় উঠে সামনেই বড়বাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

ভূতনাথ সামনে ছাই মাখা মথুর আর পিছনে ক্যান হাতে তার ছেলে আরও দু'চারজন লোককে দেখে এবার ব্যাপারটা বুঝে নেয়।

মথুর দারোগাবাবুর সামনে গিয়ে বলে,

—দারোগাবাবু, আমার সর্বনাশ করেছে ওই রতনবাবু, চারবিঘে জমির পাকা ধান, সারা বছরের ফসল পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে এর বিহিত করুন বাবু।

ভূতনাথ দারোগা বলে—এ্যাঁ, ছাই ভস্ম মেখে এসে থানায় নাটক করছো, রতনবাবুর খেয়েদেয়ে কাজ নাই যাবেন তোমার ধানজমিতে আগুন দিতে?

মথুর বলে—উনি ভেড়ির জন্য জমিটা চেয়েছিলেন, দিইনি, বাপপিতেম'র হাসিল জমিকে নোনাবাদা করে দেব? তাই দিইনি আর সেই রাগে এই করেছেন, সারা বছরের পেটের অন্ন কেড়ে নিলেন গো!

—থাম! ধমকে ওঠে দারোগা, বলে,

—সাক্ষী প্রমাণ কিছু আছে? একটা নামকরা লোক, অঞ্চল প্রধান, তার নামে এই সব কথা বলছিস, বদনাম দিচ্ছিস এর ফল কি জানিস?

গজগজ করে—সাক্ষী নাই, প্রমাণ নাই চলে এল থানায় নালিশ করতে, যা ভাগ্।

মথুর বলে—সাক্ষী নাই, তবে পেরমান আছে, এই দ্যাখেন, দ্যাখা তো রাজা—উ ক্যান গুলোন, এখনও কেরছিনের গন্ধ উঠছে, ওতেই কেরোছিন তেল এনে ছিটিয়ে মশাল জ্বালিয়ে মাঠকে মাঠে আগুন দিয়েছে।

ভূতনাথের সামনে রাজা ক্যানের নীচে সেই লালকালিতে লেখা আর এন অক্ষর দুটো দেখিয়ে বলে,

—'আর' এ রতন, আর 'এন' এ নস্কর, রতন নস্কর এর নাম লেখা ক্যান, ওর আড়তে যান এমন অনেক ক্যান দেখতে পাবেন, ওর লোকই—

ধমকে ওঠে দারোগো—দু পাতা ইংরিজি পড়ে যে তোর দিব্যজ্ঞান হয়েছে রে,

তা এ্যাই মথুর, এ ক্যান তুমিই চুরি করোনি তার কোন প্রমাণ আছে?

মথুর বলে—তবু নিজের ধান কেউ নিজে পোড়ায়? এ ওরই কাজ, ওকে ডাকান, এর পীতিকার করতেই হবে।

—চোপ, তোর হুকুমমত চলতে হবে? ভূতনাথ বলে।

—যে কেউ চুরি করে এটা ব্যবহার করতে পারে, তোর কথাতেই তো ওকে ধরে আনতে পারি না।

—তালে বিচার হবে না বড়লোক বলে! মথুর গর্জে ওঠে। দারোগা এবার রুলটা তুলে নিয়ে বলে,

—বিচার! এটা দেখেছিস? বেশী ঝামেলা করলে সবকটাকেই গারদে পুরে বিচার কাকে বলে দেখিয়ে দেব, যা তদন্ত হবে, তারপর কি করা যায় ভেবে দেখবো, যা।

—তাহলে কিছুই করবেন না?

দারোগা গর্জে ওঠে—যা, নাহলে সদরে চালান করে দেব, বিচার সেখানেই হবে।

রাজা বলে—এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল, সব চলে গেল স্যার!

—যাবি, না তাই করবো? তখন থেকে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে! বলছি তো, তদন্ত করবো, নাহলে সদরেই চালান করে দেব সবকটাকে চুরির কেসে জড়িয়ে।

মথুর বুঝেছে এখানে কোনদিন বিচার হবে না।

রাজা বলে—বাবা, চল স্যারের কাছে, সদরে ওর চেনাজানা আছে।

মথুর বলে—তাই চল, সদরের কর্তাদের কাছেই যাবো, এর পীতিকার চাইবো।

দারোগা দেখছে ছেলেটাকে, বলে সে

—এ্যাই ক্যান দুটো রেখে যা। যা বলছি—নালে চুরির দায়ে তোকেই ফাটকে পুরে দেব, রাখ ওদুটো।

ভূতনাথ এর ধমকে ক্যান দুটো রাখে রাজা, ভূতনাথ বলে—যা এবার। সদরের সাহেব বাবাদের কাছে গিয়ে কি করবি করগা।

গঞ্জের অনেক মানুষই রতনবাবুর নানা কুকীর্তির সঙ্গে পরিচিত। ওর গুণ্ডাবাহিনীও আছে, তারা রাতের অন্ধকারে লাখ লাখ টাকার বিদেশী মালের কারবার করে।

আড়তদারী করে লোকের মাছ নয়-ছয় করে কেড়েই নেয়, অঞ্চল প্রধান হয়ে বাঁধ বাঁধার টাকা সব লোপাট করে আবাদের, বহু মানুষকে সর্বস্বান্ত করে।

ওরা কিছু বলতে পারে না, মুখ বুজে সয় মাত্র, সহ্য করা ছাড়া আর কোন কিছু

করার সাহস তাদের নেই, আজ মথুরের চরম সর্বনাশটাকে তারা দেখেছে, দুঃখ পেয়েছে তারাও আর কিছুই করতে পারেনি। থানাও কিছু করেনি হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েও, তবু মথুরের জেদ সে থামবে না।

শহরের এক উকিলবাবুকে সে চেনে, তার কাছেই গেছে মথুর। সেও মরীয়া হয়ে উঠেছে, এতবড় অন্যায়কে সে মেনে নেবে না।

উকিলবাবু সব শুনে বলেন—কেসই করছি, ওই দারোগাকেও টেনে আনবো আদালতে, তোমার রতনবাবুকেও। বুঝলে হে, দেশে আইন এখনও আছে, এর প্রতিকার হবেই, তোমার রতনবাবু ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে, তবে—

মথুর এতক্ষণ বেশ আশা নিয়েই উকিলবাবুর কথা শুনছিল। বিরাট পণ্ডিত উকিলবাবু নিশ্চয়ই, আইনের কত মোটামোটা বই তার ঘরে থরে থরে সাজানো, আইন গুলে খেয়েছেন নিশ্চয়। তাই আশান্বিত হয়েছিল মথুর ওর কথায়, কিন্তু শেষকালে ওই 'তবে' কথাটা শুনে একটু মুষড়ে পড়ে।

—তবে?

উকিলবাবু এবার ঝেড়ে কাশেন। বলেন

—মানে খর্চা করতে হবে হে? দশহাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে হবে, কোর্ট ফি! তারপর শমন হাজির খরচা, উকিলের মুহুরীর ফি, ওকালতনামার টাকা—

মথুর কোমরের গেঁজিয়া থেকে শ'দুয়েক টাকা বের করে বলে—এই রয়েছে আজ্ঞে, ই দিয়েই যা হয় করেন, ক্ষেতিপূরণ পেলে আবার দোব।

উকিলবাবু ওইটা নিয়েই বলেন

—তাহলে মামলা শুরু করে দিচ্ছি হ্যাঁ—ওকালতনামায় সই করো, সই করতে পারো?

মথুর ছেলে রাজার কাছ থেকে দাগ বুলিয়ে নিজের নামটা কোনমতে সই করতে শিখেছে, তারই পরিচয় রেখে যায় ওকালতনামায়।

দিন চালাতে হবে, সংসার তো বসে থাকবে না, মানুষ সব সইতে পারে, ক্ষুধাকে সইতে পারে না, মথুরের সংসারের মানুষগুলোরও খিদে আছে,

মাঠের ধান, শাকশব্জী, অন্য ফসলও কিছু হতো। ধানই ছিল তাদের ভরসা। দুবেলা লাল ফাটা চালের কাদাকাদা ভাত তাই ছিল মিষ্টি। সঙ্গে ক্ষেতের কিছু শব্জী।

এখন ধানও নাই, সারা মাঠ শূন্য, পোড়া ছাই এ বিবর্ণ হয়ে আছে। ওই আগুনের

তাপে তাদের শব্জীর ক্ষেতের বেগুন, লাউগাছ টম্যাটো গাছ শাকের ক্ষেতও সব ঝলসে বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সাবিত্রী বলে—দিন চলবে কি করে? ছেলেমেয়ে দুটোকে তো কিছু খেতে দিতে হবে।

কিছু গোপন সঞ্চয় ছিল মথুরের, তার থেকে সাবিত্রীকে না জানিয়েই দুশো টাকা উকিলবাবুকে দিয়ে এসেছে, আর সামান্য কিছু আছে। সেটাতে হাত দিতে চায় না মথুর।

এর মধ্যে খোঁজ নিয়েছে পীরখালিতে বাঁধ বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে, মাটি কাটার জন্য মজুরের দরকার, চল্লিশটাকা করে মজুরি, তবে দিনান্ত খাটতে হয়, ঠিকাদারবাবুর মুন্সী খাড়া পাহারা দিয়ে কাজ করায়।

মথুর সেখানের জলো সর্দরের সঙ্গে কথা বলেছে, মথুর বলে—সামান্য যা আছে তা বীজধানের জন্য রেখেদিই বৌ। ধান পুড়ে সারও পড়েছে মাটিতে, এবার দেখবি দুনো ধান হবে, কোনমতে কটা মাস চালিয়ে নোব ওই মাটি কাটার কাজ করে।

ততদিনে শব্জীর ক্ষেতেও কিছু হবে আবার, তুই ভাবিসনি,—যেভাবে হোক আবার মাথা তুলে দাঁড়াবোই।

রাজাও দেখছে সংসারের অবস্থা, ভরপেট খাওয়া জোটে না মা বাবার, তাও দেখেছে, ওদের খেতে দিয়ে মা ফ্যানের সঙ্গে বাকী মুঠো কয়েক ভাত মেখে খেয়ে নেয়। রাজা বলে—পড়ে কি হবে মা? তার চেয়ে সবাই গাং-এ মীন ধরেও তিরিশ চল্লিশ টাকা রোজকার করে, আমিও মীনই ধরবো।

মথুর বলে—না, তুই পড়বি রাজা, দিন ঠিক চলবেই।

শিখাও জানে এদের অবস্থা, কেদারবাবুও এর মধ্যে একদিন দেখে গেছেন এদের বাড়ি-জমিটা, তিনিও অবাক হন।

—এত বড় অন্যায়ের কোন প্রতিকার হলো না? কিন্তু এও জানেন এ সবের কোন প্রতিকার হয় না, সমাজে এ অতি সাধারণ ঘটনাই। কেদারবাবু বলে,

—রাজা, তুই পড়বি, তোকে জীবনে দাঁড়াতে হবে, নিজে মাথা তুলে দাঁড়াবি। দেখবি কেউ তোর উপর অন্যায় করতে সাহসই পাবে না। তোকে মানুষের মত মানুষ হতে হবে।

রাজার চোখে জল, সেও স্বপ্ন দেখে স্কুলের পড়াশেষ করে শহরের কলেজে পড়বে, সেখানেও ভালো ফল করবে। কিন্তু যার দুবেলা ঠিকমত খাওয়াই জোটে না। তার পক্ষে সব আশা দুরাশা। কেদারবাবু বলেন,

—সকালে ওখানে চলে আসবে, পড়াশোনা করে ওখানে খেয়েই স্কুলে যাবে, শিখাও খুশী, বলে সে—তাই ভালো হবে রাজা।

অর্থাৎ কেদারবাবু রাজার একবেলার ভার নিলেন, রাজার ভালো লাগে না, কিন্তু কেদারবাবুর মুখের উপর কোন কথা বলতে পারে না। কমলাও খুশী, বলে সে—তাই ভালো।

তবু সংসার চালানোর জন্যই সাবিত্রীও ভাবে সে গাং-এ নামবে মীন ধরতে, এর মধ্যে গোলাবীও আসে।

ওই মেয়েটা এখন নিজে জীবনের যুদ্ধে সামিল হয়ে দেখেছে জীবন কত কঠিন, এই গঞ্জের মানুষদের সে চিনেছে, দেখেছে ওই সমাজের মাথাগুলোকেও। নেতা গোবর্দ্ধনবাবু, ওই ব্যাঙ্কের সাহেব, এখানের রতনবাবু, ওই পেটমোটা দারোগা ভূতনাথবাবুদের সে হাড়ে হাড়ে চিনেছে।

রতনবাবু যে মথুরের ধানক্ষেতে আগুন দিয়েছে তা জানে গোলাবী। ওই রতনবাবুর ওখানে রাত গভীরেও তারও যাতায়াত আছে।

কোন রাতে রতনবাবুও পদার্পণ করে তার ঘরে। সেদিন দারোগাবাবুও রাতে এসে হাজির হয় গোলাবীর ঘরে।

গোলাবী অবাক হয়—ওমা আপনি!

রান্না করছিস গোলাবী। উনুনের আগুন এর আভা পড়েছে গোলাবীর সুন্দর মুখে। কাপড়চোপড় অবিন্যস্ত, দারোগা ভূতনাথবাবু বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

গোলাবী চেনে ওই চাহনি। ক'বছরেই সেও ওই মানুষগুলোকে চিনেছে, দিনের আলোয় ওদের এক মূর্তি আবার রাতের অন্ধকারে ওরা সম্পূর্ণ আলাদা জীব।

ওদের নিয়ে খেলতেই চায় গোলাবী, তাই সর্বাঙ্গে ঢেউ তুলে চোখের তারায় কি মাদকতা এনে এগিয়ে আসে।

—ধরতে এসেছো না ধরা দিতেই এসোছো গো? এ্যাঁ—

ভূতনাথ দারোগার তখন গদগদ অবস্থা। বলে—তুই কি যে বলিস! কইরে—বসতে বললি না।

নিজেই চাটাইটা টেনে বসে। গোলাবী বলে—ঘরে তো বোতল টোতল নাই, চা দিব?

ভূতনাথের সন্ধ্যার পর চা চলে না। বলে—থাক। কাল গোটা দুয়েক বোতল পাঠিয়ে দেব, রেখে দিস। ক্যামন?

হঠাৎ ভেড়ির ওদিকে অন্ধকারে এক ঝলক টর্চের আলো পড়তেই ভূতনাথ

চমকে ওঠে। চাপা স্বরে শুধোয়

—কে রে? এসময় ইদিকে?

গোলাবী দেখছে দারোগাবাবুকে, বলে উছল কণ্ঠে—হবে কুন নাগর। আমার তো নাগরের অভাব নাই গো।

ভেড়ির উপর থেকে শোনা যায় খোদ রতনবাবুর কণ্ঠস্বর।

—গোলাবী! গোলাবী আছিস নাকি রে?

ভূতনাথ সটান উঠে দাঁড়িয়েছে, গোলাবী বলে

—উঠলো কেনে? বসো না!

আর বসা, দারোগা দেখছে ওই ছায়ামূর্তি অন্ধকারে এই তীর্থের দিকেই এগিয়ে আসছে। দারোগা হাতে নাতে ধরা পড়তে রাজী নয়, দারোগাই এখন চোর। উঠে এদিক ওদিক চেয়ে দারোগাবাবু বিশাল দেহ নিয়ে ঘরের পিছনে নর্দমার ধারে অযত্ন বর্দ্ধিত কচুবনের গভীরেই সেঁদিয়ে গেল পাকা চোরের মত। ওই পথেই কাদা নোংরা মাড়িয়ে সটকাবে।

হাসছে গোলাবী ওকে ওইভাবে পালাতে দেখে, ওদিকের আগড় ঠেলে ঢুকছে রতনবাবু। টর্চের আলোয় দেখে গোলাবী তখন হাসিতে ফেটে পড়ে, রতন শুধোয়—হাসছিস কেন রে?

গোলাবী বলে—হাসি পেলো তাই।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলি? কে যেন বেরিয়ে গেল আঁধারে।

ভূতনাথ তখন কচুবনের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছে, কচুগাছ নড়ার শব্দের ভয়ে সে অনড়। মশার পাল ছেঁকে ধরেছে, মশার হুলের জোরও কম নয়, তার মত গণ্ডারের চামড়া ভেদ করেও তারা হুল ফোটাচ্ছে, কিছু করার নাই।

গোলাবী বলে

—নাগর গো। এলো—আর তাড়ালে তাকে?

রতন নস্কর গর্জে ওঠে—কোন শ্যালা রে, বল—তার নাম বল। দেখছি তাকে?

গোলাবী বলে—আর দেখে কি করবে? সে তো পগারপার।

রতন বলে—কেউ তোকে জ্বালাতে এলে বলবি, ব্যাটাকে গাং-এর পলিতে পুঁতে রেখে দেব, আমার এলাকায় কোনরকম অসভ্যতা সইবো না, কোন ভয় নাই তোর।

গোলাবী চেনে ওদের সবাইকে, ওই লোকগুলোর লোভ থেকে বাঁচার পথও পায়নি, তাই একটা তীব্র অপমানের জ্বালা তার মনকে কুরে কুরে খায় ঘুণপোকার মত। প্রতিবাদের পথই খোঁজে, কিন্তু পথের সন্ধানও মেলে না।

সেদিন গোলাবী দেখে গাং নেমেছে সাবিত্রী। হাটু ভোর নদীর জলে নেমে সবুজ নাইলনের জাল দিয়ে মীন ধরছে, সঙ্গে রয়েছে কলি। ভাটার-গাং, জল অনেক নীচে, থিক থিক করছে পলিকাদা, পা ডুবে যায়, ওই অবস্থাতে জলে নেমেছে ওরা।

গোলাবী অবশ্য মীন ধরে না, সকালে হাটতলায় আড়ত থেকে কিছু মাছ নিয়ে বসে। আর তার খদ্দেরের অভাব নাই, সেই মাছ বিক্রী করে যা পায় সেটা একার পক্ষে যথেষ্টই, এছাড়া ঘরে দুটো গরুর দুধও বিক্রী করে।

কিন্তু রাজার মা বোনদের অবস্থাটা এখন যে কত করুণ তা বুঝেছে। আজ মনে হয় গোলাবীর—এর জন্য দায়ী ওই রতন নস্করই। গোলাবী দেখেছে ওদের পোড়া ক্ষেত। গেছলও গোলাবী সমবেদনা জানাতে। কিন্তু ওদের যে এমনি অবস্থা তা সে জানতো না।

সাবিত্রীর অভ্যাস নাই এই কাজে, ঠাণ্ডা জলের কাদায় পা জমে আসে। গাং-এর বুকে জাল পেতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, কলিও আসে সঙ্গে, মাটিতে মায়ের ধরা মীনগুলো আগলায়। নাহলে যে কোন সময় চিলে ছোঁ দিয়ে সব নিয়ে পালাবে, কাকও পিছনেই ঘোরে।

সাবিত্রীর হাত পা ঝিম ঝিম করে, তবু উপায় নাই, ঘরে ক'টি প্রাণীর রসদ তো চাই, কষ্ট হয় কলির জন্য, ফর্সা মেয়েটার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

বলে সাবিত্রী—ছায়ায় গে· বোস কলি, তখন থেকে ঘুরছিস রোদে রোদে!

কলি বলে—তুমিও তো রয়েছো, আমিও পারবো। দুপুরের শেষে যেটুকু মীন ধরে তাই মহাজনের আড়তে দিয়ে পঁচিশ তিরিশ টাকা যা পায় তাই নিয়ে চাল নুন আরও কিছু কিনে ঘরে ফেরে।

সেদিন ঘরে ফিরে দেখে সাবিত্রী গোলাবী ধামায় এক ধামা চাল, আলু, দুটো লাউ কিছু মাছ এনে নামায়,

সাবিত্রী অবাক হয়—এসব কি রে?

গোলাবী বলে—কাকী, ক্ষেতে হলো, একা মানুষ, তাই চাট্টি দে গেলাম রাজাকে। লাউএর তরকারী মাছ দিয়ে রেঁধে দিও রাজাকে। আর একটা কথা—

সাবিত্রী চাইল, গোলাবী বলে—জাল বুনতে তো পাবো কাকী, সুতো দে যাবো তাই বুনো। আমিই মহাজনকে বলে দিনের মজুরী দিন দিয়ে যাবো, তা তিরিশ টাকা তো হবে। তুমি বাপু গাং-এ নেমো না মীন ধরতে, উ বড় বেপদের কাজ গো। পেরায়ই তো কামটের দাঁতে পড়ে দু'একজন করে মরছে, উ কাজে যেও না।

সাবিত্রীর চোখে জল আসে।

ওই গোলাবীর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছে সে, কিন্তু দেখে সারা আবাদের কেউ তাদের এই বিপদে পাশে আসেনি, এই মেয়েটাই এগিয়ে এসেছে, সাবিত্রীও নিশ্চিন্ত হয়। জাল সে ভালোই বুনতে পারে, বাড়িতে বসে তবু কিছু রোজকার হবে। ওই মথুরের সাহায্য হবে।

মথুর গঞ্জে থাকলেও এখানের কোন ব্যাপারে সে থাকতো না। মাঠের কাজ নিয়েই থাকতো। এখন মাঠের কাজ নাই, বৃষ্টি হলে তবে মাঠে নামবে, বীজ ধান ছড়াবে, ততদিন সে এখন পীরগঞ্জের বাঁধের কাজই করছে। সকাল নটা থেকে মাটি কাটতে শুরু করে, একদল মাটি কাটে, অন্যরা বয়ে নিয়ে গিয়ে ভেড়ি বাঁধে ফেলে। দিনভোর খেটে পায় চল্লিশ টাকা তার থেকে দু টাকা সর্দাদেরর কমিশন, তাও দিতে হয়।

ঘরে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আশা করে মথুর, আদালতে কেস উঠবে, উকিলবাবু বলেছের—সে জিতবেই, ক্ষতিপূরণ দিতেই হবে ওই রতনবাবুকে, তার ধানক্ষেত পোড়ানোর জন্য সেই দোষী, আগুন দেওয়া প্রমাণিত হলে শাস্তিও হবে, সাতগাঁয়ের লোক সারা গঞ্জের মানুষ জানবে রতনবাবু কেমন সাংঘাতিক লোক।

রতন নস্কর এখন নিজের ভেড়ির কাজে ব্যস্ত, নন্দ সরকার তেলিয়া-কালিয়ার দলকে নিয়ে এখন বিশাল মাঠের উপর মাটির বাঁধ দিচ্ছে, মজুরের অভাব নাই, অনেকের জমি কিছু নগদ টাকা দিয়ে দখল করে সেইখানেই জমির মালিকদেরই মজুর বানিয়ে ভেড়ি বাঁধের কাজে লাগিয়েছে, তাদের স্বপ্ন দেখায়—তোর জমিতে ভেড়ি হলে বছরে বিঘে পিছু দু'হাজার টাকা করে পাবি, জমি তোদেরই থাকবে—শুধু মাছের স্বত্ত্ব ভেড়িদারের।

অনেকে চাপে পড়ে, কেউ অভাবে পড়ে জমি দিয়েছে, কিন্তু এখনও ভেড়ি মুখের পাঁচ বিঘে জমি হাতে আসেনি, ওখানে পাকা গাঁথুনি করে গেট বসিয়ে নদী থেকে জল তুলতে হবে, ওইটাই ভেড়ির প্রাণ।

নন্দ সরকার বলে—ব্যাটা মথুর এখন পীরখালিতে বাঁধের কাজ করছে, আর বউটাকে দেখলাম গাং-এ মীন ধরছে, পেটে টান পড়লে সুড় সুড় করে মাথা নুইয়ে আসবে, এলো বলে—

রতন বলে—মীন ধরছে, ওই মীন মহাজনকে বলো—ওর মীন যেন না কেনে। মথুরের বউটার কাছ থেকে মীন কিনলে ওর এখানের মীন কেনার পাট তুলে দেব।

নন্দ জানে রতনবাবুর সে ক্ষমতা আছে, তাই বলে—ওকে বলছি, যাক মথুরের বউ মীন নে গোসাবায়, ততক্ষণ সব শেষ হবে মীনের।

রতন কি ভেবে বলে

—আর ওই পীরখালির ঠিকাদার?

নন্দ বলে—ওরা তো ক্যানিং এর লোক প্রধানবাবু, ওদের কাছে কমিশনের কথা বলতে সেদিন ক্যানিং-এর লোকাল অফিসের কথা শুনিয়ে দিল।

রতনও তা জানে। তাই বলে—ও ব্যাটারা ত্যাঁদড় আছে, দেখা যাক কি করা যায়।

এমনি সময় কোর্টের শমন আসতে চমকে ওঠে রতন! নেতা গোবর্দ্ধনবাবুও এসেছে, সেও শমনটা দেখে বলে

—এ্যাঁ, তোমাকে শমন ধরিয়েছে আদালত থেকে ওই মথুর! অগ্নিসংযোগ—ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির চার্জে?

রতন ভাবতে পারেনি যে ওই মথুর সত্যিই আদালতে গিয়ে তার নামে কেস করবে, শমন ধরাবে।

রতনের এ অপমানই, তার মত লোককে কাঠগড়ায় তুলতে সাহস করে ওই মাটিকাটা মজুর মথুর। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে রতনের মান ইজ্জৎ থাকবে না এখানে, সাধারণ মানুষ যদি জানতে পারে আদালতে তোলা যায় রতনবাবুকে। এরা আর তাকে মানবে না, তার ব্যবসাপত্র চৌপট হয়ে যাবে।

গোবর্দ্ধন বলে—পাবলিক আর তোমাকে ভোটই দেবে না, ভয় ভেঙ্গে যাবে ব্যাটাদের।

রতন রেগে উঠেছে, কেউ তাকে এভাবে অপমান করতে সাহস পায়নি, ওই মথুরকে এবার রতন উচিত শিক্ষাই দেবে।

•

মথুর জানে না এসব কাণ্ড হয়েছে। সে পীরখালির বাঁধে কাজ করে মজুরি নিয়ে ফিরছে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখানে সন্ধ্যাটা নামে অতর্কিতেই। নদীর জলের বিস্তারে শেষ আলো রং মেখে সূর্য অস্তাচলে যায়, বেগুনি আভা ধীরে ধীরে পরিণত হয় অন্ধকারে—আর তা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবিড়তর হয়ে ওঠে।

এদিকে বসতি তেমন নেই, মুক্ত গাং—ওপারে শুরু হয়েছে আদিম অরণ্যভূমি, ওখানে মানুষের বসত আর নেই।

অন্ধকারে ওঠে বাতাসের হু হু দিকহারা দীর্ঘশ্বাস। কখনও নিভৃত রাতে বনের দিক থেকে ক্ষুধার্ত বাঘ গাং সাঁতরে এদিকে এসে লোকালয়ে হানা দেয়—গোয়ালের গরু, বাছুর মারে। ঝোপের আড়ালে মড়িটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে রাতের আহার সেরে আবার ফিরে যায় গাং সাঁতরে বনের নিরাপদ আশ্রয়ে, মানুষ জন পেলেও হানা দেয়।

এদিকে তাই সন্ধ্যার পর লোকজন কেউ আসে না। পীরখালির বাঁধ থেকে তাদের গঞ্জে যাবার একটা রাস্তা অবশ্য আছে সাতজেলের ওদিক হয়ে, সেটা ঘুর পথ, সেখানে কিছু লোকালয় পড়ে, মানুষমারির হাটতলাতেও লোকজন থাকে।

কিন্তু মথুর সোজা ওই নির্জন ক্রশ ভেড়ি দিয়েই যাতায়াত করে, তাতে অনেকটা দূরত্ব কমে, চলেছে সে।

গাং-এর ধারে কিছু গরান—বাইন গাছের জটলা, আঁধার নেমেছে—দু'চারটে তারা আকাশে ঝিকমিক করে, আজ একটু দেরীই হয়েছে মথুরের,

হঠাৎ ওই বাইন ঝোপটা নড়ে ওঠে। চমকে ওঠে মথুর, হাতের কুঠারটা ধরে সামনের দিকে চাইল, সেই মুহূর্তেই ঘাড়ের উপর কোপটা পড়তে বাঁধের উপর থেকে বাইন বনে ছিটকে পড়ে মথুর, বেশ গভীরভাবেই বসেছে টাঙ্গিটা।

তেলিয়া কালিয়ারাও ওৎ পেতে ছিল, ওরা ধরে রেখেছিল এই পথেই ফিরবে মথুর। রতনবাবুর নির্দেশমত তারা ঘাড়েই কোপ মারে, আর এক কোপেই খতম করেছে তাজা মানুষটাকে ওরা!

রক্তের ধারা বয় পলিমাটিতে, অবশ্য জোয়ারের জলে এই জায়গাটা ধুয়ে যাবে, কোন চিহ্নই থাকবে না, তেলিয়া বলে—শালা খতম।

কালিয়াও দেখে—হ্যাঁ। কোন শান আর নেই, স্থির হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহটা।

তেলিয়া বলে—ধর, শালার সৎকার করে দিই।

ওরা দুজনে দেহটা ধরে গাং-এর আবর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সশব্দে দেহটা গাং-এ পড়ে, গাং-এর জলে রক্তমাখা হাত ধুয়ে তেলিয়া বলে—যা শালা, কুমীর কামটের ভোগে লাগবি। ব্যাটারা জোর আশীর্ব্বাদ করবে তোকে।

রাত হয়ে আসে, ঘরের মানুষটা এখনও ঘরে ফিরল না। ভাবনায় পড়ে সাবিত্রী, কলিও ঘর বার করে, রাত ঘনিয়ে আসে, রাজাও ফিরে দেখে বাবা আসেনি।

সাবিত্রী বলে—কি হল তো বাবার, অন্যদিন ফিরে আসে কখন,

রাজা বলে—দেখি মহেশকাকার ওখানে আছে বোধ হয়। হ্যারিকেন নিয়ে বের হলো কলিও বলে—আমিও যাই দাদা।

ভাই বোনে আসে মহেশ, মদন—নেত্যদের বাড়িতে, সেখানেও ফেরেনি বাবা, রাতের অন্ধকারে মাঠ আলপথে, ভেড়ি থেকে হ্যারিকেন হাতে দুটি কচি গলার আর্ত আহ্বান ওঠে—বাবা, বাবা গো—বাবা,

কোন সাড়া নেই, বনের বাতাস বয়, হু হু শব্দে, তারার ঝিকিমিকি ওঠে গাং-এর বুকে। ওদের ডাকটাও ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসে, কোন খবরই পায় না তারা। মহেশ, নেত্যরাও খোঁজাখুজি করে হতাশ হয়।

সাবিত্রী কি করবে জানে না, রাজা-কলিও ফিরেছে, নেত্য বলে—রাত ভোর কাজ হবে বোধহয়, ডবল রোজ দেবে, খোরাকীও, তাই বাঁধেই রয়ে গেছে মনে হয়

বৌ, কাল সকালেই দেখবে ঠিক ফিরে এসেছে মথুরদা।

রাত কাটে সাবিত্রীর দারুণ উৎকণ্ঠায়, ঘুম আসে না। রাজা, কলি ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্ধকার ঘরে একা জেগে আছে সাবিত্রী, কোন শব্দ শুনলেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে, এই বোধহয় ফিরে এল লোকটা।

কিছু না! বাতাসের শব্দ, কেউ নয়, হতাশ হয় সাবিত্রী, সারা রাত জেগে ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না।

ভোরে উঠেই রাজাই বের হয় বাবার সন্ধানে, পীরখালিতেই যাবে, মা তখনও ঘুমোচ্ছে। গঞ্জের লোকজন ভোরেই জেগে ওঠে, মাছের আড়তে নৌকাগুলো ফেরে, নিত্যর এর চায়ের দোকানে কাজ শুরু হয়েছে।

হঠাৎ বাঁধের ওদিকে লোকজনের ভিড় দেখে এগিয়ে যায় রাজা, সকাল হয়েছে, তখন ভাঁটার টান শুরু হয়ে গেছে রাতের জোয়ারের পর।

সেই ভাঁটার টানে পলি কাদার উপর পড়ে আছে একটা মৃতদেহ, কাঁধের কাছে গভীর ক্ষত, মাছে ঠুকরের ক্ষতটাকে বিকৃত করেছে, চমকে ওঠে রাজা, গঞ্জের মানুষও বলে

—ই যে মথুর কাকা গ! ওরে রাজা—

রাজাও ছুটে যায়, হ্যাঁ তার বাবাই, পরণে সেই ফতুয়ায় রক্ত আর কাদার দাগ, চোখ দুটো বিস্ফোরিত।

লোকজন জুটে যায় নিমেষের মধ্যে, সারা গঞ্জে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। পৌছে যায় সাবিত্রীর কাছেও, উন্মাদিনীর মত ছুটে আসে সাবিত্রী, কলি ও কাঁদছে, সাবিত্রীর কাতর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে কি বিষণ্ণতায়।

কেদারবাবুও এসে পড়েন।

রতন খবরটা পেয়েই একটু ঘাবড়ে যায়, সে অবশ্য জেনেছিল খবরটা গত রাতেই, তেলিয়াই এসে সুখবরটা দিয়েছিল।

—কাম ফিনিস?

রতন বলে—লাশটা?

—ওটা মাঝগাং-এ বুড়িয়ে দে এসেছি, কুমীর কামটে ফিনিশ করে দেবে।

কিন্তু লাশটা যে জোয়ারের জলে ভেসে এই গঞ্জের ওদিকেই এসে ঠেকবে তা ভাবেনি, রতন ঘাবড়ে যায়। তেলিয়াদের দিয়ে কোন কাজই নিখুঁতভাবে হবে না, আগুন লাগাতে গিয়ে ক্যানগুলো ফেলে এসেছিল, আজ আবার একটা ঝামেলা না বাধায়।

অবশ্য রতন জানে এসব ঝামেলা কি করে সামলাতে হয়, সেই তাই চরণ

ডাক্তারকে নিয়ে এসেছে।

ততক্ষণে লোকজন ভিড় করেছে, রতন ভিড় ঠেলে আসে, সঙ্গে চরণ ডাক্তার, কেদারবাবু রতনকে দেখে বলে,

—দেখুন রতনবাবু, মথুরকে কারা খুন করে গাং-এ ফেলে দিয়েছিল বেচারা।

—খুন! মার্ডার, নো নো মাস্টারমশাই, ঘাড়ের পিছনে ক্ষত দেখে মনে হচ্ছে বাদাবনের কোনও বাঘেরই এ কাজ। ঘাড়ে ধরে ফিনিশ করে সাঁতরে মাল নিয়ে গাং পার হয়ে যাবার সময় মুখ থেকে খুলে স্রোতের টানে উজিয়ে ভেসে এসেছে। দেখুন—বাঘের কামড়ের দাগই কাঁধে। চরণ ডাক্তার বলে,

রতন বলে ওঠে

—তাই মনে হয়! কি হে?

নন্দ সরকার বলে—আজ্ঞে বাঘের চোটই, দ্যাখেন জামাটও ছেড়া—ফর্দাফাই, পিঠেও আচড়ের দাগ, এ বাঘ না হয়ে যায় না।

রতন এবার পায়ের তলে মাটি পেয়েছে, আরও দুচারজন এই মতটাকেই সমর্থন করে, কে বলে

—ক'দিন থেকেই একটা বাঘ গাং পার হয়ে এসতিছে বাবু, হাঁকাড়ি শুনছিলাম।

রতন বলে—ওই ব্যাঘ্র প্রকল্প করেই সর্বনাশ করবে। বাঘ মারা চলবে না, বাঘে মানুষ মারবে তারও বিচার হবে না, এই যে দারোগাবাবু?

গোলাবীও এসে জুটেছে, সে দেখছে ব্যাপারটা। তার কেমন সন্দেহ হয়, দারোগাবাবু আসতেই রতন এবার বলে,

—দেখুন, দেখুন দারোগাবাবু, বাঘগুলোর কাণ্ড দেখুন, এমনি করে মানুষের সর্বনাশ করবে, আমার এলাকায় এসব সহ্য করবো না।

দারোগাবাবু দেখছে ডেডবাডিটা।

গোলাবী বলে—বাঘ না মানুষ বাঘ গো? বাঘে ধরলে ঘাড় তো মটকে দিত। তাতো লাগছে না, পিছন থেকে কোপ টোপ কেউ মারেনি তো?

চরণ ডাক্তার বলে—তুই দেখছি ডাক্তার হয়ে গেলি রে গোলাবী? এ্যাঁ—পরিষ্কার বাঘের চোট।

দারোগাবাবু এর মধ্যে রতনবাবুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, দু জনের মধ্যে নীরব চোখাচোখিও হয়ে যায়, দারোগা বলে

—এ বাঘের কামড়েই মরেছে, নাঃ—এভাবে চললে মানুষ আর থাকবে না। এ বাঘের মুলুকেই পরিণত হবে, প্রধানবাবু—এর তদন্ত হবে, ডেডবডিটা এখন সদরে পাঠানোর দরকার, পোস্টমর্টম করা দরকার।

রতন বলে—যখন বুঝছেন বাঘের কামড়েই মরেছে, তখন আর মড়ার ওপর খাড়ার ঘা কেন দেবেন দারোগাবাবু কাটা ছেঁড়া করে? বেচারারা ডেডবডিও পাবে না, লোকটার সৎকারও হবে না?

সাবিত্রীর চোখে জল, সে বলে,

—ওসব আর করে দরকার নাই গো, শেষ কাজটুকু করতে দ্যান।

রতন বলে—দারোগাবাবু, ওরা চাইছে না। এসব করে লাভ কি? অঞ্চল প্রধান হিসাবে বলছি এ দুর্ঘটনায় মৃত্যু। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ওর সৎকারটুকু হতে দেন, তবু বেচারার আত্মা শান্তি পাক। আহা! বড় ভালো লোক ছিল মথুর।

তারপরই রতন ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দেবার জন্যই বলে—ওহে সরকার এ্যাই তেলিয়া হাঁ করে মজা দেখতে এসেছিস? একটা লোকের এত বড় সব্বোনাশ হয়ে গেল, এখন সৎকারের ব্যবস্থা তো করতে হবে।

রতন বলে—মথুরের বৌ, এসময় কাঁদলে চলবে না, এখন মনে সাহস আনতে হবে, তুমি ভেব না, অঞ্চল প্রধান হিসাবেও তো কিছু কর্তব্য আমার আছে, সেটা করতে দাও, ওর সৎকারের সব ব্যবস্থা আমি করছি, আহা! এভাবে চলে গেল মথুর।

ভগবানের মার—দুনিয়ার বার।

আর দারোগাবাবু, ওই ফরেস্টের বাবুদের কড়া করে রিপোর্ট নেবেন, এর জন্য ওদেরই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বৈকালের দিকেই মথুরের শেষ চিহ্নটুকু চিতার আগুনে পুড়ে ছাই করে দিল ওই রতনবাবুর দল, সাবিত্রীর চোখে জল। রাজাই বাবার মুখাগ্নি করে। কেন জানে না বার বার তার মনে হয় এই মৃত্যু কেমন রহস্যবৃত! বাবার নীরব কঠিন চাহনি যেন বারবার এই কথাই বলতে চেয়েছে।

মা, কলির চোখে জল, রাজার সব দুঃখ শোক যেন পাথর এর মত জমাট বেঁধে গেছে। সেও চেয়েছিল পোস্টমর্টম হোক, বাবার মৃত্যুর কারণটা পরিষ্কার হবে। কিন্তু ওই রতনবাবুই ওসব কথায় কান দিল না, দারোগাও চুপ করে রতনের কথাতেই সায় দিল।

সব শেষ হয়ে গেল তার বাবার।

সব কাজ শেষ করে ঘরে ফেরে, শূন্য ঘর। সেই মানুষটার সব চিহ্ন তখনও মিশে আছে এখানে, তার বসার মোড়াটা দাওয়ায় রাখা, কোনে হুকো কলকেটাও রাখা আছে।

কিন্তু মথুর আর কোনদিন ফিরবে না, রাজার দুচোখ জলে ভরে আসে। আজ তার মাথার উপর আর কেউ নাই।

একা সে—তার উপরই এখন মা বোনের ভার, এবার কি দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে রাজা।

তার কিশোর মনে বাবার মৃত্যুটা কঠিন আঘাতই হানে, জীবনে নিষ্ঠুর মৃত্যুকে সে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলো।

লোককথায় আছে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রথম 'শোক'-এর সৃষ্টি করে তা উদ্ভিদ জগতকে দিলেন, কিন্তু সবুজ প্রাণময় ফুলে ফলা ভরা প্রকৃতি, শোকের তীব্রতাকে সহ্য করতে পারেনি, গাছের সব পাতা ঝরে গেল—ফুল ফল ঝরে গেল, রুক্ষ শুষ্ক হয়ে গেল সবুজ প্রকৃতি।

সৃষ্টিকর্তা দেখলেন প্রাণীজগৎ বিপন্ন হবে, তখন সেই শোক অর্পণ করলেন বসুন্ধরাকে, সেখানেও বিপদ; শোকের তীব্রতার মাটি ফেটে গেল, বন্ধ্যা অনুর্বর হলো ধরিত্রী।

সৃষ্টিকর্তা পড়লেন চিন্তায় শোক কাকে অর্পণ করবেন, শেষে ধরিত্রীর বুক থেকে 'শোক'কে তুলে অর্পণ করলেন মানুষের উপর।

শোকের তীব্রতায় মহ্যমান মানুষ দিনভোর উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ালো; পৃথিবী শূণ্য নিঃস্ব হয়ে গেল তার সামনে, দিন কেটে গেল, ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত সে, শোকের তীব্রতায় ক্ষুধা তৃষ্ণা এতক্ষণ ভুলে ছিল। এবার সেটা বেড়ে উঠতে দুদিন পর তৃষ্ণায় পানীয় গ্রহণ করলো, গ্রহণ করে অন্ন, এতদিন পরে অন্নজল গ্রহণ করে সে অজান্তেই অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস—আঃ।

ঈশ্বর দেখলেন মানুষই পারবে শোক সহ্য করতে অন্য কেউ যা পারেনি, সেই থেকে শোক দুঃখ হলো মানুষের সঙ্গী, চিরন্তন সঙ্গী। মানুষই সব দুঃখ শোক সহ্য করে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, বাঁচার লড়াই এর কাছে শোকও পরাজিত।

রাজার জীবনেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বাবা মারা যাবার পর এমন কিছু তাদের নেই যে বসে বসে খেলেও চলবে।

মাঠের ধান সব শেষ।

এদিকের ক্ষেতের কিছু আনাজপত্র বেঁচেছিল তাই থেকে কিছু শাক, বেগুন, টমেটো হয়, আলুও কিছু হয়েছে, তিনটি প্রাণী খেতে। কারো বাড়িতে কাজ করার কথা ভাবে সাবিত্রী। কিন্তু তাতেও সম্মানে বাঁধে।

আজকাল নদীতে মীন ধরছে অনেকেই। কিন্তু সেটাও বেশ বিপদের কাজ।

নোনাগাং-এ হাটুভোর পলি কাদায় কোমর জলে দাঁড়িয়ে জাল পেতে রাখতে হবে, মাঝে মাঝে তুলে জালে ডিম—কচিকচি নানা মাছের পোনা, ডিম ওঠে, সেগুলো ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র চিংড়ি পোনাই বের করে রাখতে হবে বাটিতে জল দিয়ে, ছ'সাত ঘণ্টায় বড় জোর এক বড় চামচ মীন হবে—অবশ্য তার দাম গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা।

সাবিত্রী ভাবছে নানা কথা।

গোলাবী আসে মাঝে মাঝে। বাবা মারা যাবার পর গোলাবীই মা ভাই বোনদের ভার ঘাড়ে নিয়েছে, দুটো বোনের বিয়ে দিয়েছে, আড়ত থেকে মাছ নিয়ে সে হাটে বেচে, বাড়িতে কয়েকটা গরুও পোষে, সেই দুধের যোগান দেয়, বাড়ি বাড়ি।

গোলাবী জানে বাঁচার লড়াইটা কত কঠিন, কত বেদনাময়। হাটে বসে সাবিত্রী মাছ বেচতে পারবে না। গোলাবী চেনে এখানের খেঁকশিয়ালদের। তাই বলে সাবিত্রীকে

—কাকী, বাঁচতে তো হবে, ধান হতেও দেরী আছে।

সাবিত্রী বলে—একটা পথ বের করবোই, যেমন করে হোক রাজাকে পাশ করাবোই, ছেলেটা মানুষ হলে কোনমতে আমার দিন ঠিক চলে যাবে। জাল বুনেও কিছু পাই।

তাই সাবিত্রী বলে—রাজা তুই ইস্কুলে যাবি, পড়াশোনা করবি বাবা,

রাজা বলে—কিন্তু দিন চলবে কি করে মা?

মা বলে—কোনমতে ঠিক চালিয়ে নোব, তুই ভাবিস না। তুই মন দিয়ে পড়, তোকে পাশ করতেই হবে রে।

রাজাও চায় পড়াশোনা করতে।

কিন্তু দেখেছে সংসারের অবস্থা, দিনভোর ঠিকমত খেতেও জোটে না। শাক পাতা—কচু শাক সামান্য চাল দিয়ে ঘেঁটে নুন দিয়ে তাই খেতে হয়।

সকালে অনেকদিন তাও জোটে না, রাজা না খেয়েই পড়তে যায়।

কেদারবাবু ছেলেটাকে ভালোবাসেন নিজের ছেলের মতই। পড়াশোনাতে খুবই ভালো, বৃত্তিও পেয়েছিল, জানেন তিনি ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলে একটা পথ হবে রাজার, কমলাও ভালোবাসে রাজাকে।

সকালে পড়তে আসে, কমলাই মুড়ি গুড় দেয়।

—নে খা রাজা।

রাজা বলে—আবার এসব কেন কাকীমা?

শিখা বলে—মা রাজাকে স্রেফ গুড় মুড়ি দিয়েছো? রাজা বলে কথা! ওই বাজে খাদ্যি কি ওর মুখে রোচে? রাজভোগ টাজভোগ দেবে তো।

রাজা ওই মুখরা মেয়েটাকে সমীহ করে, বলে

—না, না কাকীমা, কথায় আছে পায় না মিয়োনো মুড়ি/মিঠাই মণ্ডা গড়াগড়ি, মুড়িই ঢের, তবে এত কেন?

কমলা জানে ওদের সংসারের অবস্থা। গোলাবী মেয়েটা এই গঞ্জের চলমান গেজেট, এখানের সকলের হাড়ির খবর সে রাখে, মায় রতন নস্কর এই গঞ্জের মস্ত ব্যবসায়ী, আড়তদার তার খবরও।

হারু পাল গঞ্জের দোকানদার, এখানের ডাক্তার চরণ দাসের গিন্নী কবে খ্যাংরা নিয়ে চরণকে আপ্যায়ণ করেছিল সে খবরও গোলাবীর নখদর্পণে।

কমলা বলে—তুই এত সব খবর কোথা থেকে পাস রে গোলাবী?

গোলাবী বলে—পাই গো, আর অনেকের অনেক খপর, রতন গো—তোমাদের ধম্মপুত্তুর, ওর লজর পড়েছে এবার ওই মথুর কাকার জমিগুলানের দিকে, শকুনির লজর বলে না, এ তাই।

কমলা বলে, —বড় কষ্টে আছে ওরা!

কমলা তাই রাজাকে একটু আদর যত্ন করে, ছেলেটাও খুব ভালো।

সকালে পড়ানোর পর কেদারবাবু স্কুলে যাবেন, শিখাও তৈরী হয়।

কমলা বলে—রাজা, তুই খেয়ে দেয়ে স্কুলে যাবি।

রাজা জানে তাদের ভাত কখন হবে তার ঠিক নাই, তবু বলে,—বাড়ি গিয়ে খেয়ে নোব কাকীমা।

কমলা বলে—খেয়ে যা তো।

রাজা খেতে বসেছে, শিখাও খাচ্ছে, রাজা পাতের ভাত তরকারীগুলো দেখছে, মনে পড়ে মা, কলির কথা, তাদের এক বেলা ওই কচুশাক, কুমড়ো সেদ্ধ মেশানো ভাতই সম্বল তাও পেটপুরে জোটে না।

কমলা বলে—খা রাজা!

রাজার চমক ভাঙে, ভাতটা নোনতা বোধ হয়, কখন অজান্তে তার ভাতের উপর ক'ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল। কোনমতে খায় রাজা।

শিখাও তৈরী হয়েছে, বলে—

—চলো, স্কুলে যাবে তো!

রাজা বের হলো স্কুলের দিকে, পড়াশোনা করে তবু কেন জানে না বারবার মনে পড়ে মা-কলির কথা, তারা কি করছে কে জানে।

স্কুলের পর সেদিন রাজা ফিরছে বাড়ির দিকে।

গাং-এর দিকে হঠাৎ কলরব আর্তনাদ শুনে চমকে ওঠে, গাং-এ কোন নৌকা ডুবছে বোধহয়, ছুটে যায় রাজা ওদিকে।

দেখে গাং-এর কাদায় জলে গ্রামের অনেকেই মীন ধরছিল, নগার মাও নেমেছিল মীন ধরতে, তাকেই কামটে কেটেছে সাংঘাতিকভাবে।

নদীতে ওই কামটের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায়, বড় মাঝারি সাইজের মাছের মতই দেখতে, ওদের কয়েক পাটি তীক্ষ্ম দাঁত আছে, স্বভাবতই মাংসাশী ওরা।

ধারাল দাঁত দিয়ে জলের মধ্যে মানুষের দেহ থেকে মাংস কুরে কুরে তুলে নেয়, তখন কেউ টের পায় না, রক্তে জল লাল হতে তখন টের পায়।

কিন্তু তখন আর করার কিছুই নাই। চীৎকার আর্তনাদে লোকজন এসে তোলে, নগাও ছুটে আসে, দেখে যন্ত্রনায় ছটফট করছে মা, পায়ের দাবনা থেকে মাংস হাড় অবধি চেঁছে তুলেছে।

রতনবাবুর সরকার নন্দও আসে।

রাজাও এসে দেখে ওই নদীতে আর যারা মীন ধরছিল তারাও কাদামাখা ভিজে কাপড়েই জাল গুটিয়ে ডাঙ্গায় উঠেছে।

ওদের মধ্যে রাজা তার মা আর কলিকে কাদা মেখে জাল হাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দেখে চমকে ওঠে।

নগা তখন কাঁদছে, ওর বাবা নাই, আগেই রতন নস্করের বাদাবনের নৌকায় কাঠ কাটতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে, মা টাও আজ মরছে কামটের কামড়ে।

কারা একটা নৌকায় তুলে ওকে গোসাবার হাসপাতালে নিয়ে গেল, কয়েক ঘণ্টার পথ, যা রক্ত ঝরছে তাতে কি হবে ওর দশা কে জানে।

নগার কান্না দেখে রাজারও চোখে জল আসে। দেখছে তার মা বোনকেও, একমুঠো অন্নের জন্য ওরা প্রাণটাকে বাজী রেখে গাং-এ নামে, তাতেও বাঁচার পথ পায় না।

রাজা বলে—মা, তুমিও গাং-এ নেমেছো ওই কলিকে নিয়ে? যদি কিছু হয়ে যেতো।

সাবিত্রী বলে—আর নামবো না রে! চল বাবা—ঘরে চল।

রাজা ওদের নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। গোলাবীও এসে জুটেছে গাং-এর ধারে।

অনেকের মীন সে এখানের মহাজনের আড়তে বিক্রী করিয়ে দেয়। আড়তদার অবশ্য তাকে কিছু দেয়, সেটা আড়তদারের নিজের স্বার্থেই।

সাবিত্রীকে গোলাবী বলে—তোমার মীন বেচে টাকা নে যাচ্ছি, তুমি ঘরে যাও কাকী।

রাজা ইতিহাসের বই পড়ছে, কেদারবাবুর কাছেও শুনেছে ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই বাদাবন কি ভারতের বাইরে? তার মনে হয় স্বাধীন দেশের মানুষদের সামান্য যা প্রাপ্য তার কিছুমাত্র এখানে নেই।

মানুষের বাঁচারই কোন আশ্বাস যেখানে নেই সে দেশের স্বাধীনসত্ত্বার কি দাম তা বুঝতে পারে না রাজা।

সে সব বুঝতে পারে রতন নস্করের মত লোক, সরকার তাদের জন্যই সব ব্যবস্থা রেখেছে, সেগুলো ঠিকমত বের করে নিতে জানলে সব সুবিধাই মেলে।

বিনা মূলধনে লাখ লাখ টাকা লাভ করা যায়। তার জন্য টাকা যোগাবে ব্যাঙ্ক। আর কোন মন্ত্র বলে তা সম্ভব হয় সেটা জানে একালের রতনের দল। সে সামর্থও তাদের আছে। তাই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব এখানে নিজে আসে, তাকে আপ্যায়ন করে রতন তার সাজানো বাগানবাড়িতে।

এই আবাদের মধ্যে অনেক যত্ন করে রতন খর্চা করে বিরাট বাগান করেছে ওদিকে, নানা গাছ গাছলি, ফুল গাছ দিয়ে সাজিয়েছে বাড়িটাকে, সেখানে বিশেষ অতিথিদের নানাবিধ আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের জন্য খাঁটি স্কচ হুইস্কি, বিলাতী সিগ্রেট, চিকেন, ফিস ফ্রাই এসবের ব্যবস্থাও থাকে।

সাহেব বলে—ব্যাঙ্ক আপনাকে চিংড়ি ভেড়ির জন্য সাত লাখ টাকা লোন দিচ্ছে, কিন্তু মার্চ মাসের মধ্যেই টাকা না নিলে ওই স্যাংশন বাতিল হয়ে যাবে। আমিও বদলি হয়ে যাবো, তখন আবার লোন নিয়ে ঝামেলা হবে, ওটা তুলে নিয়ে ভেড়ির কাজ শুরু করুন।

রতন জানে তাড়াতাড়ি বীজ পুতলে তাড়াতাড়ি ফল আসবে, তাই সেও চায় তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হোক।

অন্যসব জমির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, ভেড়ি বাঁধের কাজও শুরু হয়েছে, আসল কাজ আটকে আছে ওই মথুরের জমিগুলোর জন্যে।

মথুরও নাই, এবার রতনবাবুও ভাবছে এই উপযুক্ত সময়, ওই জমির দখল নিতেই হবে, নাহলে এত বড় ভেড়ির প্রকল্পই বরবাদ হয়ে যাবে তার।

সাবিত্রী সেদিন সকালে বাড়িতে গরুকে জাব দিচ্ছে, রাজা পড়তে চলে গেছে, এমন সময় রতন নস্কর আর নন্দ সরকারকে দেখে চাইল।

ওদিকে দাওয়ায় মথুরের বসার মোড়াটা রাখা ছিল, লোকটা নাই, তার ওই চিহ্নটা যত্ন করে রেখেছে সাবিত্রী। নন্দ সরকার আর কিছু না পেয়ে ওই মোড়াটা টেনে এনে মালিককে খাতির করে বসায়। রতন চাবিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে, দেখেছে সারা সংসারে অভাবের ছবিটা পরিস্ফুট। সাবিত্রীর পরণের শাড়িটা ছেঁড়া, মুখে কষ্টের ছায়া, আগেও এসেছে এখানে রতন, সেদিন এই সংসারে যে শ্রী-স্বাচ্ছন্দ্য দেখেছিল আজ তা নেই সেটা ভালো করেই বুঝেছে।

রতন বলে—মথুর আধবেলায় বাঘের থাবায় গেল ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুবই বিপদে পড়েছ দেখছি মথুরের বৌ। ওদের তো মানুষ করতে হবে, আর ওই জমি জমাইবা কে দেখবে? বরং হাজার পাঁচেক টাকা রাখো—

একটা আস্ত পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলই বের করে, ব্যাঙ্কের কড়কড়ে নোট. সাবিত্রী দেখছে টাকাটা।

মনে পড়ে মথুরের কথা। ওই জমি সে দিতে চায়নি, আজও সাবিত্রী স্বপ্ন দেখে আবার সোনা ধানে মাঠ ভরে গেছে, বড় হয়েছে রাজা। ওই জমি স্বামীর বুকের পাঁজর। তাকে হাতছাড়া করবে না সাবিত্রী, রতন বলে

—কি হলো, নাও টাকাটা!

সাবিত্রী বলে—না। টাকা লিব নাই।

রতন জানে সূচ হয়ে ঢুকে কিভাবে ফাল হয়ে বের হতে হয়। সে একবার টাকাটা দিয়ে কাগজে টিপছাপ নিতে পারলেই বাকী সব কাজ নিরাপদেই সেরে ফেলবে। এইভাবেই সে বহুজনের জমি জারাত দখল করেছে,

রতন বলে—আর জমির জন্য ও টাকা দিচ্ছি না।

—তবে? সাবিত্রীর সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে ওঠে, রতনের বদমতলবের অনেক কথাই শুনেছে সে। আবার এখানে কি মতলবে এসেছে কে জানে,

রতন বলে—কৃষিঋণ বাবদ টাকাটা দিচ্ছি, জমিতে চাষ তো করাতে হবে মথুরের বৌ। চাষের খর্চা আছে তো, তাই দিচ্ছি পঞ্চায়েৎ থেকে এই টাকা, ধান উঠলে শোধ করে দেবে। টাকাটা কৃষি ঋণ বাবদ পেলে এটা সেই কাগজ, সরকারী টাকা তো—তাই হিসাব রাখতে হবে। এই কাগজে টিপছাপ দিয়ে দাও।

সাবিত্রী এবার ভাবছে কথাটা। টাকা পেলে রাজা চাষই করবে তার জন্য মহেশও এসব করে দেবে, নিজের পুকুরের জলও পাবে, বোরো ধান ফলেও ভালো।

সাবিত্রী টাকাটা নেবে কিনা ভাবছে, রতন কাগজটা এগিয়ে দেয় ওর দিকে—নন্দ, দেখিয়ে দে কোথায় টিপ ছাপ দেবে।

এমন সময় স্কুল থেকে ফেরে রাজা। রতন দেখছে ওকে। রাজাই শুধোয়—ও কিসের কাগজ মা? সাবিত্রী বলে—কৃষি ঋণ এর কাগজ।

—দেখি! রাজা কাগজটা নিয়ে দেখে কৃষি ঋণের ফর্মই নয়, একটা সাদা স্ট্যাম্প পেপার, কিছুই লেখা নেই তাতে। সাবিত্রীর টিপ ছাপটা এই ফাঁকে ওই কাগজে নিয়ে বাকী সব ওই রতনই ভর্তি করে নিত। ও জানে রাজা এখন স্কুলে, তাই সময় বুঝেই এসেছিল রতন, কিন্তু স্কুলের আজ হাফ ছুটি হয়ে গেছে কি কারণে—তাই অসময়েই ফিরে এসেছে রাজা।

রাজা কাগজখানা দেখে বলে—একি! এতো লোন ফরম্ নয়, ওসব তো দেখেছি। মা এতো দলিলের কাগজ, সাদা দলিলের কাগজে সই করো না মা।

রতন বলে—এ ইয়ে নতুন ফর্ম। তুই কি জানিস রে ছোঁড়া?

সাবিত্রী কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে বলে—ওসবে সই করবো না টাকাও নোব না বাবু।

—শোনো। রতন তবু ওকে কি বোঝাতে চায়।

কিন্তু রাজাই বলে—সব শুনেছি, আমাদের জমি বাবাও দেয়নি, তাই তাকে মরতে হয়েছে, ওই জমি দেব না, আপনি যান।

সাবিত্রী বলে—যান, এত সাহায্যে দরকার নাই।

রতন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে, রাগলেও তার বহিঃপ্রকাশ সাধারণতঃ করে না। সে, বেশ বুঝেছে এই জমি এরা দেবে না। তবু বলে রতনবাবু,

—পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে একটা কর্তব্য করতে এসেছিলাম মথুরের বউ, তা তোমরা ভুলই বুঝলে। তোমাদের ভোটে আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি, তাই তোমাদের জন্য ভাবি, ভালো করার চেষ্টা করি। কথাটা বুঝলে না। চল নন্দ।

রতন টাকা কাগজপত্র পকেটে পুরে বের হয়ে যায়। বাইরে কপিল রেডি ছিল, ছাতা নিয়ে, মালিকের মাথায় ছাতা ধরে ওরা শোভাযাত্রা করে ফিরে যায়।

রাজা বলে—ওই রতনবাবুর মতলব ভালো নয় মা। সাবিত্রীও তা বুঝেছে, বলে সে—ওই জমি প্রাণ থাকতে দেব না রে, যেভাবেই হোক দিন চালাবোই।

রতনও বুঝেছে ওই জমি মথুরের বৌ আর দেবে না তাকে, ওই রাজা এসেই বিপদ করলো, নাহলে প্রায় কাজ উদ্ধার করে এনেছিল রতনবাবু।

এদিকে ভেড়ির অন্যদিকের বাঁধ সব হয়ে গেছে, বেশ কয়েক হাজার টাকা চলে গেছে। ভেড়ি চালু করার চার, পাঁচ মাসের মাথা থেকেই বাগদা বিক্রী করে রোজ বেশ কয়েক হাজার টাকাই আসবে তার। ওদিকে ব্যাঙ্কের লোন পুরো সাত লাখ থেকে নিদেন চার লাখ টাকা সরিয়ে অন্য ব্যবসাতে লাগালে তার থেকেও মোটা মুনাফা আসবে।

ওই মেয়েটার জন্য—ওই পরিবারের জন্যই তার এত লাখ টাকার আমদানী বন্ধ হয়ে আছে, রতন ভাবছে, ওই সাবিত্রীকে একরাতে জোর করে তুলে এনে ওর টিপছাপই নেবে আর গড়বড় করলে খতম করে গুমই করে দেবে ওর লাশটা।

বাদাবনে তার উপর কথা বলার কেউ নেই।

দারোগা ভূতনাথবাবুকেও সে মোটা টাকা মাসোহারা দেয়। এসব ব্যাপার নিয়ে আর কোন কথাই উঠবে না। কাগজপত্র তৈরী হবে আগের তারিখে অর্থাৎ সাবিত্রী দেবী আগেই টাকা নিয়ে ওই জমি দিয়েছে রতনবাবুকে এটাই জানবে সবাই।

হাটবারে শ্যামপুরঞ্জের চেহারাটাই বদলে যায়। সারা এলাকার মধ্যে এইটাই বড় হাট, সেদিন হাটতলা, সারা গাং মায় ওদিকের মাঠ অবধি মানুষের ভিড়ে ভরে যায়।

হাটতলায় এখানে কয়েকটা বাঁধা দোকান আছে, ওদিকে হারু পালের কাপড়, এপাশে হরেন দলুই এর মনোহারী কাম মুদিখানার দোকান, ওখানে টুকটাক ওষুধ মায় খাম পোস্টকার্ডও মেলে।

ওপাশে চরণ ডাক্তারের চেম্বার।

নড়বড়ে চেয়ারে বসে ডাক্তার হাটবারের দিন চুটিয়ে, লাল ওষুধ আর হরেকরকম বড়িও বেঁচে। ইনজেকশন দেয় পটাপট আর পকেটে টাকা পোরে।

পয়সা ছাড়া কথা বলে না, লোকে বলে

—পাশ না করেই এই! পাশ করলে চরণ ডাক্তার যে কি করতো কে জানে?

গোলাবী সেদিন খুব ব্যস্ত, মাছের বাজারেও সেদিন গোলাবী ভালো আমদানী করে, তার সতেজ কণ্ঠস্বর, আর সোচ্চার যৌবন শ্যামপুরগঞ্জের হাটতলার অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু।

রতনবাবুও সেদিন ব্যস্ত, তার বাহন নন্দ সরকার এর দলবলও তৈরী। এই হাটতলার পত্তন করেছিল রতনবাবুর পিতৃদেব ঈশ্বর যুধিষ্ঠির নস্কর।

তখন এত জমজমাট ছিল না এ হাট, দুচারজন ব্যাপারী নৌকায় চলমান দোকান নিয়ে আসতো। দিন বেলাবেলি কেনাবেচাও শেষ করে নৌকায় দোকান তুলে

দোকানীরা ভাসমান দোকান নিয়ে চলে যেতো পরের দিন আবাদের অন্য কোন হাটে। ভেসে ভেসেই তাদের দিনের পর দিন কাটে এ হাট ও হাট ঘুরে।

এখন শ্যামপুরগঞ্জে লোকজন বেড়েছে, তিন গাং-এর মোড়, বনে ঢোকার মুখে কাঠমহাজনদের বিরাট নৌকাগুলো থামে, বনের পারমিট নেয়, খাবার জল তোলে বড় বড় জালায় আর রসদপত্র তুলে নেয় এই হাটে। তাই শ্যামপুরগঞ্জের হাট জমে উঠেছে, আর হাটতলায় যত দোকানী ফড়ে আসে, তাদের কাছ থেকে তোলা আদায় করে নন্দ সরকার তার দলবল নিয়ে।

জমিদারী চলে গেছে, তবু রতন নস্কর সপ্তাহে দু'দিনের জন্য এখানে জমিদার হয়ে বসে। আয়পয়ও মন্দ হয় না। গোলাবী মাছ বেচছে, সরকারের বাহন তেলিয়া এসে বলে—তোর তোলা?

গোলাবী বলে—তোর সরকারকে বলগে পরে দোব।

তেলিয়া ধমকায়—পরে কেন রে? এখুনিই দে, নাহলে গায়ে গায়েই তুলে নিতে হবে।

গোলাবী মাছ কাটছিল, এবার ওই কথায় শাড়িটা গাছকোমর করে ধারালো বটিটা তুলেই গর্জে ওঠে।

—আয়! দেখি ক্যামন বাপের বেটা। গোলাবীকে চিনিস না? তোর ধড় মুণ্ডু আলাদা করে রেখে দোব।

একেবারে উদ্যত বটি নিয়েই তাড়া করে, তেলিয়াও ভাবতে পারেনি যে এমনি কাণ্ড বাঁধাবে মেয়েটা। হাটে হৈ চৈ পড়ে যায়, তেলিয়াও কেটে পড়ে।

গোলাপী তখনও ফুঁসছে—তোর বাপের হাট! আয় কে তোলা নিবি! ওদের জুলুম অত্যাচার ক্রমশঃ সীমা ছাড়িয়েছে, তেলিয়ার দল জোর করে ফড়ে—ব্যাপারীদের মাল কেড়ে নেয়, সাধারণ চাষীদের ঝুড়িও আটকায়। যার কাছে যা পায় তাই আদায় করে।

এর থেকে কিছু দেয় রতনবাবুকে আর বাকীটা তারাই গ্রাস করে। এই করে একটা দলের সাহস বেড়েই গেছে। অথচ এই হাটের সব এখন সরকারের জায়গা। কথাটা অনেকেই জানে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। আজ গোলাবীকে ওইভাবে কথা বলার পর গোলাবীই ক্ষেপে ওঠে। এর মধ্যে বাজারের অনেকেই জুটেছে, বহু ব্যাপারী, আনাজওয়ালারাও বলে—ঠিক করেছে গোলাবী।

গোলাবী বলে—কেউ তোলা দিবি না, আসুক মুখপোড়ার দল কেটে গাং-এ ফেলবো।

হাটে ক্রমশঃ ওদের দলই ভারি হয়ে ওঠে।

অনেকেই গর্জায়—মার শালাদের, গা জোয়ারি করে তোলা তুলবে? কেউ এগিয়ে আসে—কেনে দিব? দিব নাই, ই সরকারের জায়গা।

অনেকেই খুঁজছে ওই দলকে, সাধারণ মানুষ আজ ক্ষেপে ওঠে।

নন্দ সরকার চতুর সাবধানী লোক, সেও হাটের ওই মারমুখী জনতাকে দেখে বুঝেছে এখন এখানে থাকা নিরাপদ নয়, তাই তাক বুঝে খাতাপত্র গুটিয়ে সেও হাওয়া হয়ে গেছে। এসে হাজির হয়েছে রতনবাবুর গদি ঘরে।

রতনবাবুও হাটে বের হবার জোড়তোড় করছিল, তারও কানে আসে হাটতলার জনতার গর্জন, আর হন্তদন্ত হয়ে নন্দকে খাতাপত্র সমেত ঢুকতে দেখে চাইল,

—কি ব্যাপার?

নন্দ সুসংবাদটা দিতেই রতন চমকে ওঠে। সেও জানে ওই হাটের জায়গায় আইনতঃ তার কোন অধিকার নেই, তবুও সে এতকাল ধরে হাটের মালিক সেজেই বসেছিল, ভালো আমদানীও হতো, আজ এককথায় সেই এতদিনের আমদানী বন্ধ হতে দেবে না সে।

রতন বলে—চল থানায়, রিপোর্ট করতে হবে।

তারপরই কি ভেবে টেবিলের উপর থেকে খাতায় দাগটানার মোটা রুলটা টেনে নিয়ে সপাটে সপাটে নন্দের কপালেই একটা ঘা মারে, আর সেই আঘাতে নন্দরই কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে।

আর্তনাদ করে নন্দ—আমি কিছুই করিনি. এভাবে মারলেন!

রতন বলে—চুপ কর! নে শ দুয়েক টাকা।

টাকাটা নন্দ পকেটে পুরে রক্ত মুছবার চেষ্টা করে, পেটে খেলে পিঠে সয়, এক ঘা খেয়ে দুশোটাকা আমদানী হয়েছে তার, অখুশী হয়নি সে।

রতনবাবু বলে—উহুঁ রক্তের দাগ মুছিস না, চল থানায়।

—থানায়! নন্দও অবাক হয়—থানায় যেতে হবে কেন?

রতন এর মধ্যে ভেবে নিয়েছে, হারু পাল ব্যাপারী মহেশ বেরা, ফড়েদের নেতা ছিরু ঘোষই তাকে মাঝে মাঝে কথাটা শোনায়। রতনের দখলে ওরা বাধা দেয়। আজ তাদেরই হাতে পেয়েছে।

রতন বলে—থানায় গে বলতে হবে ওই হারুপাল-মহেশ-ছিরু লোকজন নে তোকে মেরেছে, খুনই করতো—

নন্দ বলে—ওরা কেন? গোলাবীই বটি নে এসেছিল, কুপিয়েই দিত।

থাম! মেয়েছেলের নামে ফৌজদারী টিকবে না, যা বলছি তাই বলবি থানায়, চল।

ভূতনাথ দারোগা বাদাবনে বদলি হয়ে প্রথমে খুবই হতাশ হয়েছিল। আগে

শহরের দিকেই ছিল, সেখানে মাত্রাহীনভাবে চাপ দিয়ে নানাভাবে অর্থাগমের পথ করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে, চাকরীই যেতো—কোনরকমে বেঁচে গেছে চাকরীটা, আর শাস্তি হিসাবে এই বনবাসেই বদলি করা হয়েছিল।

কিন্তু ভূতনাথ এখানে এসেও একটা ভালো পথই বের করেছে, আর বাদাবনে কর্তাদের আনাগোনা—নজরদারি নেই, তাই এখানেই মুকুটহীন রাজা হয়ে বসেছে।

রতনবাবুর নানাবিধ ব্যবসা, বনের কাঠ চুরি—রাতের অন্ধকারে বর্ডার পার হয়ে জলপথে নানা বিদেশী মালও আসে, তাছাড়া এখানের বাঁধের বড় বড় ঠিকাদাররাও তাকে রাজমান্য দেয়, রতনবাবু তো অনেক দেন, তাই ভূতনাথ দারোগা বহাল তবিয়তেই বিরাজ করছে এখানে।

হাটে এমন গোলমাল, অশান্তি মাঝে মাঝে মারপিট হয় আবার থেমে যায়। তাই আজকের ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয়নি ভূতনাথ।

বরং সিপাইকে পাঠিয়েছে হাটে গল্‌দা চিংড়ি-ভালো ভেটকি-ডিমভরা পারসে আর তাজা সবজী যদি পায় আনবে, এমন সময় রতনবাবুকে আহত নন্দকে নিয়ে আসতে দেখে চাইল।

—কি ব্যাপার? ভূতনাথ দারোগা শুধোয়।

নন্দ জবাব দেবার আগেই রতনবাবুই বলে,

—হাটতলায় গেছল নন্দ, ওই হীরু পাল, ছিরু, মহেশরা কেমন মেরেছে দেখুন, ওদের নামে একটা কড়া করে ডাইরী লিখে নিন স্যার, কই রে নন্দ, বল স্যারকে কি হয়েছিল?

নন্দ এবার গড়গড় করে শেখানো বুলিগুলো আওড়ে যায়।

ভূতনাথ বলে—ঠিক আছে, লিখে নাও হে মেজবাবু, ব্যাটাদের এত বড় সাহস, প্রকাশ্য হাটতলায় এইসব করে? আমার এলাকায় কোন অশান্তি সহ্য করবো না, ডাকাও ওদের আজই।

রতনবাবু এই ফাঁকে ব্যাগ থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে দেয়।

ভূতনাথবাবু জানেন ওতে আছে কয়েক প্যাকেট বিলাতী সিগ্রেট, ওটা ড্রয়ারে রাখে ভূতনাথ। রতনবাবু বলে,

—বিলাতী ইয়ে ও হাতে পেলেই আনবো স্যার।

ইয়ের মাপটাও দেখিয়ে দেয়, রতনবাবু স্যারকে মাঝে মাঝে স্কচ, অর্থাৎ খাস স্কটল্যান্ডের তৈরী বিলাতী রঙীন পানীয়ও উপহার দেয়।

ভূতনাথ বলে—দেখুন কবে পান!

রতন ওই মহেশদের দাবিয়ে রাখতে চায় ফৌজদারী মামলার চাপে যাতে তারা ওই নিয়েই ব্যস্ত থাকে। আর রতন ভাবছে নিজের কথা, চিংড়ির ভেড়ি তাকে করতেই হবে, টাকার নেশা রতনকে মাতাল করে তুলেছে, তাই যেভাবে হোক ওই মথুরের জমি তাকে পেতেই হবে।

মানুষ আইন ভাঙ্গার সাহস একবার পেয়ে গেলে সে সাহসী হয়ে ওঠে, আর যখন জানতে পারে তাকে বাধা দেবার কেউ নাই, সব অন্যায়কে সে টাকার জোরে চাপা দিতে পারবে তখন সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

রতনও তাই হয়েছে, জেনেছে সভ্যতার সীমান্ত এই বাদাবনে তাকে বাধা দেবার মত তেমন কেউ নাই, তাই এবার রতন মরীয়া হয়ে চরম পন্থাই নিয়েছে।

মথুরের বাড়িটা বসতির এই বাইরে নদীর বাঁধের এদিকেই, মথুরের বাড়ি—ক্ষেতখামারও ওখানে, রাতের বেলায় নির্জন, নদীর ওপারেই শুরু হয়েছে সুন্দরবনের সীমানা। মানুষজন এদিকে বড় একটা আসে না।

সাবিত্রী সন্ধ্যার পর এই নির্জনে কলি আর রাজাকে নিয়ে থাকে, হারানো সেই দিনগুলোর কত স্মৃতি মনে পড়ে তার।

রাজা তখন ছোট, দিনরাত গুলতি হাতে ক্ষেতের আশপাশে ঘুরতো। ছোট কলিও থাকতো তার সঙ্গে, ক্ষেতে এসেছে সোনা ধানের মঞ্জরী, সবুজ ধান গাছে সোনা হলুদের আভা, মঞ্জরীভারে ধানগুলো নুইয়ে পড়ে।

এই সময় বন থেকে টিয়ার দল এসে মাঠে নামে, ওদের ধারালো লাল ঠোঁটের ঘায়ে ধানগুলো মঞ্জরী থেকে খসে পড়ে, যত না খায় তার থেকে বেশী নষ্ট করে মাঠময় দাপিয়ে বেড়ায়, কষ্টের ফসল বরবাদ করে।

রাজাই বুদ্ধিটা বের করে, হাটতলা থেকে দু টুকরো রবার জোগাড় করে গরাণ ডালের তেকাঠায় সেই দুটো বেঁধে গুলতি বানায় আর পলিকাদার ছোট ছোট গুলি বানিয়ে রোদে শুকিয়ে নেয়।

কলিও হাত লাগায়, শুধোয়

—এইগুলি দিয়ে কি হবে রে দাদা?

রাজা বলে—দেখবি ক্যামন করে পাখীগুলোকে তাড়াই, এদিয়ে দুষ্টের দমন হবে।

সেই গুলতি ছুড়েই রাজা পাখী তাড়াতো, দুরন্তপনা তারও কম ছিল না, রাজা নগা পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে গাং-এ নৌকা নিয়ে বের হতো।

সাবিত্রী বলতো—বড় গাং-এ যাস নে!

মথুর বলতো—যেতে দাও রাজার মা। গাং-এর দেশে বাস করবে গাং-এ যাবে না তা কি হয়!

গোলাবীও দেখতো ওই ছেলের দলকে, সবাই তার চেনা। ছোটবেলায় গোলাবীর জীবনে অতীতে কবে বিয়ে হয়েছিল, সে সব অনেকদিন আগেকার ঘটনা, লোকটার মুখও সঠিক তার মনে পড়ে না। প্রথম স্বামী এই মুলুক ছেড়ে নাকি শহরে কোথায় পালিয়েছিল, সে সব চুকে বুকে গেছে। তারপর তার জীবনে এসেছিল কুড়োন, গোলাবী কুড়োনকে ভালোবেসে ঘর বাঁধে।

তবু ওই নগার দল মাঝে মাঝে ছড়া কাটে, গোলাবী ধমকায় তাদের।

সেদিন হাটের পর গোলাবী ফিরছে বাড়ির দিকে, বাড়িতে তার বুড়ি মা—দাদা ভাজবৌ সবই আছে, গোলাবী অবশ্য কারো বোঝা নয়, কুড়োন মারা যাবার পর সে একাই।

ওর রূপ যৌবনও যেমন ধারালো, জিবটাও তার থেকে বেশী ধারালো, মুখের উপর যাকে তাকে যা তা বলতে তার এতটুকু বাধে না, ভয় ডরও তার নাই।

ভূতনাথ দারোগা-মায় রতনবাবুও তার উপর নজর আছে, গোলাবীও তা জানে।

গোলাবী থাকে বাড়ির ওদিকের মাঠে; সেখানে নিজেরই একটা ঝুপড়ি তুলেছে। সংসারের কচকচানি তার পছন্দ নয়, বুড়ি মা-বৌ এর মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া বাধে, আর সেই ভাষাগুলোও আলাদা। এ ওর চৌদ্দ পুরুষের কেচ্ছাকাহিনী নিয়ে গগন ফাটায়, শেষে চুলোচুলিও হয়।

আবার দুপক্ষই মারধোর করে ক্লান্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়, তবু ওদের মুখ থামে না।

গোলাবী তখন হাটে, বাড়ি ফিরে বলে

—মা, তোদের ওই কাক চিল তাড়ানো ঝগড়া আর সইতে পারি না বাপু, আমি ওইখানেই কুঁড়ে করে বেলগ থাকবো।

সেই থেকে গোলাবী ওখানেই থাকে, অবশ্য মাকে কিছু পয়সা দেয়, ভাজবৌ রাগে ফোঁসে, বলে ওর স্বামীকে—তোমার বুন আলাদা থাকবে না কেনে? ইখানে কি অসুবিধা হয় গো? রাতভোর রাসলীলে চলবে কি করে?

গোলাবী দেখেছে রাতের অন্ধকারে রতনবাবুকেও এদিকে ঘুর ঘুর করতে।

রতনবাবু বলে—ইদিকে যাচ্ছিলাম।

গোলাবী বলে—রাত বিরেতে বেরিয়োনা রতনবাবু, বাদাবনের বাঘও ঘোরে ইদিকে, তবে তুমার ভয় নাই।

—কেন? রতনবাবু শুধোয়,

গোলাবী বলে—ফেউকে বাঘ কখনও মারে না, তুমি সেই ফেউ, তোমাকে দেখলেই বাঘের কথাই মনে পড়ে গা, যাও—বাড়ি যাও।

রতন বলে—একদিন বাগানে আয়!

গোলাবী জানে বাগানে কি হয়, এলাকার অনেক মেয়েকেই রতনের লোকজন ওর বাগানে নিয়ে যায়।

গোলাবী বলে—কেনে? সিখানে কি মেয়েছেলের অভাব হল বাবু? বেশ তো আছো।

গোলাবী পাত্তাই দেয় না, রাতের অন্ধকারে রতনবাবুর এখন অন্য মূর্তি। আবার দেখেছে দৌদণ্ডপ্রতাপশালী দারোগা ভূতনাথবাবুকেও রাতের অন্ধকারে, সে এদিকে আসে।

গোলাবী বলে—রাত দুপুরে ইদিকে?

ভূতনাথ বলে—ইয়ে চোর ডাকাত ধরার কাজে ঘুরতে হয়। গোলাবী সারা দেহ যৌবনের জোয়ার তুলে শুধোয়,

—তা ইখানে ধরতে না ধরা দিতে এসেছেন গো?

ভূতনাথ গদগদ কণ্ঠে বলে—তাহলে বুঝেছিস কেসটা! তুই শুধু সুন্দরীই নোস—বেশ বুদ্ধিমতীও।

গোলাবী বলে—আপনাদের কাছ থেকেই তো ইসব শিখেছি গো, যাই!

গোলাবী চলে আসে ঘরে, ভূতনাথবাবু হতাশই হয়, গোলাবী এই জীবনের গোলকধাঁধায় সাবধানে পা ফেলে চলেছে। সেদিন হাট থেকে ফিরছে, মাছ বেচা তো নয়—গলা ফেড়ে মাছের গুণাগুণ বর্ণনা করে চীৎকারও করতে হয়। আর গলাবাজি, ছলাকলা দেখিয়ে সে লোক বিশেষে পচা মাছও গছায় আর খদ্দেরের চোখ তখন ওর আধ আদুড় গা গতরের দিকেই নিবদ্ধ থাকে ফলে গোলাবী আধকিলোতে তখন পাল্লার কারসাজিতে নিদেন দেড়শ গ্রাম করে মাছ কমিয়ে দেয়, খদ্দের টেরও পায় না। নানা হ্যাপা সামলে মাছ বেঁচে ফিরছে গোলাবী। খিদেও পায়, হাটের মুড়ির দোকান থেকে ছোলাভাজা মুড়ি কিনে খেতে খেতে আসছে হঠাৎ ছেলের দলের ছড়া শুনে থমকে দাঁড়ায় গোলাবী, ওরা ছড়া কাটছে

—গোলাবীদি একলা খেয়ো না,
জানলা দিয়ে বর পালাবে
দেখতে পাবে না।

ওই ক'টা লাইন তার মনে কি জ্বালা আনে, গোলাবী সেদিন ছিল ছোট, তার প্রথম বর ছোঁড়াটা কোথাও পালিয়ে গেছল তখনই। আজও সেটা গোলাবীর মনে কি বিরক্তি, ব্যর্থতার জ্বালা হয়ে ফুটে ওঠে।

গোলাবী চটে ওঠে—এ্যাই নগা! রাজা! দাঁড়া তোদের বাড়িতে বলছি, ছেলেগুলোও গোলাবীকে তাতিয়ে দিয়েই সরে পড়ে,

গোলাবী আপনমনে কিছুক্ষণ বকে শান্ত হয়, আবার সব ভুলে যায়।

গোলাবী নিজের নিঃস্বতা দিয়ে অপরের নিঃস্বতাকে বুঝতে চেষ্টা করে। তাই আসে সাবিত্রীর বাড়িতেও। আজ মথুর নাই, সাবিত্রীকে একা সংসার চালাতে হয়। গোলাবীই বলে—মাঠের আনাজপত্র সব তুলে রাখো, আমিই হাটের ফড়েদের ইখান থেকে পয়সা দে মাল নে যেতে বলবো।

সাবিত্রী হাটে নিজে মাল বিক্রী করতে পারে না, ওই গোলাবীই তার চেনা লোকদের দিয়ে বাড়ি থেকেই আনাজপত্র কিনিয়ে নিয়ে যায়।

সাবিত্রী ওই গোলাবীর কাছে কৃতজ্ঞ।

গোলাবী রাজাকেও ভালোবাসে, রাজার ভয় হয় গোলাবীদি যদি মাকে ওই সব ছড়ার কথা বলে, মা তাকেই বকবে। কিন্তু রাজা নিশ্চিন্ত হয় গোলাবী দিদি ওসব কথা মাকে বলে না। বরং গোলাবীই বলে

—এবারও তোকে 'ফাস্' হতে হবে কেমন, মেডেল পেতে হবে।

রাজা গতবারেও ফাস্ট হয়েছিল স্কুলে।

শ্যামপুরগঞ্জের স্কুল অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তখন হাইস্কুল হয়নি, রতনের বাবা যুধিষ্ঠির আর তখনকার জমিদার শ্যামবাবুর চেষ্টাতেই মাইনর ইস্কুল হয়েছিল জমিদারের জায়গায়।

পরে কিভাবে জমিদারের নাম মুছে গিয়ে সেখানে কায়েম হয় যুধিষ্ঠিরের নাম। আর পরে যুধিষ্ঠিরবাবুই কেদারবাবুকে আনেন, তরুণ কেদারবাবুর চেষ্টাতেই সেই মাইনর স্কুল এখন হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে।

গড়ে উঠেছে স্কুলের বিল্ডিং। কেদারবাবু সদর-কলকাতায় দৌড় ঝাঁপ করে নানাজনকে ধরে এই অবহেলিত আবাদ অঞ্চলে এই স্কুলকে গড়ে তোলেন।

অবশ্য কমিটিতে যথারীতি পৈত্রিক অধিকার বলেই রতনবাবুই প্রেসিডেন্ট

রয়েছে। রতন নিজে বার তিনেক মাইনর ইস্কুলে এক ক্লাশ গড়াগড়ি দিয়ে মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এখন লক্ষ্মীর আরাধনায় ব্রতী। তবু স্কুলের প্রাইজ বিতরণী সভায় সভা আলো করে বসে। একধারে স্কুলে প্রেসিডেন্ট, পঞ্চায়েতের প্রায় স্থায়ী প্রধান, বিরাট ব্যবসায়ী, তাই এই সভা আলো করার দাবী তার আছে।

সেবার রাজা শুধু মেডেলই পায়নি, একশ টাকা পুরস্কারও পেয়েছে, মথুর তখন বেঁচে।

বাড়িতে মথুর কাজ করছে, রাজা ঢোকে—গলায় লাল ফিতেয় ঝোলানো মেডেলটা। মা এগিয়ে আসে।

মথুর বলে—দ্যাখো, বলিনি ছেলে একদিন লায়েক হবে, আজ ক্যামন মেডেল পেয়েছে দ্যাখো। কেলাসে ফাস্টো হয়েছে আমার রাজা!

সাবিত্রীর চোখে জল আসে।

তাদের স্বপ্ন একদিন সত্যি হবে, রাজা মেডেল পেয়েছে।

কলি বলে—ম্যা দ্যাখ ক্যামন সোন্দর মেডেল। রাজা পকেট থেকে একটা হার বের করে, চকচকে রূপোর মত হার একটা সুন্দর লকেট, ঠাকুরের ছবি ঝুলছে।

রাজা বলে—আর বৃত্তির টাকায় হারু পালের দোকান থেকে তোর জন্য এই হারটা এনেছি কলি, নে।

কলি খুশীতে ডগমগ হয়ে হারটা পরে মাকে দেখায়।

—দ্যাখো মা, দাদা ক্যামন সুন্দর হার দিয়েছে,

রাজা বলে—এখন এটা পর, পারলে একদিন তোকে সোনার হারই গড়িয়ে দোব।

কলি বলে—এইটাই সোন্দর রে দাদা,

কলির কাছে এই টুকুই অনেক পাওয়া, এতেই খুশী সে।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সাবিত্রীর, মথুরও অকালে চলে গেল, তবু সাবিত্রী তার স্বপ্নকে সত্যি করবেই, রাজাকে সে মানুষ করবে।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে এদিকের চেহারাই বদলে যায়, নদীর ওপারে অরণভূমি যেন জেগে ওঠে, গাং-এ জোয়ারের মত্ত গর্জন। হরিণের ডাক ভেসে আসে মাঝে মাঝে।

এদিকে নামে স্তব্ধতা, রাজা সন্ধ্যাবেলায় পড়তে যায় কেদারবাবুর ওখানে, মাস্টারমশায় রাজাকে খুব ভালোবাসেন। ওখানে পড়ে বাড়ি ফেরে রাজা, তখন রাত নামে।

সাবিত্রী দূর থেকেই যেন ওর পায়ের শব্দ পায়, কান পেতে থাকে সে।

—কি রে রাজা, ফিরলি বাবা?

রাজা বাইরের বাঁশের আগলটা বন্ধ করে বলে—হ্যাঁ মা।

মা এইবার চিমনিটা জ্বালে, তাও কিছুক্ষণের জন্য। কারণ কেরোসিন তেল এখানে মেলে না, মিললেও তার দাম অনেক। বেশী তেল কেনার পয়সাই নাই, তাই বেলাবেলি রান্নাবান্নার কাজ চুকিয়ে রাখে, কোনমতে রাতে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। খাবারও সামান্যই।

সাবিত্রীর ঘুম আসে না, মনে জাগে নানা চিন্তা, ওদিকে দিনভোর পরিশ্রম করে রাজা কলি ঘুমিয়ে পড়ে, সাবিত্রীর চোখে ঘুম নামে তখন অনেক রাত।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙ্গে যায় সাবিত্রীর কাদের পায়ের শব্দ কানে আসে! চুরি ডাকাতি এদিকে হয় মাঝে মাঝে সে সব হয় জোতদার-ব্যবসায়ীদের ঘরে, যেখানে মাল কড়ি কিছু মিলবে।

তাদের ঘরে তেমন কিছুই নাই।

তবু উঠে পড়ে সাবিত্রী, কে জানে গোয়ালের গরুই চুরি করতে এসেছে কিনা।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই কারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছায়ামূর্তির দলের হাত থেকে বাঁচার জন্য সাবিত্রীও চেষ্টা করছে, চীৎকার করে ওঠে সে। রাজার ঘুম ভেঙে যায় ওই চীৎকারে। কলিও জেগে উঠেছে, ভাই বোনে দরজা খোলা দেখে বের হয়ে আসে—হঠাৎ দেখা যায় একটা লোক রাজার পিঠেই একটা লাঠির ঘা মারে, রাজা ছিটকে পড়ে নীচে। আর সেই মূহূর্তে তাদের ঘরখানায় ওদিকে আগুন জ্বলে ওঠে।

রাজা কোনমতে ওঠার চেষ্টা করে, দেখে ছায়ামূর্তির দল মাকে তুলে নিয়ে দৌড়লো বাঁধের ওদিকে, তার ওঠার ক্ষমতা নেই, যাবার সময় একজন তাকে লাথি মেরে ছিট্‌কে ফেলে পালালো।

রাজার চোখে সব কেমন ধোঁয়াসা হয়ে ওঠে। ধূ ধূ আগুনে জ্বলছে ঘরখানা, গোয়ালের গরু দুটো আতঙ্কে দড়ি ছিড়ে কোনদিকে দৌড়লো।

কলি দেখছে লোকগুলো তার মাকে তুলে নিয়ে চলেছে অন্ধকারে। একটু দূরে মেয়েটাও চলেছে ওদের উপর নজর রেখে।

লোকগুলো মাকে নিয়ে এসে রতনবাবুর বাগানে ঢুকলো প্রায় ওরা সবাই ঢুকে গেছে গেটের মধ্যে—দু তিনজন পিছনে আসছিল যুদ্ধজয়ী বীরের মত, তারাই দেখে অন্ধকারে একটা বাচ্ছাও তাদের পিছনে পিছনে আসছে সাক্ষীর মত।

ওই বাচ্ছাটা তাদের সব কাজই দেখেছে, হয়তো চিনছেও তাদের। ওটাকে ধরতেই হবে, এসব ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে নাই।

একজন গর্জে ওঠে—কে রে?

কলি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। লোকগুলো খুঁজছে তাকে। কলি ঝোপ থেকে বের হয়ে দৌড়ে পালাতে থাকে, কিন্তু ওই লোকগুলোর চোখ যেন অন্ধকারেও জ্বলে।

ওরা পিছু নিয়েছে কলির, কলি প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে, পিছনে তাড়া করে আসছে ওই দৈত্যের দল, ধরতে পারলে শেষ করে দেবে তাকে।

লোকগুলো কাছাকাছি এসে গেছে, বাচ্চা মেয়ে ওদের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কি করে? সামনে নদীর বুক—তারার আলোয় চক্ চক্ করছে।

পিছনে তাড়া করে আসছে নিষ্ঠুর মৃত্যুদূতের দল, ধরতে পারলে শেষ করে দেবে, সামনে নদীর বিস্তার, উঁচু পাড়ের নীচে বয়ে চলেছে নদীটা।

পিছনেই এসে গেছে লোকগুলো, ধরে ফেলবে তারা কলিকে, একজন গর্জে ওঠে—কুপিয়ে শেষ করে গাং-এ ফেলে দে ওটাকে।

কিন্তু কোপাতে আর পারে না, কলিই লাফ দিয়েছে ওই অতল গাং-এ স্রোতে ভেসে যায় দেহটা। লোকগুলো থেমে যায়, দেখে নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে দেহটা। একজন বলে—যা এবার কুমীর কামটের ভোগেই লাগবি, চল, ওটার দফা শেষ, বাগানে কি হচ্ছে দেখি গে।

রতনবাবুও তৈরী ছিল কাগজপত্রও তৈরী হয়েই আছে, লোকগুলো সাবিত্রীকে এনে নামায়। বিধ্বস্ত চেহারা তার।

রতন বলে—এবার? সোজা কথায় কাজ হলো না তাই ধরে আনতে হলো, দাও টিপছাপ!

—না! আমাকে শেষ করে দিলেও টিপছাপ দেব না। শয়তান ইতর লোভী একটা জানোয়ার!

—থামো! গর্জে ওঠে রতন, নিজেই জোর করে সাবিত্রীর বুড়ো আঙুলটা ধরে দলিলে টিপ ছাপ নিতে সাবিত্রী বলে—সারা গায়ের লোককে বলবো। আজ সবাই জানবে তুমিই শেষ করেছিলে আমার স্বামীকে এই জমির লোভে, তুমি খুনী।

রতনও বুঝেছে ব্যাপারটা। সাবিত্রীকে আর ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে নিরাপদ হবে না, ও চিরকাল তার কাছে একটা কাঁটা হয়ে থাকবে, রতন জানে কি করে পথের কাঁটা সাফ করতে হয়।

কেউ জানে না, দেখেনি যে তার লোকজন তুলে এনেছিল সাবিত্রীকে। তাই ওই শেষ প্রমাণ সাবিত্রীকেই শেষ করে দেবে সে।

রতন বলে—ফটিক, তেলিয়া এটার ব্যবস্থা করে দে, যেন কোনদিন আর এখান থেকে বের হতে না পারে, ওর মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দে।

ফটিকরাও জানে কি করতে হবে।

তাই রতনের কথায় বলে—তাই হবে কত্তা, কাক পক্ষীতেও আর এই মেয়েটার খবর জানবে না।

—না! আর্তনাদ করে ওঠে সাবিত্রী, চোখের সামনে মৃত্যুর করাল ছায়া নামে। আর্তকণ্ঠে বলে—ছেড়ে দাও, যেতে দাও আমাকে!

রতন গর্জে ওঠে—দেখছিস কি! শেষ করে লাশ গুম করে দিবি মাটির তলায়।

রাতের অন্ধকারে একটা কাল পেঁচা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে ওঠে, বাতাসে ওঠে একটা ক্ষীণ আর্তনাদ, সেটা চাপা পড়ে যায় নদীর মত্ত গর্জনে, রাতের অন্ধকারে একটা নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে গেল।

রতনের কাছে অবশ্য এটা সহজ স্বাভাবিক ঘটনাই।

রাতের অন্ধকারে গাং-এর বুকে একটা পানসী ভেসে চলেছে, একটু সৌখীন পানসী, ছই এর মধ্যে ঘর—কমলি রানী এই অঞ্চলে বড় বড় মহাজনদের বাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠানে নাচতে আসে।

কলকাতাতেই থাকে। অবশ্য তার পরিচিতি বাইরের দিকেই। বেশ ভালো টাকা মুজরো নিয়ে সাহেবখালির ওদিকে কোন বন মহাজনের বাড়িতে নাচতে এসেছিল।

সেখানের অনুষ্ঠান শেষ করে সেই মহাজনের পানসীতে দলবল নিয়ে ফিরছে। হাসনাবাদ ঘাটে গিয়ে পানসী ছেড়ে তারা কলকাতায় ফিরে যাবে নিজেদের ডেরায়।

কোন তিথি জানে না। চাঁদ উঠেছে একটু দেরীতেই, নিস্তব্ধ গাং-এ চাঁদের আলোয় চারিদিক মোহময় হয়ে উঠেছে, কমলি বাঈ পাটাতনে বসে আছে।

হঠাৎ পানসীর একজন মাঝি নদীতে কি দেখে চীৎকার করে

—একটা বাচ্চা ভেসে যাচ্ছে গো! অন্যরাও দেখে, স্রোতে ভেসে চলেছে একটা বাচ্ছা। কমলাবাঈ বলে—তোল্, তোল্ ওটাকে।

মাঝিরাও নৌকা ওই দিকে নিয়ে গিয়ে বাচ্ছাটাকে তোলে পাটাতনে. ময়লা ফ্রকপরা একটা মেয়ে, গলায় সস্তা দামী হার, এই অঞ্চলরই হবে।

মাঝি বলে—বেঁচে আছে গো, বেশ কিছুক্ষণ সাঁতরে আর পারেনি।

কমলিবাঈ দেখে মেয়েটাকে, এর মধ্যে মাঝিদের একজন মেয়েটার পেটে চাপ দিতে হড় হড় করে খানিকটা বমি করে মেয়েটা,

একটা দীর্ঘ শ্বাস নেয়, ক্রমশঃ চোখ খোলে।

মাঝি বলে—এ যাত্রা বেঁচে গেল মেয়েটা। কাদের মেয়ে কে জানে?

কমলিবাঈ বলে—নিয়ে চল ওকে, তারপর সুস্থ হলে খোঁজ খবর করা যাবে।

ওরা ওকে তুলে ভিতরে নিয়ে গিয়ে গরম দুধ খাইয়ে একটা কম্বল চাপা দিতে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ে অবসাদ, ক্লান্তিতে।

সব রাত্রিরই শেষ হয়।

এই সর্বনাশা রাত্রিরও শেষ হয়, রাজা কোনমতে উঠেছে, ঘাড়ে সর্বাঙ্গে তীব্র বেদনা, চেয়ে দেখে তাদের শেষ আশ্রয়টুকুও আর নেই।

ঘরখানা পুড়ে গেছে—আগুনের তাপে মাটির দেওয়াল ফেটে ধ্বসে পড়েছে, তখনও বাঁশের খুটিগুলোয় ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। ওদিকে একটা কৃষ্ণচূড়ার চারা লাগিয়েছিল কবে রাজা ফরেস্ট কলোনী থেকে এনে সেই গাছটা এতটুকু সবুজের অস্তিত্ব নিয়ে ওই ধ্বংস প্রায় পোড়া ভিটের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর সব পুড়ে ছাই, মাও নেই, কলিরও কোন চিহ্ন নাই, খবরটা গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে, হাটতলাতেও।

চরণ ডাক্তার এখানে গেড়ে বসেছে। অবশ্য তার জন্য রতনবাবুর অবদানও কম নেই। রতনবাবুই ওকে জায়গা দিয়েছিল। মদতও দিয়েছে, চরণ বলে—মথুরের বাড়ি পুড়েছে।

একজন বলে—তাই তো শোনলাম, মহেশ বলছিল।

চরণ ডাক্তার ও চেনে মহেশকে, লোকটার কথাটাই ত্যাড়াব্যাঁকা, রতনবাবুর আড়তে মাছ দেয়, ওর দাদন খায়, আর রতনবাবুর নামেই যা তা বলে।

চরণ বলে—ওই মথুরেরও দোষ ছিল অনেক হে, রাত বিরেতে দল বেঁধে চুরি ডাকাতিও করতো। বলে না ভূতের ওঝা ভূতেব হাতেই মরে, বেদে মরে সাপের ছোবলে, এও তাই, কোথায় হিসাবে গোলমাল করেছিল না হয় মাল এনে ঘরের মাটিতে পুঁতে রেখেছিল, দলের বাকী লোকরা এসে সব শেষ করে দিয়ে গেছে।

অন্যরা বলে—কিন্তু বৌটা—মেয়েটারও পাত্তা নাই। চরণের ভাঁড়ারে তার জবাবও আছে, বলে সে—খবর নে কারো সঙ্গে ভেগেছে কি না! পীরিত বুঝিস?

গোলাবীও শুনছিল কথাটা, সে ফুঁসে ওঠে

—তুমি কি গো ডাক্তার? ভদ্দরলোক না ইতর!

চরণ চটে ওঠে—কেন?

—মুখে তোমার কিছুই আটকায় না, একজনের নামে না জেনেশুনে যাতা বলবে না।

গোলাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। বলে,

—এর মূলে কি আছে তা বুঝবে দু দিন পরই, কি রাজত্বি হলো? ঘর জ্বালাবে—শেষ করে দেব সব, ইয়ার বিচার হবে না? ভগবান কি নাই?

গোলাবী নিজেই এগিয়ে চলে সাবিত্রীর বাড়ির দিকে।

খবর শুনে কেদারবাবু চমকে ওঠেন,

—সে কি!

কমলা বলে—তাই তো শুনলাম, ছেলেটা পড়ে আছে, ঘরবাড়ি নাই, মা বোনটারও কোন খবর নাই।

শিখা বলে—চল না বাবা রাজাদার বাড়িতে।

কেদার বলে—চল।

কেদারবাবু এসেছেন শিখাকে নিয়ে।

রাজা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে পাথরের মত, চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার জীবনের নিষ্ঠুর কাহিনীগুলো। বাবার এত সাধের সোনা ফসলের ক্ষেত জ্বলে পুড়ে গেল—বাবা প্রতিবাদ করতে গেছল, আর তার জন্যই নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছিল তাকে। মনে পড়ে রতনবাবু এসেছিল জমিগুলো ঠকিয়ে নিতে। কিন্তু রাজাই আটকে ছিল, মা সাদা কাগজে টিপছাপ দেয়নি।

আজকের এই ঘটনার জন্য রাজার মনে হয় ওই রতনই দায়ী। ওইই করিয়েছে এসব। ওই অন্ধকারে যারা এসেছিল তারা রতনবাবুরই লোক।

তারাই তার মা—বোনকে তুলে নিয়ে গেছে। কে জানে কোথায় আছে তারা।

...কেদারবাবু, শিখাকে আসতে দেখে চাইল রাজা। কেদারবাবু রাজাকে দেখে শিউরে ওঠেন— একি সব শেষ!

রাজা চুপ করেই থাকে, আজ তার চোখের জলও যেন পাথর হয়ে গেছে।

কেদারবাবু বলেন—আমার ওখানেই চল রাজা। ওখানেই থাকবি।

রাজা চুপ করে থাকে।

এই আবাদ এই গঞ্জের উপর তার আজ বিশ্বাস হারিয়ে গেছে, কেদারবাবু বলেন—তোর মা, বোনের খোঁজও করবো। এখন চল—এখানে কোথায় থাকবি?

গোলাবীও এসেছে পড়ে, এসেছে মহেশ কাকাও, মথুরের বন্ধু, নগাও এসেছে, তারাও বলে,

—তাই যা রাজা, তারপর খোঁজ খবর করা যাবে, পুলিশেও খবর দিতে হবে।

রাজা বলে—কোন লাভ হবে না কাকা।

—তবু চেষ্টা তো করতে হবে, চল। কেদারবাবু বলেন ওকে,
শিখাও বলে—তাই চল রাজা।
রাজা বলে—তোমরা যাও, আমি পরে যাচ্ছি মাস্টারমশায়।
কেদারবাবু বলেন, —তাই আয়, দেরী করিস না।

ওরা চলে যেতে রাজা উঠে দাঁড়ায়, তাকে শেষবারের মত সন্ধান করতেই হবে।

রতনবাবু এখন কাজে ব্যস্ত, তার ভেড়ির জন্য দরকারী জমির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এখন দলিল তার হাতে আর সেই দলিলের প্রতিবাদও করার কেউ নাই।

তবে এখুনিই নয়—ক'দিন পরই ওই জমির মাথায় বাঁধ কেটে ওখানে কন্‌ক্রীটের জমাট দেওয়াল করে, লকগেট বসানো হবে, ওই পথ দিয়েই চিংড়ি ভেড়িতে নোনা জল ওঠানো, বের করা হবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে অন্য সব হিসাব কিতাব করছে, হঠাৎ ঝড়ের মত ছেলেটাকে ঢুকতে দেখে চাইল রতন। এসেছে রাজা, জামা প্যান্টে ছাই এর কালছে দাগ, চোখ দুটো লাল—কপালে তখনও রক্তের দাগ, জামাতেও সেই দাগ, মূর্তিমান ধ্বংসস্তূপের মত এসে দাঁড়িয়েছে রতনের সামনে।

রতন চাইল—তুই! এখানে?

রাজা এগিয়ে আসে। বাচ্চা ছেলেটার চোখের দৃষ্টিতে কি কাঠিন্য মাখানো। শুধোয় রাজা—আমার মা, বোন কোথায়?

রতন ওর সাহস দেখে অবাক হয়, এই গঞ্জে তার মুখের দিকে চেয়ে কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারে না, এইটুকু ছেলে আজ এসেছে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে!

রতনও রেগে গেছে, এখুনি ও তার অনুচরদের ডাকিয়ে এনে ওই ছেলেটাকে মুখের মত জবাবই দিতে পারে। কিন্তু তা করতে চায় না রতন, বলে

—তোর মা-বোন কোথায় গেছে তা আমি কি করে জানবো?

রাজা বলে—আমাদের ঘরে কে আগুন দিল, মা বোন কোথায় গেল তার কিছুই জানো না রতনবাবু?

রতন বলে—আমি কি করে জানবো? তার জন্য থানা পুলিশ আছে, তারা তদন্ত করবে, সেখানে যা।

রাজা বলে ওঠে—তাহলে তুমি কিছু বলবে না এখন?

রতন বলে ওঠে—যা তো এখান থেকে? যাবি না ব্যবস্থা করতে হবে তোরও?

রাজা বলে—ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না রতনবাবু? আমার আর হারাবার কিছুই নাই। সবই তো গেছে, আজ যাচ্ছি, তবে একদিন এর জবাব তোমাকে দিতেই

হবে রতনবাবু, জবাব তোমাকে দিতেই হবে।

বের হয়ে যায় রাজা।

রতন অবাক হয়ে ওই ছেলেটার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে, নন্দ সরকার ওদিকে বসে সব দেখেছে, শুনেছে। সে অবশ্য রতনবাবুর এসব গোপন কাজের হিসাবে রাখে না, রাখতেও দেয় না রতনবাবু, তবু নন্দ সরকার অনুমান করেছিল ব্যাপারটা। সেও জানে এসব রতনবাবুরই কাজ।

তবু ওই ছেলেটাকে এখানে এসে রতনবাবুকে শাসাতে দেখে বলে মালিককে খুশী করার জন্যই

—এতবড় সাহস ছেলেটার? এ্যা—ছেড়ে দেবেন ওকে এমনিই? বলেন তো আমিই দিই ঘা কতক।

রতন জানে আসল কাজ তার হাসিল হয়ে গেছে, ওই পুঁচকে ছেলেটাকে নিয়ে আর ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চায় না সে। এমনিই কেটে পড়তে হবে ওকে এখান থেকে, তাই আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তাই বলে রতন

—যেতে দাও নন্দ, ওসব তড়পানি ঢের দেখা আছে, ছুঁচো মেরে আর হাত ময়লা করতে চাই না।

নন্দও মালিকের কথায় সায় দেয়।—তা সত্যিই।

নদীর জল এত কোথা থেকে আসে কোথায় যায় তার খবরও কেউ রাখে না। তেমনি শ্যামপুরগঞ্জে অনেক মানুষ এসেছিল কেউ বন কেটেছে, বসবাস করেছে, গাং-এ মাছ ধরেছে, আবার কোথায় উধাও হয়ে গেছে, তাদের খবরও আজকের গঞ্জের মানুষ রাখে না। রাজাও দেখেছে এই মাটিতেই তার সব হারিয়ে গেছে, বাবা-মা-বোন, জমি ঘর সব। কেদারবাবু বলেন তাকে তার কাছে থাকতে, শিখাও খুশী হবে।

কিন্তু রাজার মন এখানে হু হু করে, কি হবে এখানে থেকে? তাই সেদিনই ছেলেটা শেষবারের মত ওদের ছাই এর স্তূপের ভিটেতে এসে দাঁড়ায়।

মনে হয় কেউই হারায়নি, সবাই যেন আজ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মা, বাবা, কলি না কেউ নাই, চারিদিকে শুধু সব হারানোর নিঃস্বতা। ছেলেটা বের হয়ে যায়, চোখে জল আসে, চোখের জল মুছে সারা মনে এক অগ্নিজ্বালা নিয়েই সে পথে বের হলো। কোথায় যাবে জানে না।

এতবড় পৃথিবীই যেন তার কাছে শূন্য বোধ হয়।

গহনার নৌকা চলেছে ক্যানিং এর দিকে। রাজা বাবার সঙ্গে একবার সদরে এসেছিল, এই ক্যানিং থেকে ট্রেনে যেতে হয় শহরে, ক্যানিংও মস্ত বড় গঞ্জ। বাজার কত মাছের আড়ত, লঞ্চঘাট, ইস্টিশান, লোকজন দোকান পশার, কত আলো, আজ সেই অচেনা জগতেই ভেসে চলেছে রাজা।

পিছনে পড়ে রইল শ্যামপুরগঞ্জ, তার বন্ধু নগা, গোলাবীদি, শিখা কত চেনামুখ! আজ সে সব ছেড়ে চলেছে!

নৌকাটা ভেসে চলেছে মাতলার প্রশস্থ বুকে, অনেক যাত্রীই চলেছে, রাজা একদিকে চুপ করে দুহাটুতে মুখ রেখে বসে আছে।

একজন শুধোয়—এ্যাই ছোঁড়া কোথায় যাবি?

রাজা জবাব দিল না, জবাব দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না, লোকটা বিড়ি টানতে টানতে বলে—কি রে? এ্যাই জবাব দিচ্ছিস না যে? কোথায় যাবি?

রাজা বলে—ক্যানিং-এ।

লোকটা এবার তীক্ষ্নস্বরে বলে—দেখে তো মনে হয় পড়িস টড়িস। তা পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে পালাচ্ছিস নাকি? এ্যাঁ।

রাজার মনে গভীরভাবে বাজে কথাটা। পরীক্ষাতে—জীবনের পরীক্ষাতেই সে ফেল করে গেছে, লোকটা তাই যেন বলছে।

গর্জে ওঠে রাজা—তাতে তুমার কি? ফেল! পরীক্ষায় ফেল আমি করি না, যাচ্ছো যাও পিছনে লেগো না। ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

লোকটা ওর কঠিন কণ্ঠস্বরে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে—আয় বাপ্। এ যে খরিস সাপের ড্যাঁকা হে, কেমন ফুঁসছে দ্যাখো।

রাজা বলে—কাজ কাম দিতে পারবা? তাহলে বলো—নাইলে চুপ করে বসে থাকো। মুরোদ নাই—ফুটানিই সার।

লোকটা চুপ করে যায়। সকলেই দেখছে ওই তেজী ছেলেটাকে।

মদন সামন্ত এই অঞ্চলের বড় কাঠের মহাজন। বনের কাঠ কেটে শহরে চালান দেয়, মদনবাবুও নৌকায় যাচ্ছিল। ছেলেটার ওই চোটপাট দেখে কেমন যেন মনে লাগে ছেলেটাকে।

বাদাবনের বাঘের বাচ্চার মত ফুঁসে ওঠে। ছেলেটা তার কাজে আসতে পারে, তাই মদনবাবু বলে—কাজ করবি তুই?

রাজা চাইল, দেখছে মদনবাবুকে, ভারিক্কি চেহারা, মাজা রং, পরণে ধুতি পাঞ্জাবী।

রাজা বলে—করবো, যি কাজ দেবে করবো।

মদনবাবু বলে—তাহলে চল, আমার কাঠগোলাতেই কাজ করবি,

নৌকার অনেকেই মদনবাবুকে চেনে, তারাই বলে রাজাকে,

—যা বরাত ভালো, এমন মুনিব পেয়ে গেলি।

মদন শুধোয়—কি নাম তোর?

—রাজা।

কে যেন বলে—জব্বর নামখানা, দ্যাখ যদি সত্যিকার রাজা হতে পারিস।

নৌকা ক্যানিং-এর ঘাটে ভিড়তে সকলেই নেমে যায়, রাজাও নেমেছে, মদনবাবু বলে—চল, ওদিকে আমার কাঠগোলা, ওখানেই থাকবি, কাজকম্ম শিখেনে—আখেরে কাজ দেবে।

রাজা চলেছে ওর সঙ্গে। দেখছে ক্যানিং শহরকে, তাদের শ্যামপুর গঞ্জ থেকে অনেক বড় গঞ্জ, কত বড় বাজার। গাং-এর কত নৌকা—লঞ্চ।

শ্যামপুরগঞ্জের দিনও বসে নাই, নদীর স্রোত যেমন স্বাভাবিক নিয়মেই বয়ে চলে, সময়ও তেমনি বয়ে যায় আপন গতিতে, প্রকৃতির বুকে, মানুষের দেহে মনে সময়ের ছাপটাই পড়ে।

ওই রাজা চলে যাবার পর এখানের মানুষ অনেকেই তার কথা ভুলে গেছে।

রতনবাবুও ক'মাসের মধ্যেই রাজাদের ওই ধানজমির অনেকখানি ভেড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে বাকি জমিতে কন্‌ক্রীটের দেওয়াল তুলে ওখানে পাকাপোক্তভাবে লোহার পাত বসানো লকগেট বানিয়ে ফেলে।

তার ভেড়িতে ওই পথেই জোয়ার এর সময় জল ফুলে উঠলে লক্‌গেট খুলে ভেড়িতে নোনা জল ঢুকিয়ে নেয়, আবার দরকার হলে ভাঁটার সময় লক্‌গেট খুলে বাড়তি জল বের করে দেওয়া হয়।

এখন রতনবাবুর বিশাল ভেড়িতে প্রচুর বাগদা চিংড়ি হয়, রতনবাবু আড়তের ওদিকে বড় শেড্ তুলে এখন অনেক মেয়েদের কাজে লাগিয়েছে।

রোজ কয়েক কুইন্টাল চিংড়ির সাইজ করে মাথা কেটে এখান থেকে বরফ দিয়ে চালান যায়, ওদিকে বরফকলও গড়ে উঠেছে।

রতনবাবুর এখন এসব ব্যবসা দেখার জন্য ছোটখাটো একটা বাহিনীই আছে।

তারা ভেড়ির কাজ দেখে, মাছ চালান দেয়, মাছের আড়তে কাজ দেখে জেলেরা এখন রতনবাবুর দাদনের টাকা নিয়ে তাদের সব মাছই ওকেই দেয়, দিতে বাধ্য হয়।

রতনবাবুর দক্ষিণ হস্ত এখন নন্দ সরকার, আর ফটিক এখন মালের ওজন করে।

রতনবাবু মাঝে মাঝে আড়তে এসে গদিতে বসে। তার অনেক কাজ, নদীর ধারে

দু'তিনটে গুদামও করেছে, ওখানে তার নানা মালপত্র থাকে।

আর ইদানীং রতনবাবু আর একটা ব্যবসাও বেশ জমিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশের বর্ডারও নদীপথে বেশী দূর নয়, সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে চোরা খালও আছে, সেখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এর লোকজনের নজর একটু শিথিল থাকে। রতনের অনুচর ওই ফটিক, মণ্টার দল ওই পথে বাইরে থেকে বর্ডার পার করে আনে নানা দামী বিদেশী জিনিস, সে সব জিনিষ নৌকায় অন্য মালের সঙ্গে কলকাতাতেই চলে যায়।

এর জন্য রতনবাবু ওপারের দু'একজন মহাজনদের সঙ্গেও ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওই বাগান বাড়িতে সেই সব বিদেশী মেহমানদের এনে খাতির করে খানাপিনা করায়, কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে নাচনেউলিদেরও আনা হয় বেশ টাকা দিয়ে।

বাগানে মহ্‌ফিল বসে, সেই বিদেশী মেহ্‌মানদের সঙ্গে এখানের নতুন দারোগাবাবুরও পরিচয় হয়।

রতন জানে এখন দিন বদলেছে, স্বাধীন ভারতে এখন নেতারাই দিনকে রাত করতে পারে।

তারাই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আর নেতাগিরি করতে হলে এখন এটাকেই পেশা হিসাবে নিতে হবে, চব্বিশ ঘণ্টা এর পিছনে থাকতে হবে, দেশের মানুষই সেই নেতাদের ভোট দিয়ে গদিতে বসায়।

রতনবাবু অবশ্য ইচ্ছা করলে এই এলাকার সব ভোট যেভাবেই হোক এনে তার বাক্সে ঢোকাতে পারবে, কিন্তু নেতা হলে তার রোজকার ব্যবসা মার খাবে।

অথচ নেতাকে চাই। তাই সেও এবার এই অঞ্চলের নেতা হিসাবে তার একজন নিজের লোককেই বসাতে চায়।

গঞ্জের অনেকেই ভাবে কেদারবাবুর কথা। সাধারণ মানুষ, চাষী বাকী জেলেরা—ওই লোকটিকে খুবই শ্রদ্ধা করে, কেদারবাবু সৎ। ওদের জন্য অনেক করেন।

মহেশ, প্রমথ, দোল গোবিন্দ, হাটতলার হারু পালও বলে—আপনিই ভোটে দাঁড়ান মাস্টারমশায়।

কিন্তু কেদারবাবু বলেন,

—ওসবে নাই হে, ইস্কুল নিয়ে আছি—দেখা যাক রাস্তাঘাট বাঁধ এসব যাতে করানো যায়। সরকারী ডাক্তারখানা যদি হয় এইসব চেষ্টাই করি, রাজনীতিতে আমি নাই, বয়সও হোল।

খবরটা চরণ ডাক্তারই রতনের কাছে পৌঁছে দেয়, রতনবাবুর বৈঠকখানায় সকালে

অনেকেই আসে, স্কুলের নতুন মাস্টার অলক বাবু এখন কেদারবাবুর কাছের মানুষ।

স্কুলে একজন শিক্ষকের দরকার, রতনবাবু প্রেসিডেন্ট। কেদারবাবু চান যোগ্য একজন শিক্ষককে, যে স্কুলকে ভালোবাসবে। এই স্কুলের ছাত্র অলককে তিনি নির্বাচিত করেন, অলক পাশেই কুলতালি গ্রামের ছেলে, রাজাদের আগের ব্যাচেরই ছাত্র।

রাজা কোথায় হারিয়ে গেল। অলক পড়াশোনাতেও ভালো। ওর বাবার ছোট একটা ধান চাল এর আড়ত। অলক এই স্কুল থেকে পাশ করে দু বছর হলো এম এ করেছে। এলাকার ছেলে, মন দিয়ে পড়াবে।

চরণ ডাক্তারের ভাগ্নে মহান বারাসতের ছেলে, সে খবর পেয়েছে মামার মারফৎ যে এখানের স্কুলে একটা চাকরী হতে পারে। তাই মহান মামার কাছে আসে।

মহান বি এ পাশ করে বি এডও করেছে, বাবার অবস্থা ভালোই, বারাসতে দোকান ব্যবসাপত্র আছে, মহান জানে আজকাল কিভাবে চাকরী মেলে।

তাই মামাকে এসে বলে মহান,

—ষাট হাজার টাকা ডোনেশন দিতে পারি মামা, যদি চাকরীটা হয়ে যায়।

চরণ এমনিতে কেদারবাবুর উপর চটা, কারণ ইদানীং কেদারবাবু এলাকার মানুষের গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার তৈরী করার জন্য চেষ্টা করছেন। এ নিয়ে সদরে কলকাতাতেও রাইটার্সে কোন মন্ত্রীকে ধরেছেন, এখানে এ নিয়ে সার্ভে এনকোয়ারীও হয়ে গেছে।

জায়গা দেবার লোকও আছে, ডাক্তারখানার জন্য কেদারবাবু চেষ্টা করছেন।

এতে চরণ ডাক্তার মোটেই খুশী নয়, কারণ ওর ভাতেই হাত পড়বে, এখন চরণ ডাক্তার এখানে তার হাতুড়ে ডাক্তারী বিদ্যা দিয়েই যা রোজকার করে তা কম নয়, পাশ করা ডাক্তার এখানে এলে তার রোজকার বন্ধ হয়ে যাবে, কেদারবাবুর উপর তাই খুশী নয় চরণবাবু।

সেও শুনেছে ওই কুলতলির অলককে মাস্টার করতে চায় কেদারবাবু, এই সময় মহান টাকার লোভ দেখাতে মামাও বুঝেছে ব্যাপারটা।

সে মহানকে নিয়ে রতনবাবুর ওখানেই গেছে।

ঢোল গোবিন্দ সর্দার কয়েকদিন হল পোস্টিং পেয়ে শ্যামপুরগঞ্জে এসেছে, এই আবাদ অঞ্চলে সাধারণত পাঠানো হয় সদর থেকে কিছু অসাধারণ ব্যাক্তিদেরই যাদের সরকার একটু শিক্ষা দিতে চায়।

এই বনবাসে তাদেরই পাঠানো হয়, গহন গাং-গহিন বন আর দুস্থ আবাদের

মানুষদের দেখভালের জন্য। যাতায়াতের পথঘাট নাই, নদীপথেই নৌকায় না হয় ভুটভুটিতে প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। দুর্গম বনাঞ্চল, শহরের কোন সুবিধাই এখানে নেই। আর শহরে যে মান খাতির এবং অন্যসব ব্যাপার আছে বাদাবনে সে সব ব্যাপার নাই। ফলে যারা আসেন তাদের খুশী হবার বিশেষ কারণ থাকে না।

ঢোল গোবিন্দ সর্দার এখানে এসে হতাশই হয়। থানাটা নদীর বাঁধের ওদিকে। দিনরাত নদীর মত্ত গর্জন ভেসে আসে, সেদিন অফিসে বসে আছে ঢোল গোবিন্দবাবু, ও একজন বেশ ছিমছাম ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে চাইল সে।

লোকটির সঙ্গে দু'জন লোক, ঝুড়িতে টাটকা আনাজপত্র, নধর সাইজের ফুলকপি, সরেস বেগুণ, অন্য ঝুড়িতে নানারকম ফল, সন্দেশ, আর ছোট ঝুড়িতে কেজি দুয়েক দশ ইঞ্চি সাইজের কালো ডোরাকাটা টাইগার প্রণ—একটা নধর চক্‌চকে ভেটকি।

লোকটির পিছনে এসেছে ডিউটির কনেস্টবল, সেইই পরিচয় করিয়ে দেয়—ইনি রতনববাবু স্যার এখানের অঞ্চল প্রধান। মাছের আড়ত, চিংড়ি ভেড়ির মালিক—এখানের বড় ব্যবসাদার।

বাকিটা রতনই বলে,

—স্যার এলেন, ভেড়ির টাটকা বাগদা নিয়ে এলাম, ক্ষেতের ফুলকপি, আড়তের ভেটকি মাছ।

ঢোল গোবিন্দও রসিক ব্যক্তি, ভোজনবিলাসী আর শিকারী বিড়ালের মতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার, দেহের পরিধিও বিশাল।

রতনও মানুষ চেনে, সে দেখেছে নতুন দারোগাবাবুর চোখে খুশীর হাসি, উৎসাহিত হয়ে রতন বলে,

—এলেন বাদাবনে, এখানে তো তেমন কিছু নাই স্যার যে সেবা করবো। তবু বাগানের সামান্য আনাজপত্র, ভেড়ির বাগদা আনলাম।

ঢোল গোবিন্দ এমন সাইজের বাগদা দেখে খুশী। সহকর্মীরা তাকে ডাকতো ওই বিশাল ঢোলের মত উদরের পরিধির জন্য ঢোল গেবিন্দ বলে। এখন ঢোলটা তুলে রেখে নিজেকে তাই গোবিন্দবাবু বলেই পরিচয় দেয়। গোবিন্দ বলে— না। না। উৎকৃষ্ট বাগদা। বসুন—বসুন রতনবাবু।

রতনও খুশী, বুঝেছে এঁকে সামলাতে তার কোন অসুবিধাই হবে না। তাই বসে সে, বলে

—একদিন গরীবের বাড়িতে পদধূলি দিতে হবে স্যার? বাদাবনে তবু

আপনাদের মত মানী লোকদের অভ্যর্থনা করতে পারলে খুশীই হবো।

গোবিন্দ বলে—যাবো, যাবো, এখানেই থাকতে হবে, আপনাদের মধ্যে, নিশ্চয়ই যাবো।

রতন ঢোল গোবিন্দবাবুকে বাগান বাড়িতে এনে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে, গোবিন্দবাবু এই বাদা অঞ্চলে এমন সাজানো বাগান দেখে খুবই খুশি। গোবিন্দবাবু বলে,

—বেশ নিরিবিলিতে এখানে বসা যায়, আর মশাই বাদাবনে কোন জিনিসের খামতি রাখেননি। এ্যাঁ—স্কচ, বিলাতী সিগ্রেট, খাবার দাবার। সব বিলাতী।

রতন বলে—একটু সখটখ আছে, নিন স্যার—শুরু করুন।

পানীয় এগিয়ে দেয় রতন।

এমন সময় চরণ ডাক্তারের আসার খবর পেয়ে বিরক্তই হয় রতনবাবু, লোকটিকে বলে—এ সময়! বসা ওদের ওদিকের ঘরে, আসছি।

রতন আসতে এবার চরণের ইশারায় মহান প্রণাম করে রতনকে।

—এটি!

চরণ বলে—সম্পর্কে আমার ভাগ্নে। লেখাপড়ায় রত্ন, বি এ বি এড করেছে, যদি এখানের স্কুলে ওকে কাজটা দেন, মানে হাজার পঁচাত্তর টাকাও দেবে ফান্ডে।

টাকার গন্ধ পেলে রতন উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—তাই নাকি হে?

মহান বলে—যদি দয়া করে চাকরী দেন, ওই টাকাটা দেব স্যার।

রতন কি ভাবছে, হঠাৎ এতগুলো টাকা আমদানী হবে এটা সে ভাবতেই পারেনি।

রতন বলে—এসব গোপনীয় ব্যাপার, এ নিয়ে কোন কথা বাইরে প্রকাশ যেন না হয়। দেখি তোমার জন্য কি করতে পারি।

চরণ বলে—আপনি ইচ্ছা করলেই সব হবে রতনবাবু, আর মহান এমনিতে বেশ বক্তৃতাও দিতে টিতে পারে। বারাসতে জেলার নেতাদের সঙ্গে ওর ওঠা বসা।

রতন নতুন একটা বাড়তি কোয়ালিফিকেশনেই দেখছে ওর মধ্যে, রতন বলে

—বাঃ, তাহলে নেতাদের সঙ্গে চেনাজানাও আছে?

মহান বলে—আজ্ঞে হ্যা, রাজনীতি এক আধটু করি কি না।

রতন কি ভাবছে! দেখছে সে মহানকে, তার মনে কিছুদিন থেকে প্ল্যানটা এসেছে, নেতা গোবর্দ্ধনকে বেশী বাড়তে দেওয়া চলবে না। রতন বলে,

—ডাক্তার, পরে খবর নিও। দেখি কি করা যায়। তবে কথাটা এখন গোপনই রাখবে।

কেদারবাবু সেদিন স্কুলে মিটিং ডেকেছেন রতনবাবু, চরণ ডাক্তার, হাটতলার শশীবাবু গার্জেনদের পক্ষে নন্দ সরকারও রয়েছে। সেদিন কেদারবাবু তোলেন অলকের কথাটা। বলেন তিনি,

—ওই যোগ্য প্রার্থী, স্থানীয় ছেলে, এই স্কুলের ছাত্র, ওকেই বহাল করতে চাই। নন্দ সরকার বলে আগেকার পরিকল্পনা মতই

—কিন্তু ওতো বি এড নয়, শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা নেই।

রতন বলে—মাস্টারমশাই, এই মহান ঘোষকেই রাখুন, শহরের ছেলে, বেশ বলিয়ে কইয়ে, বি এডও বটে।

কমিটির অনেকেই বলে—ওই মহানবাবুই থাকুন।

কেদারবাবু দেখছেন ওদের, বেশ বুঝেছেন তিনি মহানের পক্ষে ভোটই বেশী। আর রতনবাবুর দল ওকেই চায়, ওদের কথার প্রতিবাদ করেও লাভ হবে না।

কেদারবাবু বলেন—সকলেই যখন চাইছেন তাই হোক। তবে আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্তটা ঠিক নিলেন না।

রতন চুপ করেই থাকে।

গ্রামের অনেকে চেয়েছিল অলক চাকরীটা পাবে, কিন্তু তা হলো না, আর ওরা জেনেছে এটা হয়নি রতনবাবুর জন্যই।

মহান গদিতে বিরাজমান হয়। আর যথাস্থানে প্রনামীটাও দেয় গোপনে। তবে রতনবাবু মহৎ ব্যক্তি, একা সবই খায় না, সে গোপনে চরণ ডাক্তারকে ডেকে হাজার দশেক টাকার একটা বাণ্ডিলও ভাগ দেয়, চরণ তাতেই খুশী।

মহান জানে ওই টাকাটা কয়েকগুণ করেই তাকে তুলতে হবে, তাই স্কুলে এসেই সে চুটিয়ে প্রাইভেট টুইশানি শুরু করে, আর রোজ যায় রতনবাবুর কাছে। তার কলকাতার কোম্পানীদের চিঠিপত্র সব মুসাবিদা করে দেয়, দরকার হলে কলকাতায় গিয়েও রতনবাবুর কাজ করে দিয়ে আসে।

স্কুলের পুরস্কার বিতরনী সভায় সদরের দু তিনজন তাবড় নেতাদের এনেছে, রতনবাবুও ধাপে ধাপে এগোতে চায়, সে বুঝেছে সমাজে বাস করে দুনম্বরী ধান্দা করে মাল কামাতে গেলে এখন নেতাদের কৃপাদৃষ্টি চাই। দরকার হলে তাদেরও কিঞ্চিৎ প্রণামীও দিতে হবে। তাই তাবড় নেতাদের মন গলাবার জন্যই তাদের এনেছে এখানে, লঞ্চে করে ক্যানিং থেকে এনে বাগান বাড়িতে তুলেছে, সেখানে

বিলেতী মদ খেয়ে দিশী নেতারা তো খুশ, একজন নেতার মিটিং-এ গিয়ে চেয়ারে বসার ক্ষমতা নাই দেখে তাকে রেখেই অন্যরা মিটিং-এ গেলেন। তিনি তখন মেজেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। অন্যরা আকণ্ঠ গিলে মঞ্চে বসে জর্দাপান চিবিয়ে দেশোদ্ধার করে এলেন।

মহান দাদাদের আরও আপ্যায়ন করে লঞ্চে তুলে সোনাখালির ঘাটে নামিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরলো। গোবর্দ্ধন বুঝেছে তার দিন শেষ হয়ে আসছে।

কেদারবাবু দেখেন সবই।

এখন মেয়েদের স্কুলও হয়েছে, শিখা এখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় তার মামার ওখানে থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে ফিরেছে, স্থানীয় মেয়েদের শিক্ষার কাজেই লেগেছে স্কুলে, শিখাও দেখেছে ওই স্কুলের সভার ব্যাপারটা।

কমলা বলে—এখানেও তাহলে রাজনীতি ঢুকলো?

শিখা বলে—তাই দেখছি, রতনবাবু ওদের কাছাকাছি হতে চান কেন বুঝছি না।

কেদারবাবু অনেক কিছু দেখেছেন, মহানের এখানের চাকরীর পর থেকেই ওদের আনাগোনা, মিটিং শুরু হয়েছে। রতনবাবু হাটতলায় সেদিন ওদের নিয়ে মিটিংও করলো, দেশের জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট দূর করার কথাও বলা হোল, শোনানো হলো—রাস্তাঘাট হাসপাতাল এসবই হবে, অবশ্য কবে হবে সেটা পরে বলা হবে।

কেদারবাবু বলেন—দিন বদলাচ্ছে, তাই বাদাবনেও রাজনীতি আসবে এবার, বিচিত্র কি বলো, মানুষের চেতনা বাড়ছে।

শিখা বলে—কিন্তু সেই মানুষগুলোর স্বার্থে রাজনীতি হচ্ছে না বাবা, দেখে নিও, এসব হচ্ছে কারোও ব্যক্তিগত শক্তি সংগ্রহের জন্যই, তারই স্বার্থে।

ব্যাপারটা ক্রমশঃ বুঝেছে মানুষ, কিন্তু সাধারণ মানুষ এতই দুর্বল যে অন্যায় দেখলেও প্রতিবাদ করার সাহস তাদের নেই। কারণ অন্যায় যে করে এদের থেকে তার লোকবল, অর্থবল অনেক বেশী।

রতনবাবু পুরোদমে এবার ভেড়ির কাজ শেষ করে, মথুরের জমিগুলো পড়েই ছিল, গ্রামের লোকজন দেখে সেখানে পাকা গাথুনি হচ্ছে, লকগেটও তৈরী হয়ে গেল, ওদিকে ডাঙ্গার উপর মথুরের ধ্বংসপ্রায় ভিটেটা পড়ে রইল।

চিংড়ি ভেড়ির উদ্বোধনও করা হলো সমারোহ করে, মহান সদরের নেতাদের এনে মঞ্চ করে রতনবাবুকে মালা পরিয়ে তাদের সঙ্গে বসিয়ে ফটো তোলা হলো।

আর নেতারা ঘোষণা করলেন—রতনবাবু এই আবাদ অঞ্চলে সাধারণ মানুষের

কর্ম সংস্থানের ঢালাও ব্যবস্থা করেছেন, মহান এর মধ্যে পতাকা ফেস্টুন নিয়ে হাটতলাতে মিছিল আনলো, নিজেও বক্তৃতা দিল, —রতনবাবু এই আবাদ অঞ্চলের মানুষের মনে আশার আলো, বাঁচার হদিশ এনেছেন।

তেলিয়া, নন্দ সরকার, ফটিক, মন্টাদের দল জোরসে তালি বাজায়, তাদের দেখাদেখি তাদের কিছু পেটোয়া জনতাও তালি বাজায়।

কেদারবাবুও সেই মহতী সভায় এসেছেন, তিনি ক্রমশঃ দেখেছেন মহানের মহান কর্মযজ্ঞ, স্কুলে ক্লাশ নেবার সময় তাকে পাওয়া যায় না, থাকলেও দুএকটা ক্লাশ নিয়েই সে বলে,

—রতনবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার, যেতে হবে।

কেদারবাবু বলেন—ক্লাশদুটো নিয়েই যাবে।

—জরুরী ডাক, আমি ঘুরে আসছি স্যার।

কেটে পড়ে মহান। স্কুলের শিক্ষকতার চেয়েও রতনবাবুর কাজের গুরুত্ব তার কাছে অনেক বেশী। কেদারবাবু চুপ করেই থাকেন, সরকারী আদেশ মতে তারও অবসর নেবার বয়স হয়ে গেছে, আর কটা মাস মাত্র তার চাকরী, বাকী কটা দিন আর কোন অশান্তির মধ্যে যেতে চান না। তবে চাকরী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে শিক্ষা জগতের এই অবনতির ব্যাপারটা দেখে তিনিও চিন্তিত।

শিখা মেয়েদের স্কুলে পড়াচ্ছে, কিন্তু কমলাও দেখছে গঞ্জের মধ্যে হঠাৎ অনেক টাকার আমদানী শুরু হতে রতনবাবুর ব্যবসাকে ঘিরে অনেক অবাঞ্ছিত লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তারা অনেক বেপরোয়া, রতনবাবুর হয়ে নানা ধরনের কাজ করে।

বিশেষ করে এবার ভোটের সময় তারাই এলাকার মানুষজনকে শাসিয়ে ভোট কেন্দ্রের কাছেও যেতে দেয়নি। তারাই ছাপ্পা ভোট দিয়েছে, সাতজেল, মোল্লাখালির দিকে বোমা মেরে জনতাকে হঠিয়ে সেখানে মহানবাবুর ভোট বাক্স ভরিয়েছে।

মহান রতনবাবুর লোক, এবার রতনবাবুই মহানকে জিতিয়ে তাকে এম এল এ বানিয়ে নিজেই ফায়দা লুটবে। আর মহানও জানে তাকেও ধাপে ধাপে উঠতে হবে, সেও দেশসেবক বনে গেছে, ভাষণ দেয়—জানে মহান রতনবাবুর হাতের পুতুল সে, তাতেও তার আপত্তি নাই, মাস্টারির চাকরীর জন্য দেওয়া প্রণামীর টাকার কয়েকগুণই সে তুলবে সুদ সমেত, তার জন্য রতনবাবুর গোলামী করতেও বাধা নাই তার।

শিক্ষকরা জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর, তারাই আজ নিজের স্বার্থে জাতিকে এক অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, কথাটা শিখাও ভাবে, বলে শিখা

—এখানের স্কুলে চাকরী করে এইসবকেই মেনে নিতে হবে বাবা, কথাটা কেদারবাবুও জানেন, তার অবসরের দিন এগিয়ে আসছে, মেয়ের কথায় শুধোন

—কি করবি তুই?

শিখা বলে—ভাবছি মামার ওখানে গিয়ে দেখি কলকাতার ওদিকে কোনো স্কুলে কাজ মেলে কিনা! তাহলে এম এ-টা করতে পারবো, পি এইচ ডি করতে পারলে সুবিধাই হবে।

কমলা বলে—যা পরিবেশ হয়ে উঠছে, এখানে আর থাকা যাবে না, শিখা যদি কলকাতায় যেতে চায় বাধা দিও না।

শিখা এর আগেই একটা ঘটনার প্রতিবাদ করেছিল, ভোটের সময় ওই রতনবাবুর চ্যালা ফটিক মন্টার দল সারা এলাকা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। এই অঞ্চল থেকে মহেশের ভাইপো দাঁড়িয়েছিল ভোটে মহানের বিরুদ্ধে।

তাতে ফটিকদের জ্বালাটা বেশী হয়ে ওঠে, রতনবাবুরও সমর্থন ছিল, আর থানার নতুন দারোগা ঢোল গোবিন্দও এখন বুঝেছে বাদাবনে রতনবাবুকে খুশী রেখে চললেই তার প্রভূত লাভ, সে এখন রতনবাবুর লাইনে এসে গেছে।

তাই ফটিকের দল বিপক্ষের মিটিং বানচাল করার জন্য বোমও মারে, হৈ চৈ শুরু হয়, মেয়েদেরও অনেকে চোট পায়, শিখা এই ঘটনার প্রতিবাদ করে।

তখন জনতাও এগিয়ে আসে, আর মিটিং-এ বোমা মেরেছিল ওই ফটিকের দলই। শিখা বলে—লজ্জা করে না তোমাদের? মেয়েদের উপরও বোমা মারো?

জনতাই বলে—দে ব্যাটাদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে।

ফটিকের দল সেদিন চুপ করে সরে আসে। তবে শিখার জন্যই সেদিন ধরা পড়ে গেছল এটা তারা ভোলেনি।

কমলা সব শুনে বলে মেয়েকে—ওসব করতে গেলি কেন? জানিস ওরা বাজে ছেলে, গুণ্ডামি মস্তানি করে বেড়ায়, ওদের চটালি?

শিখা বলে—তাই বলে ওদের অন্যায়কে সহ্য করবো? প্রতিবাদ না করলে মাথায় উঠবে, রতনবাবুকেই জানাবো ওদের কথা।

রতনবাবু এখন খুবই খোস মেজাজে আছে, এলাকায় তার লোককেই জিতিয়েছে, চরণ ডাক্তারও খুশী।

ওই সরকারী হাসপাতালের ব্যাপারটা এখন চাপা পড়ে গেছে, আর মহান এখন নেতা।

চরণ বলে—রতনবাবু, এ মহানের নয়, আপনাদেরই জয়, একটা বেশ জমিয়ে বিজয়মিছিল বের করতে হবে, লোকে জানুক রতনবাবুর জয়ের কথা।

রতনের এখন ভেড়িও জোর চলছে, সারা মাঠ জুড়ে সবুজের দাক্ষিণ্য আর নেই। গ্রামের বহু বহু মানুষের জমি সে লিজ নিয়েছে, অবশ্য প্রথমেই বিঘে প্রতি নগদ হাজার টাকা করে দিয়েছে। কথা আছে ফি বছর বিঘে প্রতি দু হাজার করে টাকা দেবে।

অবশ্য বছর কয়েক চলছে ভেড়ি, পুরোটাকা কেউই পায়নি, দফায় দফায় দয়া করে দু পাঁচ'শ করে টাকা দিয়েছে মাত্র।

দিন চলে না তাদের, মাঠের ধানও আর নেই, চাষের গরু বলদও সব বেচে দিয়ে এখন অভাবের তাড়নায় রতনবাবুর বাহন নন্দ সরকারের কাছে আসে কাজের সন্ধানে সেই লোকগুলো।

তখন জমি নেবার সময় রতনবাবু প্রচার করেছিল সকলেই দৈনিক কাজ পাবে, এখন জমির দখল পেতেই আর চেনে না ওদের।

দয়া করে পাঁচ দশ জনকে কাজ দেয়, পরে তাদের হঠিয়ে অন্যদের কাজে রাখে কদিন, পরে তাদেরও হঠায়। ওই মানুষগুলো এবার বিপদে পড়েছে, বেশ বুঝেছে রতনবাবু প্যাঁচ করে তাদের সর্বস্ব গ্রাস করেছে।

এমনি করে রতনবাবু দেনার দায়ে জড়িয়ে ফেলেছে এলাকার জেলেদেরও। গাং-এ মাছের অভাব নাই, বাজার দর, চাহিদাও প্রচুর। রতনের বাবার আমল থেকেই রেওয়াজ চলে আসছে, রতনবাবুই গরীব জেলেদের জাল, নৌকা মায় খোরাকি দিয়ে গাং-এ মাছ ধরতে পাঠায়। দিনরাত-শীতের রাতে, বর্ষার উন্মাদ নদীর বুকে তারা নৌকা নিয়ে মাছ ধরে, সেই মাছ আড়তে আনে ঝুড়ি ঝুড়ি। চকচকে পমফ্রেট, পারশে, ভাঙন, সিলেট, ভেটকী আরও নানা মাছ।

সব মাছ কাঁটায় ওজন হয় আড়তে। তার হিসাবে টাকা পায়, তার থেকে জাল, নৌকা ভাড়া, খোরাকির টাকা কিস্তিতে কেটে নিয়ে বাকী যা হাতে পায় তাতে তাদের সংসার ঠিকমত চলে না।

ফলে তাদের দেনার দায়ও নন্দ সরকারের খাতায় বেড়েই চলে লাফিয়ে লাফিয়ে, ওদেরও মুক্তি মেলে না। জানে অন্যত্র মাছ দিলে অনেক দাম পাবে, কিন্তু তা করলে রতনবাবু জাল নৌকা খোরাকি আর দেবে না, তাই আধপেটা খেয়েও জাল টানতে হয় তাদের, প্রতিবাদ করতে মন চায়, কিন্তু সাহস নেই।

গদাই প্রতিবাদ করতে ফটিকরাই তাকে মাছ চোর বলে ধরে এমন মেরেছিল যে গোসাবার হাসপাতালে একমাস পড়ে থাকতে হয়েছিল, রতনবাবুও কিছু বলেনি।

রতন জানে বিজয় অভিযানের দরকার, জনতার সামনে একটা সমীহের ভাব সৃষ্টি করা দরকার। তাই ঘটা করে বিজয় মিছিলও বের হয়, মহানকে আবীর আর মালায় ভূষিত করে গঞ্জের পথে বিশাল শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ করে, রতনবাবু চলেছে আগে, চরণ ডাক্তার, নন্দ সরকার, হাটতলার অনেকেও রয়েছে।

চোঙ্গা ফুঁকে ঘোষণা করা হয়।

—রতনবাবুর জয়, মহান ঘোষ জিন্দাবাদ!

আমাদের নেতা—মহান ঘোষ, মহান ঘোষ—জিন্দাবাদ। ফটিকের দল মাথায় বীভৎস আবীরের রং আর আকণ্ঠ মদ গিলে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলেছে।

ওরা যেন এক অশুভ শক্তির জয়ধ্বনি দিয়ে সব শুভ চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে চায় এই গঞ্জের বুকে।

রতনবাবু সেদিন বাইরের ঘরে কাগজপত্র দেখছে হঠাৎ শিখাকে ঢুকতে দেখে চাইল, শিখাকে চেনে সে, কিন্তু আগেকার সেই ছোট মেয়েটা যে এখন এমন এক সম্পূর্ণ সুন্দর নারীতে পরিণত হয়েছে এ খবরটা রাখত না।

দেখছে রতন, আবাদ অঞ্চলে এমন সুন্দরী, বুদ্ধিদৃপ্তা তরুণী বড় একটা দেখা যায় না, গার্লস স্কুলে ক'জন শিক্ষিকা আছে, রতনের মনে হয় শিখা তাদের সকলের চেয়েই সুন্দরী।

রতনবাবু বলে—এসো, এসো শিখা, ওরে চা আন, বসো।

শিখা আজ এসেছে ওই ফটিকদের সম্পর্কে নালিশ করতে তাই বলে—না-না, চা টা থাক।

—আরে! থাকবে কেন? কতদিন পর এলে! মাস্টামশাই বলছিলেন বটে—গার্লস স্কুলে জয়েন করেছো, খুব ভালো কাজ করেছো, বুঝলে—এবার ওই মহানকে বলবে, প্রশ্নটা এসেম্বলীতে তুলুক, মেয়েদের হাই স্কুল করতেই হবে, নারী শিক্ষার প্রসার করা দরকার, আমার কাছে চলে এসো—যথাসাধ্য করবো তোমাদের স্কুলের জন্য।

শিখা বলে—শুনে খুশী হলাম, একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

—বলো, রতন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

শিখা বলে—আপনার ওই চ্যালাদের একটু সংযত হতে বলুন, এখানে ওখানে ঝামেলা করবে, বোম ফাটাবে, মেয়েদেরও মানসম্মান দেবে না, এসব কি ঠিক

কাজ? ভোটের সময় কি যে করল!

রতন জানে তার চ্যালাদের ব্যাপারটা, ওসব না করলে মহানকে জেতানো যেত না।

তবু শিখাকে খুশী করতে চায় রতন, রতনের মনে হয় ওই মেয়েটাকে দলে পেতে পারলে সব দিক থেকেই সুবিধা হয়।

ওকে টোপ হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে, তবে টাকা বেশী খর্চা করতে হবে ওকে দলে টানতে হলে। রতন ব্যবসা বোঝে, জানে বেশী টাকা লগ্নী করলেও অনেক বেশী টাকা সে তুলতে পারবে,

শিখাকে হাতে রাখা দরকার, তাই শিখার কথায় বলে ওঠে রতন,

—সেকি! বাঁদরগুলো এইসব করছে? না-না, এ খুবই অন্যায় শিখা। আমাকে বলে ভালোই করেছো, নাহলে ওই ফটিকের দল বেড়ে যেতো, বুঝলে? বেকার ছিলি, দয়া করে ডেকে চাকরী দিলাম, আর কাজ না করে এমনি অসভ্যতা করবে! আমি ওদের বলে দেব।

নন্দ সরকার ঢুকছিল খাতাপত্র নিয়ে, সেও দেখেছে শিখাকে এখানে আসতে, আর ফটিকদের নামেও নানা অভিযোগ করতে এসেছে, তাও বুঝেছে।

শিখা বলে—তাই বলবেন, সেদিন আমি না থাকলে কুলতলির হাটে ওদের মেরেই শেষ করতো, সেখানে বোম মেরেছিল মিটিং-এ।

রতনবাবু সবই জানে, তবু শিখার কাছে সাধু সাজার ভাণ করে বলে,

—ছিঃ ছিঃ এসব জানতাম না, বলে ভালো করলে, দেখছি ওই বাঁদরদের।

শিখা বলে—আজ যাই।

রতন বলে—এসো, দরকার পড়লেই চলে আসবে, ভাবছি মাস্টারমশায় তো রিটায়ার করবেন, তখন তো স্কুলে আর পাবো না তাকে, বাড়িতেই যেতে হবে। তবু তুমি যোগাযোগ রেখো।

শিখা চলে যায়, নন্দ বলে

—ফটিকদের ডেকে আনবো?

—কেন? রতন অবাক হয়, নন্দ বলে

—কি বলবেন যেন ওদের? কি সব বোমবাজী করেছিল?

হাসে রতন—নন্দ, ওদের কাজ ওরা করবে, করুক।

—তবে যে বললেন শিখাকে?

—ওসব বলতে হয়। ছাড়োতো! কই হিসাবপত্র দেখাও।

রতনবাবু জানে কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাই ও সবের কোন গুরুত্বই

আর দেয় না।

তবু কথাগুলো ফটিকদের কানে নন্দই পৌঁছে দেয়, ফটিকরা এসেছে আড়তে, মাছের ওজনের সময় ওরা থাকে, জেলেদের ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ কাঁটায় উঠলেই অদৃশ্য কারণেই তার ওজন অনেক কমে যায়।

অনেকে আপত্তি করে—এক কুইন্টাল হবে মাছ, আর বলছো মাত্র পঁচাত্তর কেজি! কি ওজন গো?

সেখানেই মার প্যাঁচ, কেউ দেখতে চাইলে ফটিক গর্জে ওঠে,

—কি হচ্ছে রে! এ্যা—ধরম কাঁটা বাবা, হঠো—এ্যই, অন্যের মাল চাপা।

অর্থাৎ তার প্রতিবাদের কোন গুরুত্বই দেয় না ওরা। কেউ বেশী জেদ করলে ফটিকই তাকে দুচার থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে শাসায়—খতম করে দেবো, ঝামেলা করবি না।

তারা জানে ওসব কাজ তারা পারে, তাই চুপ করেই যায় জেলেরা।

ক্রমশঃ ফটিকরাও বুঝেছে তাদের নাহলে রতনবাবুর সাম্রাজ্য চালানো যাবে না। তাই তারাও জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে চলে, হাটে তোলা তোলে নিজেদের মোটা কমিশন রাখে, আর তাদের উদ্যোগেই এখানে চোলাই মদের কারবারও শুরু হয়েছে। হাটের দিন তো তাদের ব্যবসা রমরমিয়ে চলে।

এ হেন ফটিকদের বলে নন্দ সরকার,

—ওই ক্যাদার মাস্টারের মেয়েটা তোদের নামে যা তা বলতে এসেছিল। রতনবাবুর কাছে কত নালিশ করে গেল।

ফটিক সিগ্রেটটা এখন কায়দা করে হাতের মুঠোয় ধরে টানে, আর অন্যহাতের থাবড়া দিয়ে ছাই ছেড়ে সিগ্রেটে লম্বা টান দিয়ে বলে—তা রতনদা কি বললো?

—তোদের কিছু বলেনি? নন্দ শুধোয়,

—না তো!

নন্দ বলে—তাহলে বলবে, মেয়েটার কি কথা? বলে তোদের—গুণ্ডা মস্তান, আরও কত কি!

ফটিক চুপ করে শোনে কথাটা, শেষে বলে

—ওটার তেল একদিন মেরে দিতে হবে, ফটিককে চেনেনি।

মন্টা বলে—গুরু! বলোতো একদিন খেল দেখিয়ে দিই।

বুলেট এদের দলে নতুন এসেছে, সে মস্তানি দেখাবার জন্য বলে—গুরুর নামে নালিশ করবে, এত বড় হিম্মৎ।

ফটিক বলে—এখন চুপচাপ থাক, পরে মৌকা বুঝে ঘা দিতে হবে ওটাকে,

আমাদের পিছনে কাঠি করবে?

সেদিন শ্যামপুরগঞ্জে হাটবারে হাট বসেছে, এইদিন হাটের মাঠ লোকজন—ফড়ে ব্যাপারীদের ভিড়ে ভরে যায়। নৌকাও আসে অনেক, গাং ভরে যায় নৌকার ভিড়ে, গোলাবীও সেদিন ভেড়ি থেকে টাটকা পোনা মাছ নিয়ে বসেছে, হাটে মাছ—আনাজপত্রও বেশ ভালোই আমদানী হয়।

খরিদ্দারেরও অভাব নাই, সপ্তাহে দুদিন হাট। বাকী দিনের আনাজপত্র সকলে হাট থেকেই কিনে রাখে।

শিখাও এসেছে হাটে। এখন কপি, বেগুণ মুলোর আমদানী ভালোই, শীতকালের শব্জী, শিখা দুটো থলেতে বাজার করে ফেলে বুঝেছে তারপক্ষে বোঝা দুটো ভারিই হয়েছে।

তাই গোলাবীদির কাছে একটা ব্যাগ রেখে যাবে, ওটা হাট শেষে সেইই পৌঁছে দেবে বাড়িতে, দু হাতে দুটো বোঝা নিয়ে শিখা মাছের বাজারের দিকে আসছে।

ওদিকে একটা বড় শিরিষগাছের ছায়ায় ফটিক দলবল নিয়ে দুপুরেই মদের আসর বসিয়েছে। এটা তাদের রাজত্ব, লোকজন প্রকাশ্যে মদ খাওয়া, ওদের হল্লা হৈ চৈ পছন্দ করে না। কিন্তু বলার সাহসও কারো নাই।

ওরা হাটবারে মদ গিলে ফিট্ হয়ে তোলা আদায় করে রতনবাবুকে কিছু দেয়, বাকীটা তাদের, রতননবাবুও ওদের এটা রোজকার করতে দেয়।

ওরা মদ গিলছে, কোথা থেকে মুরগী যোগাড় করে চাটও বানিয়েছে, হঠাৎ মণ্টা বলে ওঠে।.

—গুরু তোমার ওই শিখা, ওই যে, দুহাতে দুটো বোঝা টেনে আনছে, ফর্সা গাল লাল আপেল হয়ে গেছে গো।

দেখছে ওরা শিখাকে, হঠাৎ ফটিকের নেশার ঘোরেই কথাটা মনে পড়ে যায়, ওই শিখাই তাদের নামে যা তা বলেছে রতনদার কাছে।

ফটিক উঠে ওর দিকে এগিয়ে যেতে ওর চ্যালারাও মদের বোতল নিয়ে গুরুর পিছন পিছন চলতে থাকে।

শিখা হঠাৎ সামনেই ফটিককে দেখে চাইল, ফটিকের মুখে মদের গন্ধ, হাসছে পানের ছোব লাগানো দাঁত বের করে।

ফটিক বলে—আহা! কষ্ট করে এত বোঝা বইছো? এ্যাঁ—আমি কি মরে গেছি? শিখা! দাও, ওই বোঝা দুটো আমিই বয়ে দিচ্ছি।

—থাক! শিখা সরে যাবার চেষ্টা করে, এদিক ওদিকে চাইছে, দেখে ফটিক একা

নয়, তার চ্যালারাও তাকে ঘিরে ফেলে হাসছে।

ফটিক বলে—রাগ করছো কেন মাইরী? শুধু তোমার হাতের বোঝাই নয় বলতো—তোমার জীবনের বোঝাও এই ফটিক সারা জীবন ভোর বইবে, সে হিম্মৎ ফটিকের আছে সব শালা জানে।

শিখা অসহায় দৃষ্টিতে চাইছে, ফটিক তার কাছে এগিয়ে এসে বলে

—চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও, আজ ফটিক এর জবাব নেবেই।

শিখা তবু দৃপ্ত কণ্ঠে বলে—পথ ছাড়ো।

হাসছে ফটিক—পথ কেন তোমাকেও ছাড়বো না, এর জবাব দিতে হবে।

শিখা চাপা স্বরে বলে—ইতর, অভদ্র, পথ ছাড়ো, নাহলে চীৎকার করে লোক জড় করবো।

হাসে ফটিক—কি বলেরে মণ্টা এ্যাঁ—ফটিককে শাসাচ্ছে? সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম আজ ছাড়বো না, এই হাটের মধ্যেই হাড়ি ফাটাবো। এ্যাই মণ্টা—বুলেট, লিয়ে চল এটাকে নৌকায়, একটু নৌকাভ্রমণ করে আসি—তোল।

ওরা এগিয়ে আসে, শিখা দেখছে আশপাশের লোকজন সরে যাচ্ছে, কেউ ওর সাহায্যে এগিয়ে আসে না, ফটিক এবার ওর হাতটা ধরে ফেলেছে, বলে—চলো।

শিখা তবু প্রতিবাদ করে—হাত ছাড়ো!

ফটিক গর্জে ওঠে—ন্যাকামি রাখো, চলো বলছি—নাহলে ...

ওর বাকি কথাটা শেষ হয় না, শিখা দেখে ফটিকের লম্বা দেহটা হঠাৎ খানিকটা শূন্যে ছিটকে উঠে ওদিকে এক টমেটোওয়ালার টমাটোর ঝুড়ির উপর আছড়ে পড়ে আর মুখে মাথায় জামায় পাকা টমাটের বীচি-রসে মাখামাখি হয়ে যায়।

ওদিকে মণ্টা গর্জে ওঠে—কোন শালা রে—রং দেখাতে এসেছিস?

মণ্টাকেও ওই বলিষ্ঠ ছেলেটা সপাটে লাথি বসাতে মণ্টা টাউরি খেয়ে গিয়ে পড়ে কুমোরদের আনা মাটির হাঁড়ি কলসির উপর, সশব্দে হাড়ি মালসা ভেঙ্গে যায়। হাড়িওয়ালাও চীৎকার করে—সর্বনাশ হলো গো।

এদিকে এই কাণ্ড শুরু হয়েছে, হাটের লোকজন, দোকানদার দেখে ফটিকদের সঙ্গে কার লড়াই বেঁধেছে, সাংঘাতিক কাণ্ডই ঘটবে এবার, রক্তারক্তি কাণ্ড হবে।

তারাও ঝামেলায় থাকতে চায় না, তাই দমাদ্দম দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে থাকে, ব্যাপারীরাও নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। তারা ত অবাক! কার এত বড় হিম্মৎ যে ওই ফটিকদের দলকে এখানে এইভাবে মারবে?

ফটিকের দলও বুঝেছে এ তাদের ইজ্জতের সওয়াল। তারাও লড়ছে, কিন্তু ওই নবাগত ছেলেটির লড়াই এর ধরনই আলাদা, সে এদের মারগুলো এড়িয়ে আবার

মেরেছে ফটিককে, এবার ফটিক ছিটকে গিয়ে পড়ে গোলাবীর জ্যান্ত মাছের গামলার উপর। ফটিক পড়েছে তার গামলার উপর, কোমর পিঠ গামলাতে সেট হয়ে গেছে।

গোলাবীও দেখেছে ওই লড়াই, সে গর্জে ওঠে—এ্যাই ফটিক! এ্যাঁ—মাছ সব ছিটকে গেল আর ও পড়ে রইল আধমরা কাতলা মাছের মত আমার মাছের ডাবায়, ওঠ্ ওঠ্ মুখপোড়া!

ফটিকের কোমরে খুবই লেগেছে, ওঠার সাধ্য নাই, তবু উঠতেই হয়। ওদিকে বুলেটকে তখন ধরেছে নবাগত ছেলেটি। শিখা দেখছে ওই বদমাইসদের করুণ অবস্থা। ফটিক কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে মাথায় টমোটোর রস-বীচি, জামা প্যান্ট মাছের গামলার জলে ভিজে গেছে।

নবাগত ছেলেটি রকেটের ঘাড়টা ধরেছে, শুধোর

—তোর নাম কি রে? বল?

রকেট দেখছে সেনাপতিরাই ঠাণ্ডা, ফটিকের ওঠার সাধ্য নেই কোমর ধরে বসে আছে জল কাদায়। মণ্টা হাড়ি ভাঙার মধ্যে থেকে উঠে তেড়ে আসতে এবার একটা লাথিতে ছিটকে পড়ে নর্দমার কাদায়। রকেট ওই ছেলেটার কথার জবাবে বলে, —রকেট।

ছেলেটা বলে—বাবা রকেট, তুমি মাটিতে কেন, যাও শূন্যমার্গে ভ্রমণ করে এসো।

ওকে তুলে খড় ছোড়া করে ছুঁড়ে দিতে রকেট শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে আবার মাধ্যাকর্ষণের জন্যই সশব্দে নদীর জলে কাদাতে ছিটকে পড়ে মুখ গুজে, মুখতোলে তখন সব কাদায় ঢাকা।

ফটিক বুঝেছে এখন লড়াই করা সম্ভব নয়, মণ্টাও নর্দমা থেকে ওঠে কোনদিকে পালিয়েছে কে জানে, বুলেটও নদীর পলি থেকে উঠেছে মুখচোখে কাদার প্রলেপ, শূন্যে হাতড়াচ্ছে সে অন্ধের মত। আরও দুটো চ্যালা ছিল তারা এই ফাঁকে সটকেছে, ফলে ফটিকও প্রাণের দায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে রণে ভঙ্গ দেয়।

একাই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি।

শিখা দেখছে ওকে। এতদিন পর ওই ফটিকদের অত্যাচারের জবাব দিয়েছে ওই ছেলেটি, সেইই বলে শিখাকে।

—এবার যাও, ওরা আর ঝামেলা করবে না।

শিখা কোনমতে চলে যায়, ছেলেটির প্রতি কৃতজ্ঞ সে, হাটের এত মানুষের মধ্যে থেকে কেউ এগিয়ে আসেনি তার ইজ্জৎ বাঁচাতে, ওই অচেনা ছেলেটিই আজ তার

মান সম্মান বাঁচিয়েছে। শিখা নীরবে চলে আসে।

গোলাবী এতক্ষণে তার পলাতক মাছগুলো বন্দী করেছে, দেখে ফটিকরা পালিয়েছে। এবার আবার হাটতলার বন্ধ দোকানের ঝাঁপ খোলে, ওদের কেনাবেচা শুরু হয়। হাটের লোকজন আবার ফিরে আসে।

বলে গোলাবী—বাবু, ওদের মারলে, জানো ওরা কে?

—কে? ছেলেটি শুধোয়—কারা ওই ছুঁচোর দল?

—ওরা রতনবাবুর লোক, এলাকার লোকজন ওদের ভয় করে, তুমি গোখরা সাপের লেজে পা দিয়েছো, ওরা বাদাবনের বাঘ, ওরা তোমাকে এখানে দেখলে ছাড়বে না, তুমি এই গঞ্জ ছেড়ে যত শীগ্‌গিরী পারো পালাও।

হাসে ছেলেটা—ওরা বাদাবনের শিয়াল না বাঘ কি তাতো দেখলে। বিশ্বাস হল না?

গোলাবীরও অজান্তেই ওই ছেলেটির উপর কেমন মায়া পড়ে গেছে, বলে সে—তবু তোমার ভালোর জন্যে বলছি, তুমি এখানে থেকো না, পালাও।

ছেলেটা ওর কথাতে তেমন গা করে না, বলে

—কাজের সন্ধানে এসেছি, কাজ না খুঁজেই পালাবো? দেখা যাক।

ছেলেটা ওদিকে ভেড়ির পথ ধরে চলে গেল, ওর দিকে চেয়ে থাকে গোলাবী, ছেলেটা এখানে থাকলে ভালোই হতো।

নন্দ সরকার হাটের গদি ঘরে বসে সব ব্যাপারটাই দেখেছে। ওই ছেলেটা বোধহয় এখানে নতুন, হাটবারে এমন কত লোক আসে যায়।

কিন্তু ছেলেটা একাই ওই ফটিকের দলকে যেভাবে মেরে ঠাণ্ডা করে দিল তাতে চমকে উঠেছে নন্দলাল। কে জানে ফটিকরা যদি তার গদি ঘরে আসে ওই ছেলেটা তাকেও আড়ং ধোলাই দিতে কসুর করবে না। তাই মারপিট বেশ জমে উঠতে দেখে নন্দও গদির ঝাঁপ বন্ধ করে সটান রতনবাবুর মাছের আড়তে এসে হাজির হয় হাঁপাতে হাঁপাতে।

রতন তখন মাছের হিসাব দেখছে।

ওকে দেখে বলে—হাটতলা ছেড়ে এখানে কেন?

নন্দ বলে—আজ্ঞে সেখানে ধুন্দুমার কাণ্ড শুরু হয়েছে, ওরে বাবা!

—কি হল?

নন্দ তখনও সেই মারপিটের আতঙ্কটা কাটাতে পারেনি সে বলে,

—আজ্ঞে পাট আছড়ানি শুরু হয়েছে।

রতন ধমকে ওঠে—কি হয়েছে বলবে তো, কে কাকে আছড়ালো?

—আজ্ঞে ফট্‌কে, মণ্টা—বুলেটদের একবারে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়েছে ছেলেটা, ফটকে তো ল্যাংচাচ্ছে, মণ্টা নর্দমায় আর বুলেট গাং-এর পলিতে চোখ বুজে কি হাতড়াচ্ছে।

একাই ছেলেটা ভেল্কি দেখিয়ে দিল আজ্ঞে!

এর মধ্যে ফটকের দলও মারধোর খেয়ে লেংচে লেংচে—কেউ কপাল ফাটা নিয়ে এসে হাজির হয় আড়তে।

চরণ ডাক্তারও হাটতলাতেই ছিল, সেও ভাবতেই পারেনি যে একটা ছেলে ওই ফটিকদের মত পাকা মস্তানদের এইভাবে মারবে।

চরণ জানে ওরা রতনবাবুর কাছের মানুষ, দরকারী মানুষ, ওদের মেরামত করতে হবে তাকেই, তাই চরণও ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে ওদের পিছুপিছু এসেছে।

ফটিকেরা আড়তের ওদিকের চালায় শুয়ে পড়েছে, মণ্টার কপালে দোকানের বাঁশ লেগে কেটে গেছে গভীরভাবে, হাঁড়িভাঙ্গার টুকরো ফুটে রক্ত ঝরছে হাত থেকে। বুলেটের মাথার চুলে, জামায় শুকনো পলি কাদার দাগ, হাটুটায় চোট পেয়েছে ফুলে উঠেছে। রতন এসময় চরণ ডাক্তারকে দেখে বলে—তুমি এখানে?

চরণ বলে—ফটিকদের মেরে চোট করেছে একটা ছেলে! ফটিকদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ওদিকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে বলে চরণ,

—ওমা, ফটিক তোর কোমরের হাড় ভাঙ্গে নিতো? মণ্টা—ইস তোকে ড্রেস করতে হবে রে, এন্টিটেটেনাস ইনজেকশনও দিতে হবে, হাত কপাল যে ফেটে গেছে রে. বুলেট—দেখি তোর হাটুটা, হেভি ফুলেছে, কি দিয়ে যে মেরেছে?

রতনও এর মধ্যে সব শুনে এগিয়ে এসে ফটকেদের দেখে বলে

—মেরেছে বেশ করেছে, শেষ করতে পারেনি কেন? অকম্মার দল, খুব তো ফুটানি করিস, একটা কে না কে এসে একাই তোদের লাশ বানিয়ে দিল এই মাটিতে—এ্যা!

ফটিক বলে—আচমকা ঝাড়লো।

মণ্টা বলে—নাহলে দিতাম ব্যাটাকে ফাঁসিয়ে, আজ না হোক একদিন বাগে পাবোই।

রতন গর্জে ওঠে—থাম! সারা হাটের লোক, গঞ্জের লোক বুঝে গেল তোদের মুরোদ, এবার বেরুলেই ওরাই তোদের মারবে।

চরণ জানে এখানে ইনজেকশন, ব্যাণ্ডেজ করতে পারলে কিছু আমদানীও হবে,

রতনবাবুর মন জয় করাও যাবে। তাই বলে—এখন ওদের মেরামত করি? চোট তো ভালোই লেগেছে।

ব্যাগ থেকে সে যন্ত্রপাতি বের করছে, রতনবাবু বলে

—থামোতো ডাক্তার, মরুক শালারা, ওসব ওষুধ ইনজেকশন এর দরকার নাই। কুত্তার ঘা কুত্তা চেটেই সারায়, তুমি যাও তো।

চরণ বলে—কিন্তু!

রতনবাবুর মন মেজাজ ভালো নেই। ও বুঝেছে এতদিন যে ভয় দেখিয়ে এখানের মানুষের সর্বস্ব লুটেছিল, সেই ভয়টাই একটা অজানা অচেনা ছেলে এসে সারা গঞ্জের মানুষের মন থেকে মুছে ফেলেছে।

এই ফটিকের দলকে দেখিয়ে আজ জনসাধারণকে ভয় দেখানো যাবে না। তার কাজেও বাধা আসবে। রতন বলে ওঠে চরণের কথায়—রাখো তোমার ডাক্তারী, যাও তো, ওদের যা হবার হোক। যাও তুমি—নাহলে তোমার চিকিৎসা করার জন্যই এবার লোক খুঁজতে হবে।

চরণ বুঝেছে রতনবাবুর মেজাজটা এখন ভালো নেই।

সে ব্যাগপত্র নিয়ে চলে যায়। রতনও ফটিকদের দিকে চেয়ে শেষবারের মত বলে—পড়ে থাক্ ওখানে, অকম্মা, নেংটি ইদুরের দল।

রতন বেশ রেগেই ঢোকে ওর ঘরে। নন্দ সরকার চুপ করে ওদিকে খাতাপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রতন চেয়ারে বসে একগ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে দম ফেলে চাইল নন্দের দিকে।

শুধোয়—ছেলেটা কে? কি নাম?

নন্দ বলে—এখানে নতুনই মনে হলো, আগে কখনও দেখিনি, নামও শুধোইনি। যা লড়লো!

—থামো! তুমিও অকম্মা, তোমাকে ঘা কতক দেয়নি কেন ছেলেটা?

নন্দ রতনের ধমকানিতে চুপ করে যায়, রতন বলে

—ওই ছেলেটাকে আমার চাই।

নন্দ ভাবে মালিক ওকেই সযুত করতে চায়, তাই বলে

—কেন? ওকে ঘা দেওয়া একটু কঠিন কাজই, বাদাবনের বাঘ ওটা!

রতন বলে—তাই ওকে চাই, এইসব অকম্মা নেংটি ইদুরের দলকে দিয়ে কাজ আর চলবে না। এদের মুরোদ সবাই বুঝে গেছে, আমার কাজ কর্ম চালাতে গেলে এদের মাথার উপর অমনি কাউকেই চাই, ওই ছেলেটার খোঁজ করো।

নন্দ এবার বলে—দেখি খোঁজ খবর করে যদি এখানে থাকে ঠিক নাম-পাত্তা সব

খুঁজে বের করবো।

—তাই করো। দাও খাতাপত্র।

খাতাপত্র দেখতে থাকে রতন, কাজে ঠিক মন বসে না, তার মাথাতে ওই কথাটাই ঘুরে ফিরে আসে।

বৈকালের দিকে বের হয়েছে রতন বাড়ির দিকে, সন্ধ্যায় মহান আসবে বাইরের দু'একজনকে নিয়ে, রাতের কাজ কারবার এখন ভালোই চলছে রতনের। কিন্তু আজকে ওই নতুন ছেলেটা এসে সব হিসাব কেমন গোলমাল করে দিয়েছে।

নন্দও চলেছে মালিকের সঙ্গে।

বসতি ছেড়ে ভেড়ি বাঁধ ধরে তারা চলেছে চিংড়ি ভেড়ির আলাঘরের দিকে, দামী মাছে ভেড়ি বোঝাই হয়ে আছে, রয়েছে কয়েক লাখ টাকার চিংড়ি, তাই নজর রাখার জন্য লক্‌গেটের কাছে প্রধান পাহারা ঘর, বাঁধের চারদিকে মাঠের মধ্যেও বাঁশপুতে ছাউনি দিয়ে কয়েক ফিট উঁচুতে ঘর বানিয়ে সেখানে লোকজন পাহারায় থাকে সঙ্গে থাকে রাতের বেলায় জোরালো টর্চ আর বন্দুকও।

ফটিকের দলের অনেকেই সেই পাহারার কাজে থাকে। লক্‌গেটের ওদিকে শুধুমাত্র মথুরের সেই বাড়ির ধ্বংসস্তূপটা পড়ে আছে, দীর্ঘদিন হলো ওটা ওইভাবেই পড়ে আছে ঢিবি হয়ে, ঘরের চিহ্ন আর নাই, শুধু অতীতের জনবসতির সাক্ষী হয়ে টিকে আছে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ।

ধ্বসে পড়া মাটিতে গাছটাই সবুজের সম্ভার নিয়ে নির্জনতার মাঝে নিঃসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লোকে বলে—মথুরের ভিটে, আজ সেখানে আর কেউ নাই, মথুরের সবাই ফৌত হয়ে গেছে।

রতনবাবু চলেছে, পিছনে নন্দ, হঠাৎ নন্দ চমকে ওঠে, ভেড়ির ওদিক থেকে সেই ছেলেটাই আসছে, সেই প্যান্ট, ময়লা জামা পরণে, উস্কোখুস্কো চুল, ঢোলা জামা।

নন্দ বলে ফিসফিসিয়ে—মালিক, ওই যে ওই ছেলেটা, ওই যে কৃষ্ণচূড়াগাছটার কাছ থেকে বাঁধে আসছে। ওই!

রতন চাইল, দেখে বলিষ্ঠ পেটা দেহ ছেলেটার।

নন্দ জানায়—ওই ফটকেদের একা পেঁদিয়েছে।

রতনও চেয়ে থাকে, ছেলেটা সতেজ ভঙ্গীতে এগিয়ে আসছে পথ ধরে,

রতন বলে—এখানে নতুন বুঝি, ঠিক চিনলাম না?

ছেলেটা বলে—হ্যাঁ। নতুন এসেছি।

ছেলেটাও দেখছে রতনকে কি সন্ধানী দৃষ্টিতে, নন্দ বলে,

—হ্যাঁ করে দেখছ কি? উনি রতনবাবু, এখানের মস্ত লোক, এই যে ভেড়ি, হাটতলায় আড়ত, ওই যে সব গুদাম ঘর, ধান কল দেখছ এসব ওরই, পেন্নাম করো।

ছেলেটা কি ভেবে ভব্যিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে,

রতন কথাটা শুনেছে ওর, ভেবে নেয় মনে মনে যে চাকরীর ওর দরকার তাই বলে—তা কাজকর্ম কিছু করবে,

ছেলেটা বলে—না, তেমন চান্স পেলাম কই স্যার, আপনি তো শুনলাম মস্ত লোক, বিগ্‌ম্যান, তা দেবেন একটা কাজকম্মো? সব কাজই পারি স্যার, বলেন তো দিন রাতই কাজ করবো।

রতনের ভালো লাগে ওর কথাবার্তা। ছেলেটার হাত পা যেমন চলে মুখও তেমনি চলে, বেশ চালুই। এমনি কাজের লোকই সে খুঁজছে। আর ছেলেটাকে নিজের থেকে কাজের কথা বলতে দেখে রতন বলে—ঠিক আছে, কাজ আমি তোমাকে দেব। মাইনে ভালোই পাবে, আর ভালো কাজ দেখাতে পারলে উন্নতিও হবে। নাম কি?

ছেলেটা বলে—আজ্ঞে মানিক?

রতনবাবুর বলে—ভালো নাম মানিক।

হাসে ছেলেটা—তা কাজটা কি?

রতন বলে—আমার ব্যবসার দেখভাল করতে হবে, ক্রমশঃ সবই জানতে পারবে মানিক, মাসে হাজার পাঁচেক টাকা করে পাবে।

ছেলেটাও খুশী হয়—এ্যাঁ, ফাইভ থাউসেন্ড, ঠিক আছে স্যার, ওসব কাজও চটপট শিখে নেব। বুঝলেন স্যার জিন্দেগীতে ঠেকে ঠেকে অনেক কিছু শিখেছি, ওসবও শিখে নোব।

রতনবাবু জানে ছেলেটা পারবে ওসব কাজ, তবে দুচার দিন বাজিয়ে নিয়ে তবে তার অন্য ব্যবসার কাজে লাগাবে, এখন আড়তেই রাখবে কিছুদিন।

বলে রতন—কাল চলে এসো সকালে, নদীর ধারে মাছের বড় আড়ত ওখানেই এলে সব কাজ কম্ম বুঝিয়ে দেব।

রতন পকেট থেকে একটা বাণ্ডিল বের করে দেয়।

—হাজার খানেক টাকা রাখো আগাম। তাহলে ওই কথাই রইল।

—চেনা নাই, শোনা নাই ওয়ান থাউজেন্ড আগাম দিচ্ছেন, যদি কেটে পড়ি স্যার? টাকাতো আপনার জলে যাবে।

রতন বলে—শোন, জলের গভীর থেকে মাছের সন্ধান করে তার ব্যবসা করি,

জলের মাছকে চিনি—ডাঙ্গার মানুষকে চিনবো না? আমি মানুষ চিনি হে! —রতনে রতন চেনে, মানিককে তাই ঠিক খুঁজে বের করেছি, কাল এসো ।

চলে যায় রতনবাবু ওদিকে বাঁধের আড়ালে আর তাকে দেখা যায় না, হঠাৎ একটা হাসির শব্দে চাইল ছেলেটা এদিকে। দেখে হাটতলার সেই যৌবনবতী মাছউলি, মেয়েটার চাঁছাছোলা গলার হাঁক শুনেছে হাটে—মাছ তো লয়, পরী, জলপরী গো, লগনচাঁদারাই খাবে পায়রা চাঁদা। টাটকা গো—লড়ছে,

সেই মেয়েটা বোধহয় হাটের কাজ সেরে পড়ন্ত বেলায় বাড়ি ফিরছে।

ছেলেটা ওকে দেখে শুধোয়—হাসছো যে?

গোলাবী দেখেছে হাটতলায় ছেলেটার এক তেজস্বী রূপ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ওই শয়তানদের কঠিন আঘাতই দিয়েছে, আর এখানে দেখেছে ওই ছেলেটাই এক গাল হেসে ওই শয়তানদের গুরু রতনবাবুর চাকরীই নিল, টাকাটা নিল তার কাছ থেকে হাত পেতে।

বলে গোলাবী—হাটতলায় তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি সত্যিই বাদাবনের বাঘ, কিন্তু এখন দেখছি বাঘ নও বাদাবনের লোভী শিয়ালই।

—কেন? চাইল ছেলেটা।

গোলাবী বলে—ওই বাদাবনের শয়তাদের ছুঁড়ে দেওয়া টুকরো পচা মাংস আর হাড় পেয়েই খুশী হলে? ওদের কাছে, ওই অন্ধকারের জীবদের কাছে কুত্তার মত ল্যাজ নেড়ে চাকরী করতে গেলে?

এতবড় কথাটাও ছেলেটার মনে কোন ভাবান্তর আনে না, সে হাসতে থাকে, বলে,

—সব পোড়া পেটকা লিয়ে? বাঁচতে হবে তো! এতগুলো টাকা।

গোলাবী চটে ওঠে, বলে—থাক, থাক, ছুচোর চাকর চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দ সিকে, টাকার লোভেই মজে গেলে? বাইরেই ফুটানি—থুঃ!

গোলাবী ক্ষোভভরে কথাটা বলে চলে যায়।

ছেলেটা হাসছে, মনে মনে খুশীও হয়েছে সে, নিশ্চিন্তও বোধ হয় তাকে।

নগা এখন নিজেই দুটো নৌকা করেছে, গঞ্জের মাল বয়, কখনও মাছও ধরে, অতীতের কথাগুলো ভাবার সময়ও তার নাই, তবু মনে পড়ে মাঝে মাঝে সেইসব দিনের কথা। শিখাদিকে দেখে মনে পড়ে আগে ছেলেবেলায় সে, রাজা আর শিখা তিনজনে কারো ডিঙ্গি ঘাটে বাঁধা দেখলে খুলে নিয়ে গাং-এ চলে যেতো, ডিঙ্গির মালিক এসে চেল্লামেল্লি করে তাদের ফিরিয়ে আনতো।

সে সব দিন কবে হারিয়ে গেছে, এখন শিখাদি অনেক পড়ালেখা শিখে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করছে, মাঝে মাঝে দেখা হয়।

নগা নিজের কাজেই ব্যস্ত। একটা নৌকাকে ডাঙ্গায় এনে পুরোনো আলকাতরা তুলে কিছু কাঠ বদলে আবার রং করছে, আগুন জ্বেলে নৌকাটাকে কাৎ করে তুলে বাঁশের খুঁটি পুঁতে নদীর ঢালে আটকে সে আলকাতরা গরম করে লাগাচ্ছে, পাটএ আলকাতরা মিশিয়ে পুডিং দিয়ে নৌকার ফাঁক ভরাচ্ছে।

কাজের ফাঁকে নগা একটা মাটির হাঁড়িতে ধেনো মদ কিনে এনে মাঝে মাঝে কলসী থেকে গলায় মদ ঢেলে চলেছে।

মদ না হলে কাজ করতে পারে না। নেশা তার হয় না, ওতে উদ্যম বাড়ে। নগা দু'হাতে কলসীটা ধরে মুখে তাজা মদটা ঢালছে, হঠাৎ একটা ঢিল জোরে এসে মাটির হাঁড়িতে লাগতে মাটির হাঁড়িটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে সব মদ নগার মুখে গায়ে, গড়িয়ে পড়ে আর হাঁড়ির কানাটা ওর দুহাতে ধরা—তলাটা আর নেই মদে চান করে গেছে নগা। এমন হেনস্থায় নগা গর্জে ওঠে—কুন শালা রে?

চেয়ে দেখে সামনে একটি প্যান্ট পরা তরুণকে, হাতে গুলতি, সেই গুলতির গুলিই তাব মদের কলসীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে, ছেলেটা হাসছে নগার ওই দশ দেখে। নগা চমকে ওঠে, ওই নিপুণ গুলতি ছোঁড়া দেখে, ওই হাসি তার খুবই চেনা।

মনে পড়ে যায় ছোট রাজার মুখ, ওইভাবে হাসতো, এমনি গুলতি ছুড়তে পারতো, কবে সে হারিয়ে গেছে গঞ্জ থেকে। এতদিন পর আজ আবার ফিরেছে সে।

নগা দেখছে ওকে, ছেলেটা ওর কাছে এগিয়ে আসে, নগা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে—রাজা! ওরে রাজা!

রাজা চমকে চারিদিকে চাইল, উৎফুল্ল নগাকে টেনে নৌকার আড়ালে বসিয়ে বলে—চুপ। একদম চুপ।

নগা অবাক হয়—কেনে? কেনে রে রাজা? তাহলে তুইই হাটতলায় ওদের—

রাজা বলে—এখানে আমি এখন মানিক। ওরা রাজাকে কেউ চিনতেই পারেনি, গোলাবীদি, মায় রতনবাবু, শিখাও।

নগা হাটতলার ব্যাপারটা শুনেছে, জানে নগা রতনবাবু নিজে চায় না রাজা এখানে ফিরে আসুক, তাই বলে নগা।

—কিন্তু এখানে তোকে ওরা যদি চিনতে পারে বিপদ হবে তোর!

রাজা বলে—রতনবাবু নন্দ সরকার কেউ চিনতেই পারেনি, রতনবাবু নিজে আমাকে ওর ওখানে চাকরী দিয়েছে,

—সেকি! তুই ওখানে চাকরী করবি? ওর নোংরা কারবারে? নগার কথায় রাজা

বলে—ও আমার সব কেড়ে নিয়েছে, বাবাকে ওই খুন করিয়েছে, মা বোনটাকেও গুম করেছে, দেখলাম সব জমি কেড়ে নিয়ে সেখানে ভেড়ির লকগেট আলাঘর করেছে। ওর সব হিসাব আমাকে পাই পাই করে চুকিয়ে দিয়ে ওর চরম সর্বনাশ করতেই হবে, তাই বাঘের ঘরে ঘোগ হয়ে ঢুকেছি, একথা কেউ জানবে না, তোকেই বললাম।

নগা দেখছে রাজাকে, রাজা বলে—আর তোকে সঙ্গে চাই নগা।

নগারও সব কেড়ে নিয়েছে রতনবাবু।

শুধু নগারই নয়, ওই রতনবাবু এই এলাকার মানুষের শত্রু। নগাও চায় এবার অন্যায়ের প্রতিবাদ হোক, সে একা পারেনি, আজ রাজাকে দেখে মনে হয় রাজা পারবে এই কাজ করতে।

তাই বলে নগা—তোর সঙ্গে আছি রাজা, এ কাজ করতেই হবে, রতনবাবুকে ঘা মারতেই হবে রাজা।

রাজা বলে—রাজা নয়, বল মানিক, তোর নতুন বন্ধু।

হাসে নগা—তাই হবে, মানিকই সই, চল—আমার ওখানে।

মানিক বলে—না, না। দেখা হবে আমাদের ঠিক সময়ে, ঘাটের এখানে তোর বাড়িতেও। তোর নৌকা কটা?

—দুখানা, জানায় নগা।

মানিক বলে—টাকা আমি দোব, আরও দু'একখানা নৌকা কিনে রাখবি, আর যাদের ভরসা করতে পারিস তাদের দলে নে, এখন মাল বাইবি, পরে দেখা যাবে, এখন থাকার জন্য একটা ঘর তো চাই।

নগা কি ভেবে বলে—চল, হাটতলার ওদিকে আমাদের একটা ঘর আছে।

মানিক বলে—ভাড়াই দেবো কিছু নিতে হবে কিন্তু, বলবি নতুন মানুষকে ভাড়া দিইছি।

নগা হেসে বলে—চলো মানিকবাবু।

শিখা বাড়ি ফিরে যাবার আগেই হাটতলার গোলমালের খবরটা হাওয়ায় ভেসে কেদারবাবুর বাড়িতেও পৌঁছে যায়, কেদারবাবু সবটা শোনেননি, লোকটা যে খবর এনেছে সেও সবটা শোনেনি।

সে বলে—হাটতলায় শিখাদিকে ওই ফটিকের দল কি বলেছে, তারপরই লেগে যায় যুদ্ধ।

কমলাদেবীও ভয় পেয়ে যায়। বলে সে

—একটু খবর নাও বাপু, বলেছিলাম শিখাকে ওই শয়তানদের ঘাঁটাস না। কথা শুনলো না, এখন কি হবে?

কেদারবাবু ছাতাটা টেনে নিয়ে বলেন—দেখি গে কি হলো? দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে এখানেও। এসব তো ছিল না।

কমলাদেবীও ভাবনায় পড়ে।

—সত্যি, শিখাকে বলো, এখানে আর নয়, কলকাতায় চাকরীর সন্ধান করছিল, সেখানেই দরখাস্ত করুক, চলো বাপু—চলেই যাই এই বাদাবন থেকে।

কেদারবাবু বলেন—দেখে আসি ব্যাপারটা কি, তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।

বেরুতে যাবেন কেদারবাবু, এমন সময় শিখাকে ওই ব্যাগ নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরতে দেখে চাইলেন কেদারবাবু।

—কি ব্যাপার রে? হাটতলায় কি সব গোলমাল হয়েছে?

কমলা বলে—কে কি বলেছিল তোকে, কিছু হয়নি তো?

শিখা ব্যাগ রেখে ঘাম মুছতে মুছতে এবার ঘটনাটা বর্ণনা করে।

বলে সে—রতনবাবুর পোষা গুণ্ডার দলকে একটি ছেলে একাই সযুত করে দিয়েছে।

কেদারবাবু অবাক হন, —সে কি!

—হ্যাঁ বাবা, ওদের সব কটাকে শুইয়ে দিল, বাছাধনরা টের পেয়েছে এবার গঞ্জে একজন অন্ততঃ এসেছে যে ওদের সিধে করতে পারে।

কমলা বলে—একটা ছেলে ছিল, সে রাজা।

কেদারবাবু বলেন—কোথায় সে হারিয়ে গেল, ও থাকলে আজ আমাদের একটা বড় নির্ভর থাকতো, তেজী-সাহসী-তেমনি মেধাবী ছেলে একেবারে নিখোঁজ হয়ে গেল এখান থেকে।

শিখার মনের অতলেও একটা নীরব অভিমান, বেদনা রয়ে গেছে, তার আশা ছিল রাজা অন্ততঃ তার জন্যও ফিরে আসবে, কিন্তু রাজার আর কোন খোঁজই কেউ পায়নি। সে ফিরেও আসেনি।

শিখা বলে—সেও তো আমাদের খবর নিতে পারতো বাবা! তাকে তো খুব ভালোবাসতে। সে তো একেবারেই ভুলে গেল আমাদের, যে ভুলে থাকতে চায় তার কথা মনে এনে লাভ কি বাবা, তাকে ভুলে যাওয়াই ভালো।

কেদারবাবু বলেন—হয় তো তাই রে, তবু মন মানে না, হ্যাঁ, তা এ ছেলেটির নাম কি?

—তাতো জানি না, মারপিট করে ওদের ঘায়েল করে আমাকে বল্লে—সোজা

বাড়ি চলে যাও, চলে এলাম!

কমলা বলে—ভালোই করেছিস, এরপর কি গোলমাল হবে কে জানে?

কেদারবাবু বলেন—তুই তো বেশ, যে তোকে এতবড় বিপদ থেকে বাঁচালো তাকে সঙ্গে করে আনলি না কেন? আলাপ করতাম, তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। তা কোথায় এসেছে সে? কি নাম?

শিখা বলে—ওসব জানি না, এখানে থাকলে দেখা হবেই, ছোট জায়গাতো, তখন নিয়ে আসবো, আলাপ পরিচয় হবে।

কেদারবাবু বলেন—তাই আনবি মা, এমন তেজী সাহসী ছেলের এখানে দরকার, যা সব কাণ্ড চলেছে তার প্রতিবাদ জানাবারও কেউ নাই।

কমলা বলে—কেন? তোমার মহান!

—তখন তো বলেছিলে খুব সৎ সাহসী ছেলে, এখানের লোকের অনেক উপকার করতে পারবে?

কেদারবাবু বলেন—সে তো নুনের পুতুল গো, সমুদ্র মাপতে এসে সমুদ্রের জলেই মিলিয়ে গেল, এখন রতনবাবুর দয়াতে নেতা হয়ে বিরাজ করছে শহরে, দেশসেবা সেখানেই করছে।

শিখাও চেনে মহানকে, বলে

—এখন কাকে বিশ্বাস করবে বাবা? সকলেই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে ভণ্ডামির মুখোস পরে, সুয়োগ এলেই ওই স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাপারে মুখোস খুলে তখন আসল রূপ বের করে।

কেদারবাবু বলেন—সকলেই তাই নয় রে, সমাজে এখনও সত্যিকার মানুষ কিছু আছে, সবাই মেকি নয়, তুই এই ছেলেটির সন্ধান পেলে একদিন নিয়ে আয় ওকে।

শিখা তার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সে ভাবে কলকাতায় কোন চাকরী পেলে এম এ-টা করে নেবে, সুযোগ পেলে পি এইচ ডি-ও করবে, এই আবাদে পড়ে থাকতে মন চায় না, এখানে তার কোন আকর্ষণই নাই।

শহরেও দু চার জায়গায় দরখাস্ত দিয়েছে, স্বপ্ন দেখে এই আবাদ ছেড়ে শহরেই গেছে সে। এখানের পরিবেশও বিষিয়ে তুলেছে ওই রতনবাবুর দলবল, হাটের কেলেঙ্কারীর কথা ভুলতে পারে না, মনে পড়ে ওই ছেলেটি সেদিন সময়মত এসে না পড়লে তার কি সর্বনাশ হতো কে জানে? ছেলেটির কাছে কৃতজ্ঞতাও জানানো হয়নি, ছেলেটির কথা মনে পড়ে, কিন্তু কোথায় খুঁজবে তাকে জানে না শিখা।

মানিকবেশী রাজা এসেছে রতনবাবুর আড়তে। তখন জেলেদের সঙ্গে সরকারের

মাছের ওজন, দাম এসব নিয়ে চেঁচামেচি চলছে।

মহেশ বলে—দু ঝুড়ি মাছ, ওজন হলো মাত্র এক কুইন্টাল সাত কেজি, আর গোসাবার আড়তে পারসে, ভেটকির দর গেছে কাল সাড়ে তিনশো টাকা, ইখানে দিছ আড়াইশো টাকা, বাজার দর তো ঠিক করে ধরবে?

একজন বলে—জাল ভাড়া নৌকাভাড়াও অনেক বেশী ধরছো, এসব কেনে লিবা?

রতন বলে—বাপধনরা আমার এই দর, এতে না পোষায় অন্য আড়তে, অন্য মহাজনের কাছে যা, তবে আমার সব দেনা মিটিয়ে যেতে হবে বাবারা, আমার টাকা ফেলে দে—যেখানে খুশী মাছ দিবি। এত টাকা পড়ে আছে তোদের কাছে, তার সুদ, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ তো দিতে হবে।

জেলেদের মুস্কিল সেখানেই, তবু কে বলে

—এত টাকা রোজ কেটে নাও, সিটা যায় কুথায় গো? তবু দেনা শোধ হয় না তোমার?

—ই যেন গলায় কালফাঁস লাগিয়েছো রতনবাবু।

ওদের মুক্তির কোন পথ নাই, তাই জেনেশুনেই ঠকতে হয় এখানে, আধপেটা খেয়ে জাল হাতে নিয়ে দুস্তর গাং-এ মাছ ধরতে হয়, তবু দিন বদলায় না তাদের, তাদের রক্তঘামই ঝরে, লাভ হয় রতনবাবুর।

রাজা এই ব্যাপারটা ছেলেবেলাতেও দেখেছে এখানে, তাই তার বাবা মাছ ধরা ছেড়েই দিয়েছিল, আজও রতনের সেই অত্যাচার সমানে চলেছে, জেলেদের শোষণ করেই চলেছে রতন।

এছাড়াও এখন গ্রামের মানুষ যারা ওই চিংড়ি ভেড়ির জন্য রতনকে জমি দিয়েছিল তারাও বুঝেছে রতনবাবু তাদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে চাষের উর্বরা হাসিল জমি কেড়ে নিয়ে নোনা জল ঢুকিয়ে সেই জমিকে শেষ করেছে। আর বছরে যে টাকা দেবে বলেছিল তা কাউকে দেয়নি। অথচ জমি এখন সব তার ভেড়ির মধ্যে, হাঁটুভোর নোনাজলের নীচে। মহেশ, হরষিত, নবীন সাঁপুই অন্যরাও এসেছে এখানে।

তারা বলে—রতনবাবু, চাষের জমি নিলেন, কথা ছিল বছরে বিঘে প্রতি দুহাজার টাকা করে দেবেন—কিন্তু তাও দেননি, আমাদের জমির ধান, পেটের ভাতও গেল, টাকাটা দেন!

রতন বলে—বিঘে প্রতি দুহাজার টাকা দোব বলেছিলাম? কখন? এ্যাঁ।

মানিক শুনছে রতনের কথাগুলো, সে এক পাশে বসে এখানের ব্যাপারগুলো

দেখেই চলেছে আর শুনে চলেছে নবাগত একটি মানুষের মত।

মহেশ বলে—তখন বলেছিলেন, এক সন দু সন দিয়েও ছিলেন। তারপরই গোলমাল শুরু হয়েছে।

রতন বলে—ওরে মদন, এদের ভেড়ির কাগজপত্রগুলো দে তো, মহেশ—এমন কথা তো ছিল না।

কাগজ বের করে বলে—দ্যাখো, কি লেখা আছে দ্যাখো হে বাবারা, ভেড়িতে লাভ হলে তোমাদের বিঘে প্রতি হাজার টাকা করে দেব, মহেশ তখন লাভ হয়েছিল দুবিঘেতে দু হাজার দিয়েছি।

কে বলে—এখন তো শুনি সব মাছ বিদেশে যাচ্ছে, আরও বেশী লাভ করছো?

রতন বলে—লাভ! লোকসানই শুনছি হে, লাখ টাকা লোকসান দিলাম, বলো, তোমাদের কাছে চেয়েছি লোকসানের টাকা? একাই বইছি, লাভ হলে ডেকে টাকা দেব। যাও তো। হঠিয়ে দিল তাদের।

লোকগুলো এখন জমি হারিয়ে পথে পথে ঘুরছে।

রতন বলে—বুঝলে মানিক, এখানের মানুষজন বড় লোভী হে। বেইমান!

মানিকও বলে—তাই দেখছি, লোকসানের বোঝা বইব না, লাভ হলে খাবলা মারবো?

রতন খুশী হয়, —তুমি তো ঠিকই বলছ, ওরা বোঝে কই, এইসব সামলাতে হয়, তা মাছের হিসাব হোল তো, চলো কাঠগোলার ব্যাপারটাও একটু বুঝিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

মানিক বলে—সব ক্রমশঃ বুঝে যাবো স্যার।

—তাতো বুঝবেই, তুমি সত্যিই ইনটেলিজেন্ট হে, বুদ্ধিমান।

ওদিকে ফটিকের দল কাজ করছিল, ওরা ভাবতেই পারেনি যে রতনবাবু ওই মানিককেই পথ থেকে তুলে এনে তাদের মাথার উপর বসিয়ে দেবে।

প্রথমদিন মানিককে এখানে দেখে একটু অবাক হয় ফটিক, মন্টার দল। ফটিক তখনও লেংচে হাটছে, মন্টার মাথায় ব্যান্ডেজ আর নাই, তবে কপালে স্টিকিং প্লাস্টার একটু রয়েছে, রকেটের এর হাটু এখনও কন্‌কন্ করে।

মানিক ওদের দেখে বলে—কি হে, এখনও সেদিনের জের কাটেনি দেখছি।

ফটিক ওকে এখানে দেখে বলে

—কোথায় এসেছো জানো? এ আমাদের ঠেক—এখানে এসে তড়পানি দেখালে ফিনিস করে দেব।

রতনবাবু এসে পড়ে, মানিক বলে

—স্যার, আমাকে এখানেই চাকরী করতে হবে?

রতন বলে—হ্যাঁ, ফটিক, এই মানিক, একে চিনেছিস তো তোরা? মানিকই এখানে কাজ করবে, ওর কথামতই কাজ করতে হবে তোদের।

ফটিক বলে—মানে!

রতন বলে—মানেটাও বুঝিয়ে দিতে হবে? আর শোন—যদি না পোষায় তোদের বল—ছুটি করিয়ে দিচ্ছি, তবে এমনিতে ছাড়া তো যাবে না, দারোগাবাবু তোদের খোঁজ করছে, খোঁজটা দিয়েই দেব তাকে, হাজত তারপর জেলেও কাটিয়ে আসবি দু'চারটে কেসের আসামী হয়ে।

ফটিকরা জানে রতনবাবুর কথায় দারোগা ও তাদের দু'দশটা খুন রাহাজানি, মায় চোরাই বন কাটাই-এর চার্জে ফেলে জেলেই পাঠাবে।

আর কাজ ছেড়ে দিলে তাদেরও এলাকায় থাকা যাবে না। রতনবাবু, সাধারণ মানুষরাই তাদের ব্যবস্থা করে দেবে।

তাই ওরা চুপ করেই থাকে।

মানিক বলে—ওদের মত না থাকলে আমিও নাই এখানে।

রতন বলে—থামো তো, নেংটি ইদুরের আবার মতামত, আর্সুলা আবার পাখী, তাদের আবার গান? মানিক যা বলে করবি, ওইই তোদের লীডার।

ফটিকের দল মুখবুজে মেনে নেয় ব্যাপারটা, সেই থেকে ওরা কাজ করে মানিকের সঙ্গেই, মালপত্র আনা নেওয়া করে মানিকের কথামত।

রতন আজ মানিককে নিয়ে চলেছে কাঠগোলার দিকে, বসতির বাইরে বেশ খানিকটা এলাকা জুড়ে কাঠগোলা, ওদিকে দুতিনটে শেড, গুদামের কাজেই ব্যবহার করা হয় ওগুলোকে।

নদীটার এখানে বিস্তার বেশীই, এদিকে একটা খাড়ির মত। সেখানেই রতনবাবুর নৌবহর থাকে, ছোট বড় নানা সাইজের নৌকা, তাদের অনেকগুলোতেই সি হর্স ইঞ্জিন বসানো, লঞ্চও একটা আছে।

নানা মালপত্র, কাঠ আর বর্ডার পার করে আসে রাতের অন্ধকারে নানা মাল, সে সব এখানে থাকে, সময়মত আবার সব মাল শহরে পাচার হয়ে যায়।

মানিক ক্রমশঃ রতনের কারবারের কিছুটা হদিশ পাচ্ছে, তাকে এসব বিষয়ে আরও জানতে হবে।

রতনও ক্রমশঃ তার কর্ম দক্ষতার উপর বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

সেদিন শিখা স্কুল থেকে ফিরছে, বৈকালের ছায়া নেমেছে বাঁধের ধারে, হঠাৎ মানিককে দেখে চাইল, মানিকও দাঁড়ায় শিখাকে দেখে। শিরিষ এর ফুল ফুটেছে, চন্দনের ছিটে লাগা ফুলগুলোয় লালচে আভা জাগে, বাতাসে ওঠে মিষ্টি সুবাস।

গাছের ফাঁক দিয়ে একফালি হলুদ রোদ পড়েছে শিখার মুখে।

শিখা বলে—সেদিন হাটতলায় সেই ঘটনার জন্য ধন্যবাদও দিতে পারিনি।

হাসে মানিক, সে ভেবেছিল শিখা তাকে চিনতে পারবে এবার। তখন উত্তেজনার মুহূর্তে পারেনি, এখন হয়তো পারবে। কিন্তু মানিক খুশীই হয় শিখা তাকে চিনতেও পারেনি।

অবশ্য এর জন্য দায়ী রাজাই, বহু বছর আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে খেয়া নৌকায় দেখা হয় সেই কাঠ মহাজনের সঙ্গে। তার কাঠকাটার নৌকায় প্রাণহাতে করে ক'বছর সুন্দরবনে ঘুরেছে, সেখান থেকে চলে যায় কলকাতায় সেখানেও নানা কাজ করে জীবনের অনেক পদাঘাত সয়ে এবার এক নতুন মানুষে পরিণত হয় রাজা।

সেই আগেকার এই আবাদের শান্ত ছেলেটার সঙ্গে আজ তার কোন মিলই নেই। শিখা বলে—সব শুনে বাবা মা বারবার করে তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছেন, সেদিন থেকেই খুঁজছি আজ পেয়েছি তোমাকে, যাবে আমাদের বাড়ি?

মানিকরূপী রাজার মনে পড়ে সেই স্নেহমাখা মুখ, মাস্টারমশায়, কাকীমার কাছে সে ঋণীই।

মানিক বলে—ঠিক আছে, চলো—

শিখা শুধোয়—তোমার নামটা তো জানাই হয়নি।

মানিক নিজের নামটা এখনও জানাতে চায় না, তাই বলে—মানিক।

শিখা বলে—আমার নাম শিখা, এখানের স্কুলের শিক্ষিকা, অবশ্য বাবাও ছিলেন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক।

মানিক হাসে—কিন্তু আমি তো একেবারে এপাশ্ ওপাশ্ ধপাশ্। মা সরস্বতীর তাজ্যপুত্রই বলতে পারো।

শিখা বলে—বই পড়লে, ডিগ্রি নিলেই মানুষ সভ্য শিক্ষিত হয় না। ডিগ্রিধারী অনেক ধূর্ত অপদার্থ এখানেই আছে, ওই যে মহানবাবু।

মানিক ওই লোকটিকে রতনের ওখানে দেখেছে। সে বলে

—ওরে বাবা, তিনি তো এখানের বিরাট নেতা, কত নাম ডাক!

শিখা বলে—থাকছো তো এখানে, ক্রমশঃ চিনবে! যেমন রতনবাবু তেমনি ওই নেতা! দেশসেবকের মুখোস পরে ওরাই দেশশোষক।

মানিক বলে—আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর তো রাখি না।

শিখা বলে—ওই তো এসে গেছি।

মানিক বাড়িটাকে দেখছে, অতীতের সেইসব স্মৃতি ফুটে ওঠে তার সামনে, কতদিন রাত তার কেটেছে ওই বাড়িতে, আজ আবার ফিরে এসেছে সে সেই স্মৃতির বেদনাময় জগতে।

তবু নিজের পরিচয় দেবার সময় হয়নি, যদি চিনে ফেলেন মাস্টারমশায়, কাকীমা, মনে হয় তারাও রাজার এই নতুন সত্ত্বাকে চিনতে নিশ্চয়ই পারবেন না।

কম্পিত বুকে এগিয়ে যায় রাজা।

শিখা বলে—দ্যাখো বাবা কাকে এনেছি!

কেদারবাবু, কমলাদেবী বারান্দায় বের হয়ে আসেন, রাজা গিয়ে প্রণাম করে তাদের, দেখছেন কেদারবাবু, কমলদেবী ওই বলিষ্ঠ তরুণটিকে।

রাজা আগেই ওদের মনের সামান্যতম সন্দেহকে দূর করার জন্য বলে—আমার নাম মানিক, মানিক দাস।

কেদারবাবু কমলাদেবী কিছুটা হতাশই হন, কমলা বলেন

—বসো বাবা, সেদিন তুমি না থাকলে কি যে হতো, কি বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাবো বাবা।

মানিক বলে—ওসব কথা বলে লজ্জা দেবেন না।

এর মধ্যেই শিখাই চা খাবার এনেছে, কমলদেবী বলেন— নাও বাবা।

মানিক খাচ্ছে, সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়, এরাও রাজাকে চিনতে পারেননি, কেদারবাবু বলেন,

—এখানে থাকছো তো?

মানিক বলে—আপততঃ আছি।

কমলা বলে—মাঝে মাঝে এসো বাবা, চারিদিকে এখানে নানা কাজকারবার চলে, যে সব লোকের দল ভারি হয়েছে তাদের নিয়েই ভয় বাবা।

মানিক বলে—না-না ভয় কিসের, ওরা আর কোন গোলমাল করতে সাহস করবে না।

শিখাও সেটা দেখেছে, কালই হাটতলায় গেছল, ওই ফটিকের দল ন্যাপার চায়ের দোকানে বসে গুলতানি করছিল কিন্তু অবাক হয় শিখা—ওরা আর তার সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করেনি।

শিখাও নিরাপদেই চলে আসে, এখন বুঝেছে এটা ঘটেছে এই মানিকের উপস্থিতির জন্যই।

সন্ধ্যা নেমেছে, মানিক বলে—আজ চলি মাস্টারমশায়।

কমলা বলে—মাঝে মাঝে এসো বাবা।

মানিক অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে চেপে রেখেছিল, সে পথে বের হয়ে এবার নিজেকেই অপরাধী মনে করে, ওই মানুষদেরও সে মিথ্যা বলে এসেছে। কিন্তু এছাড়া তার পথ ছিল না, বারবার মনে পড়ে শিখার কথা, তাকেও কথাটা জানাতে পারেনি, একদিন জানাতেই হবে।

রাজা সাবধানে পা ফেলে চলেছে, রতনবাবু এখনও তাকে কিছুটা পরীক্ষা করে চলেছে, অন্ধকারে রাজা এসে নগার ঝুপড়িতে হাজির হয়।

নগা রান্না করছে, বলে নগা—আয়, ভেটকির ঝোল করেছি খেয়ে যা। তা কাজ কেমন চলছে বাবা মানিক?

রাজা বলে—তোর নতুন নৌকা দুটো এলো?

অবশ্য রাজাই তাকে টাকা দিয়েছে, নগা বলে—ঘাটে দেখিসনি? কালই এনেছি বলাগড় থেকে। একেবারে নতুন পানসী। আর কিষ্ট, ঘনশ্যাম পতিদেরও দলে এনেছি।

এমন সময় বাইরে কার গানের শব্দ শুনে চাইল ওরা। রাজার ওই গলা চেনা, গোলাবীর গলা, মেয়েটা আজও তেমনই রয়ে গেছে, জীবনে কোন স্বপ্নই ওর সফল হয়নি, পেয়েছে শুধু দুঃখ আর বঞ্চনা।

চিরদিনের মতো কুড়োন কবে তাকে ফেলে চলে গেছে। ওদের সমাজে বহুবিবাহ্ প্রচলিত। কিন্তু গোলাবী বলে

—একজন তো চলে গেল, আবার যে আসবে সেও চলে যাবে না তা কে জানে? একা বাঁচাই তো ভালো।

তাই সে জীবনের সব দুঃখ বঞ্চনাকে হেলায় লাথি মেরেই বেঁচে আছে হাসি খুশীর মধ্যে।

গোলাবী বলে উঠানে পা দিয়ে—কি রে নগা মুখপোড়া, মদের ঠিলি নে বসলি নাকি আবার?

নগা বলে—নাগো দিদি, এসো।

গোলাবী বলে—কাল একখান নৌকা দিতি হবে, ভাইটা কুমড়ো, বিলেতী বেগুন নে যাবে গোসাবার গঞ্জে।

নগা বলে—নিও, বলে দেব সোনা ভাইকে, ওই নৌকা নে যাবে।

গোলাবী মানিককে এখানে দেখে একটু অবাক হয়।

—তুমি! এখানে?

শুনি তো রতনবাবুর পেয়ারের লোক, নগা চিনিস ওকে?

নগা বলে—না গো, ইয়ে ক'দিন হলো চেনাজানা হয়েছে।

রাজা হাসছে, হঠাৎ সে গেয়ে ওঠে ছেলেবেলায় সেই সুরে,

—গোলাবীদি, কলাই খেয়ো না,
জানলা দিয়ে বর পালাবে
দেখতে পাবে না।

চেনা সুরটা, ওই ছড়াটা শুনেই চমকে ওঠে গোলাবী।

মনে পড়ে যায় সেই অতীতের বাচ্চা রাজার কথা, দলবেঁধে বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে গোলাবীকে রাগাতো ওরা ওই ছড়া কেটে।

আজ সেই ছড়া, সেই সুর ওই মানিকের মুখে শুনে চমকে ওঠে গোলাবী, দেখছে সে মানিক কে! হ্যাঁ—এ সেই রাজাই।

গোলাবী অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—রাজা! মথুরকাকার ব্যাটা রাজা না?

রাজা ঠোটে আঙুল দিয়ে বলে—চুপ। একদম চুপ, তাহলে চিনতে পেরেছো গোলাবীদি, কিন্তু এখন আমি মানিক, রাজা নই।

গোলাবী বলে—তুই নাম ভাড়িয়ে ওই রতনবাবুর ওখানে কাজ করছিস, যদি ওরা জানতে পারে?

রাজা বলে—কেউ জানতে পারেনি, কেউ জানে না আমার আসল পরিচয়, তোমরা দুজন ছাড়া। আর এ ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে গোলাবীদি। রতনবাবু আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, বাবাকে মেরেছে, জমিও নিয়েছে, মা বোন ওর হাতেই শেষ হয়েছে, তাকে উচিত শিক্ষা দেব বলেই এসেছি, ওর ব্যবসার গোপন খবর সব জানতে হবে, তবেই ওকে শেষ করা যাবে, তাই ওখানেই ঢুকেছি।

গোলাবী বলে—পারবি রাজা?

—পারতেই হবে, আর তোমরা যদি সাহায্য করো ওর সব অন্যায়ের জবাব আমি দিতে পারবো।

গোলাবী বলে—ও এখানকার মানুষদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, একাই সব লুটেছে। এই মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে পারবি রাজা?

—সেই চেষ্টাই করবো গোলাবীদি, ওর সব খবর তাই আমার জানা দরকার।

রাজার কথায় গোলাবী বলে—পাবি, তবে সাবধানে থাকবি রাজা, রতনও

সাংঘাতিক লোক।

রাজা বলে—ও যদি বুনো ওল তবে এই রাজাও বাঘা তেঁতুল!

রতনবাবু মানিকের যোগ্যতা যাচাই করার জন্যই এবার ওকে রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পার হয়ে ওদেশে যাবার কথা বলে।

রতন বলে—ফটিকরাও থাকবে, ওরা পথ চেনে, লোকজনকে চেনে, সাবধানে মালপত্র আনতে হবে, অনেক দামী মাল থাকবে।

মানিক বলে—ও নিয়ে ভাববেন না, তেমন দেখলে যারা বাধা দিতে আসবে তাদের নজর এড়িয়ে ঠিক মাল নিয়ে বের হয়ে আসবো।

গাং নয়—সমুদ্রের খাঁড়িই। বনের মধ্য দিয়ে সরু খাল অবশ্য আছে, এসব পথে রাজা এর আগেও কাঠের নৌকায় এসেছে, ফটিক দাঁড়িয়ে আছে ডেকে।

মানিক জানে সহকর্মীদের প্রিয় হতে হবে তাকে, ও জানে ওদের বশ করার মন্ত্র, মানিক কয়েকটা মদের বোতলই ওদের এগিয়ে দেয়। বলে

—ভয় নাই, তোরা খা—আমি দেখছি।

ওরা মদেই খুশী, রকেট ইদানীং মানিকের ভক্ত হয়ে উঠেছে, আরও দু'একজনও মানিককে মানে গণে। ফটিকও বুঝেছে যে মানিক তার দলেও ভাঙ্গন ধরিয়েছে, কারণ ওরাও জেনেছে মানিকই এখন রতনবাবুর ডান হাত।

রাত এর গভীরে লঞ্চটা এসেছে একটা বড় ট্রলারের পাশে, ফটিককে চেনে সেই লোকগুলো, ওই ট্রলার থেকে বড় বড় বাক্স, পেটি এসব তোলা হয় এদের লঞ্চে।

মানিক দেখছে মালগুলো, লাখ লাখ টাকার নানা ধরনের মাল, ওরা বলে-- হুঁসিয়ার হয়ে যাবে মানিক! আশপাশে বি এস এফের লোকজন ঘুরছে এদিকে বর্ডারের আমাদের টহলদারি বোট ঘুরছে।

মানিক তা জানে, টাকাপত্র লেন চুকে যেতে মানিক বলে—লঞ্চের সব আলো নিভিয়ে দে, ফুল স্পিডে চালা।

লঞ্চ চলছে।

ওদিকে দূরে দেখা যায় টহলদারি বোটের আনাগোনা, একটা বোট গাং-এর বুকে সার্চ লাইট জ্বেলে দেখছে। ফটিক বলে—ব্যাটারা এদিকেই আসছে।

মানিকও দেখে দুটো বড় ট্রলার এগিয়ে আসছে দুদিক থেকে।

মানিক বলে—সারেং ওই বনের মধ্যে ঢুকে পড়ো, ওপাশের ট্রলার থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা যায়, বোধহয় ওরা ঘিরে ফেলতে চাইছে, ফটিকদের

নেশা ছুটে গেছে।

—কি হবে? ধরা পড়লে এরা তো আটকাবেই, পরে রতনবাবুও শেষ করে দেবে আমাদের।

—চোপ। ধমকে ওঠে মানিক, সে নিজেই লঞ্চ এর স্টিয়ারিং ধরে এবার গহনবনের একটা খালের মধ্যে ঢুকে যায়, দুদিকে আঁধার ঢাকা বন—তার বুক চিরে চলেছে একটা রূপার পাতের মত খাল।

—কোথায় যাচ্ছি? এ যে সমুদ্রের দিকে গেছে, বলে ফটিক।

মানিক বলে—এখন পালাতে হবে এই সুত দিয়েই! বড় ট্রলার এখানে ঢুকবে না।

ওই অজানা পথে বি এস এফ-এর চোখে ধুলো দিয়েই কয়েকঘণ্টা চলার পর ভোর রাতের দিকে ওরা এসে শ্যামপুর গঞ্জের গুদামের ঘাটে থামে।

রতনবাবু জানে এই চালানে বহু দামী মাল আসছে, বিপজ্জনক মালও। ধরা পড়লে সব মালতো যাবেই, তারও বিপদ হবে, তাই রাতে ঘুম আসেনি রতনের।

সন্ধ্যার পরই ফেরার কথা, রাত শেষ হতে চল্লো ফিরলো না, তাহলে কি ধরা পড়ে গেল ওরা!

কিন্তু ভোরের আগেই ওদের ফিরতে দেখে ঘাটে আসে রতন, লঞ্চটা এসে থামে গুদামের জেটিতে, নামছে মানিক।

বলে সে—এইসব নেংটি ইদুরদের দিয়ে কাজ করাও কি করে রতনবাবু? পুলিশ এর লঞ্চ দুটোকে আসতে দেখে সব কটাই প্যান্টুল বাসন্তী কালার করে ফেলেছিল।

রতন বলে—এ্যা! কেউ টেরও পায়নি?

—ওরা যে তাড়া করেছিল।

রতনের কথায় মানিক বলে—টিকিটিও ধরতে পারেনি, মানিককে যে ধরবে সে শালা এখনও মায়ের গব্বে! এ্যাই ফটিক—আরে মণ্টা, মাল জলদি খালাস কর।

ওরা মালপত্র তুলছে গুদামে, মানিকও সে সব ঠিক ঠাক সাজিয়ে রাখে, রতনবাবুও খুশী, সব মাল ঠিক মত আনার জন্য, সেও দমকা কিছু টাকা দিয়ে বলে

—মানিক, ওদেরও দে। ফূর্তি টুর্তি করুক, ক'দিন ধকল গেছে।

মানিকও ফটিককে পুরোটাকাই দিয়ে দেয়।

—নে।

ওরাও খুশী। রতনও দেখে ছেলেটা নির্লোভই।

রতন বলে—গুদামে চাবি দিয়ে আয় মানিক। কাল দেখা হবে।

টাকা পেয়ে ফটিকের দল তখুনিই কেটে পড়েছে। গুদামে মানিক একা।

সে এবার ওই বড় প্যাকেটটা খোলে, গোটা পাঁচেক বিদেশী বন্দুক সেটাতে রয়েছে, ধাতব পদার্থগুলো খুব সাংঘাতিক জিনিস, রতনবাবু এসব মাল বেচে লাখ লাখ টাকা মুনাফা করবে।

গোপনে বিদেশী মাল—সোনার বিস্কুট—এছাড়া দামী অস্ত্র, গুলিগোলাও আমদানী করে লোকটা।

মানিক এদিক ওদিক চায়, লোকজন কেউ নাই, মানিক ওই প্যাকেটের গোটা তিনেক বন্ধুক আর এক বাক্স গুলি নিয়েই অন্ধকারে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়।

গাং-এ একটা বাইন ঝোপের আড়ালে নগা তার নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, মানিক গিয়ে পাখীর ডাক ডাকতে ওদিক থেকে নগাও সেই ডাকেই সাড়া দিয়ে ঝোপ থেকে বের হয়ে আসে। তারার আলোয় দেখা যায় তাকে।

মানিক মালগুলো তাকে দিয়ে বলে—হুঁসিয়ার! এসব মাল সামলে রাখবি নগা।

নগা নৌকায় পাটাতনের নীচে ওসব নিয়ে চলে যায়।

মানিক এসে গুদামের তালাচাবি বন্ধ করে রতনবাবুর বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়, সেখানে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে তবে তার ছুটি হবে।

রতনবাবুর নজর সবদিকেই, শিখা নতুন গার্লস স্কুলে চাকরী পেয়েছে, ওই স্কুল গড়ে তুলেছেন কেদারবাবু গঞ্জের হারু পাল অন্য ব্যাবসায়ীদের নিয়ে।

রতনবাবু এবার নিজেই আসে ওদের স্কুলে।

সেদিন শিখা ক্লাশে ব্যাস্ত, কোনমতে কয়েকটা দরমার ঘর তুলে ক্লাসের কাজ চলে, রতনবাবু সব দেখছে।

শিখাই এগিয়ে আসে,

—আসুন।

রতনবাবু বলেন—না, দারুণ একটা কাজ করছো শিখা। তাই নিজেই এলাম, মহৎ কাজে সাহায্য, সহযোগিতা করা দরকার, মহান তো এখানের এম এল এ, দেখি ওকে বলি স্কুলের অনুমতি, সরকারী সাহায্য যদি আনাতে পারেও।

শিখা বলে—আমরাও চেষ্টা করছি।

—করতেই হবে। রতন শিখার এড়িয়ে যাবার মনোবৃত্তিকে যেন পাত্তাই দেয় না। বলে—কথায় বলে দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।

চলি, একদিন যেও গদি ঘরে, মহানকেও আসতে বলবো, স্কুলের সম্বন্ধে আলোচনা হবে তখন।

রতনবাবু চায় শিখা তার কাছে আসুক, সেও স্কুলের কাজে সাহায্য করবে, কিন্তু শিখাই তাকে পাত্তাই দেয় না।

শিখা ভাবে তেমন বুঝলে কলকাতাতেই চলে যাবে, তাই রতনবাবুর কোন সাহায্য সে নিতেই চায় না।

মহানও দু'একবার এসেছে স্কুলে, কেদারবাবুর বাড়িতেও। কেদারবাবু মহান সম্বন্ধে মোটেই আশাবাদী নন, স্কুলের কাজই করে না, নেতাগিরি করে বেড়ায়। এখন হেডমাস্টার হয়েছে করালীবাবু, সেও রতনের ভজনাই করে, তাতেই ব্যস্ত।

ফলে স্কুলের রেজাল্টও খারাপই হচ্ছে, কেদারবাবু বলেন—স্কুলে পড়ানোটাই হয় না হে, মাস্টারী এখন আর ব্রত নয়, টাকা রোজকারের প্লাটফর্ম মাত্র।

মহান বলে—দিন বদলাচ্ছে স্যার, এখন এই হবে।

কেদারবাবু বলেন—তোমরাই তো জেনেশুনে একটা জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করছো।

মহান হাসে, নেতা হয়ে এখন সব কথা সহ্য করার অসীম শক্তি সে অর্জন করছে।

সেদিন মহান এসেছে মাস্টারমশায়ের বাড়িতে, হঠাৎ শিখার সঙ্গে মানিককে আসতে দেখে চাইল, ছেলেটির সম্বন্ধে মহান অনেক কথাই শুনেছে, দেখেছে মানিককে রতনবাবুর সঙ্গে

মহান বলে—তুমিই মানিক?

মানিক চেনে মহানকে, বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রতনবাবুর সঙ্গে দেখি।

মানিক বলে—এখানে উনিই আমাকে আমাকে ঠাঁই দিয়েছেন, অবশ্য আমার চেয়েও অনেক নিরেশ মাল তার দয়ায় বেশ করে খাচ্ছে।

মহান চমকে ওঠে ওর কথায়।

—মানে?

মানিক বলে—মানেটাও বলে দিতে হবে স্যার? এত লেখাপড়া জানা লোক আপনি এর মানে বোঝেন না?

মহান বিরক্তই হয়, হাসছেন কেদারবাবু, শিখাও।

মহান জানে তার ইতিহাস, তাই কথাটা যে তাকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে সেটা বুঝতে দেরী হয় না।

মহান বলে—তোমার সঙ্গে স্কুল নিয়ে একটু আলোচনা ছিল শিখা।

শিখা বলে—স্কুলেই আসবেন, এখন ব্যস্ত।

অর্থাৎ মহানকে যেন যেতেই বলেছে শিখা। মহান উঠে পড়ে, রাগটা ওর পড়ে মানিকের উপরই।

বলে মহান—আজ চলি। মহান চলে যায়।

চা এনেছে কমলা, বলে, —মহান নেই?

—চলে গেছে, শিখা বলে—ওকে পাত্তা কেন দাও মা?

মানিক আসছে, শিখা বের হয়ে আসে ওর সঙ্গে রাস্তায়।

শিখা বলে—তুমি রতনবাবুর ওখানে কাজ করো?

মানিক বলে—কেন, এখানে আসতে বাধা আছে তার জন্য?

শিখা বলে—তা নয়, তবে ওই লোকটা সুবিধের নয়।

মানিক বলে—আমাকেও তো চেন না, আমিই বা কেমন তা তো জানো না।

শিখা চাইল, বলে

—মানুষকে দেখলেই বোঝা যায় সে কেমন, তোমাকে প্রথমে দেখেই মনে হয়েছিল তুমি যেন আমার অনেক দিনের চেনা।

মানিক চম্‌কে ওঠে। কে জানে শিখা তার আসল পরিচয় পেয়েছে কিনা, শিখাকে রাজা এখন চিনেছে, রতনবাবুকে সে সহ্য করতে পারে না এটা জেনেছে।

ওর সাহায্য সহযোগিতা, বিশেষ করে কেদারবাবুর সহযোগিতা রাজার চাই, কারণ কেশববাবুকে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা করে।

ওরা কাছে নানা প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে আসে। কেশববাবু জানে ওরা রতনবাবুর জুলুমের শিকার, আজকেই কেদারবাবুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে তারা।

কেদারবাবু বলে—তোমরা নিজেরা জোট বাঁধো।

ওরা চায়, ভেড়ি থেকে নিজেদের জমি উদ্ধার করতে, রতনবাবুর ওই আড়তের দাসত্ব থেকে তারা মুক্তি পেতে চায়।

কেশববাবুও ভাবছেন কথাটা।

রাজা জানে সামনে তার অনেক কাজ, ওই বিক্ষুব্ধ মানুষদের জন্য কিছু করতে হবে, ওদের উপকারও হবে—আর রতনবাবুর সর্বনাশ হবে এই কাজই করবে সে। সেই চেষ্টাতেই কেশববাবু, শিখাকে তার পাশে চাই।

ফটিক, মণ্টারা বুঝেছে রতনবাবু এখন মানিককেই বেশী বিশ্বাস করে। আর তাদের ওই মানিকের কথামতই কাজ করতে হয়, ওই টানা মাল পাচার করে আনার পথেই তারাও ওর থেকে কিছু মাল বিক্রী করে বেশ কিছু টাকা রোজকার করতো।

কিন্তু সেই রোজগারও এখন আর হয় না।

ফটিক বলেছিল সেদিন—মানিক, কিছু মাল ঝেড়ে দিই। খদ্দেরও আছে রেডি, মোটা টাকা আমদানী হবে, রতনবাবু টের পাবে না।

মানিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে

—এ সব ছেঁড়া কাজ করতিস তোরা, না? চোরের উপর বাটপাড়ি করতে শেখাস না, যা, মুখ বুজে দাঁড় টান।

ফটিকদের রাগটা বাড়তেই থাকে, আড়ালে বলে

—শালা যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা। বলে কি না এসব ছেঁড়া কাজ করি না।

মণ্টা বলে—কত্তাকে বলে দেবে না তো? সর্বনাশ হবে!

ফটিক বলে—ওই ব্যাটাকেই একদিন ফুটিয়ে দোব।

মণ্টা বলে—তাই দাও, না হলে আমাদের দফা নিকেশ করে দেবে ওটা।

ওরা সেইমত প্ল্যানটা করেছিল।

ফটিক মণ্টা খবর রাখে মানিক ওই মাস্টারের বাড়িতে গেছে। ফিরবে সন্ধ্যার পর, ওরা তৈরী হয়ে আছে, অন্ধকারেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর উপর।

নদীর বুকে আলোর আভাস, পথটা নির্জন।

মানিক ফিরছে, অন্ধকারেও ওর চোখ জ্বলে, বাতাসে ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বিপদের হুঁসিয়ারী পায়।

ও দেখেছে ওদিকে ঝোপের আড়ালে দুটো ছায়ামূর্তি বাঁধের দিকে চেয়ে বসে আসে, এখানে মানিক পথ কম করার জন্য বাঁধ ছেড়ে আলপথ দিয়ে আসছে।

ফটিকরা টেরও পায়নি যে মানিক ওদের পিছনে এসে হাজির, ফটিক মণ্টা বাঁধের দিকে চোখ রেখে বলছে।

—শালা মানকে ওই ভেড়ির পথেই আসবে, ব্যাটাকে এক কোপে শেষ করে গাং-এ ফেলে দোব, ব্যস—কুমীর কামটের ভোজে লাগবে ব্যাটা।

মানিকও বুঝেছে ব্যাপারটা, এবার পিছন থেকে দুটোকেই ঘাড় ধরে বিড়ালের বাচ্চার মত তুলতে দুটোই চমকে ওঠে ফটিক মণ্টা।

—মানিকদা।

মানিক গর্জে ওঠে—মানিক দাদা! এ্যাঁ খুন করবি মানিককে?

দুটোকে আশমানে তুলে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করতে থাকে। দুটোই বুঝেছে আজ কঠিন পাল্লায় পড়েছে তারা।

মানিক এবার দুটোকে বাঁধের উপর টেনে এনেছে। অনেক নীচে ফুঁসছে জোয়ারের গাং, জল ওখানে খুব পাক খায়, জায়গাটাকে বলে শ্যামপুরের ঘোল।

নৌকাগুলোও ওদিকে আসে না ভয়ে, ওই ঘোলে পড়লে অতলে তলিয়ে যাবে, মানুষ পড়লে রক্ষা নাই।

ওই খোলের উপর বাঁধের মাথায় দুটোকে টেনে এনে গর্জায় মানিক—দোব দুটোকে লাথি মেরে গাং-এ ফেলে, তলিয়ে যাবি।

ওরা বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব, আর্তনাদ করে ফটিক

—ছেড়ে দে মানিক, এ কাজ আর জিন্দেগীতে করবো না।

মণ্টা বলে—পায়ে পড়ছি ওস্তাদ।

—যা! মানিক একটাকে সপাটে লাথি মারে, ফটিক লাথির চোটে ওই উচু বাঁধ থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে এদিকে একটা পচা ডোবার জলে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায়।

মণ্টাকেও ওইভাবে লাথি বসিয়ে গর্জায় মানিক

—যা! আজকের মত ছেড়ে দিলাম। কুত্তা কাঁহিকা।

নগাও আশপাশেই ছিল, সেও এসে পড়ে,

—ছেড়ে দিলি ওদের?

মানিক বলে—পরে দেখবো, এখন গোলমাল করতে চাই না।

শিখার মনে পড়ে মাঝে মাঝে হারানো রাজার কথা, সে আজ কোথায় জানে না! তবু জীবনের সেই ছিল প্রথম বন্ধু, মানিককে ও দেখছে সে আর রাজার কথাই মনে পড়ছে বার বার।

মানিককে কেদারবাবুও স্নেহ করেন, বলেন মহেশ, অন্যদের—একটা তেজী সৎ ছেলে পেলে তোমাদের কাজ হতো হে। যদিও বা তেমন একটা ছেলে এলো এখানে, ওই রতন তাকেও চাকরী দিয়ে আটকে ফেললো।

মহেশ বলে—তাই তো দেখছি।

এদিকে রতনবাবু অঞ্চল থেকেও লুটছে। ভেড়ি বাঁধ এখানের জীবন, বাঁধ ভাঙলে নোনা জল ঢুকে সব চাষ আবাদ নষ্ট করে দেয়, তাই বাঁধ বাঁধার জন্য সরকার থেকে মোটা টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু রতনই তার পেটোয়া কিছু লোকদের দিয়ে কাজ করায়—তারা বাঁধের কাজও ঠিকমত করে না। করবে কোথা থেকে? ওই টাকার সিকি ভাগ কাজ হয় বাকীটাকা ভাগ হয় রতনবাবু, আর ঠিকাদারের মধ্যে, অবশ্য নেতা হিসাবে মহানও কিঞ্চিৎ প্রণামী পায়, আর বাঁধ ভাঙ্গলে মহান সেখানে ডুবন্ত জনতার সামনে ওজস্বিনী ভাষায় ভাষণ দেয়। রতনবাবু অঞ্চল থেকে সাহায্যও আনায়, তার থেকে নিজের ভাগ আগে সরিয়ে নেয়।

খরা আর বন্যা—দুটোর যে কোনটা হবেই এখানে, লাভ হবে রতনবাবু ও মহান নেতার, মরলে মরবে সাধারণ মানুষ। মহেশ নিতাইরা তাই মরে এখানে, ওদের হয়ে বলার কেউ নাই, কেদারবাবু একা আর কতটুকু করবেন?

শিখাও দেখছে ব্যাপারটা,

সেই বলে—বাবা, তুমি এদের হয়ে কথা বলো, নানা দরখাস্ত লিখে দাও। রতনবাবু মহানরা তাতে খুশী নয়।

কেদারবাবু বলেন—সাধ্য থাকলে আরও কিছু করতাম মা, ওদের খুশী, অখুশীর জন্য ভাবি না।

শিখা সেদিন গঞ্জের বাজারে বাবার জন্য কি কিনতে গেছে, সেখান থেকে এক ছাত্রীর বাড়িতে যেতে হয়, কথায় কথায় রাত হয়ে যায়।

ওদের বাড়ির লোকরা বলে—এগিয়ে দিই দিদি?

শিখা বলে—পূর্ণিমার রাত, আলো লাগবে না, এই তো পথ, চলে যাবো।

শিখা নদীর বাঁধ ধরে আসছে, পূর্ণিমার রাত, এখানের আকাশে শহরের মত ধোঁয়াধূলোর লেশমাত্র নেই, মালিন্যমুক্ত আকাশের বুকে চাঁদের আলো সব ঔজ্জ্বল্য নিয়েই গাং-এর বুকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করেছে। যোয়ারের নদীর গর্জন মিশেছে বাতাসে।

হঠাৎ সুরটা কানে আসে শিখার, খুব চেনা গান—চেনা সুর, শিখার মনে পড়ে ওই গানটা রাজা আর সে গাইত, শিখাই গানটা শিখেছিল ওদের গ্রামোফন রেকর্ড থেকে।

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে—

থমকে দাঁড়ায় সে, শিখার মনে পড়ে দুটি কিশোর কিশারী গাইছে ওই গান এই নদীর ধারে কোন অতীতের জ্যোৎস্নারাতে, আজ এতদিন পর হঠাৎ ওই গান শুনে চমকে ওঠে শিখ।

গানটা গাইছে কে ওদিকে বাঁধের নীচে শিরীষ গাছের তলায়। শিখা পায়ে পায়ে ওই মাতাল করা সুরের যাদুতে মোহিত হয় যেন এগিয়ে চলেছে।

একটু দূরে এসে দাঁড়াল শিখা। অবাক হয় শিখা।

গাইছে ওই মানিক। মানিক এই গান কোথা থেকে শুনলো? গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো মায়াজাল বুনেছে ওর মুখে, তন্ময় হয়ে গাইছে মানিক।

শিখা এগিয়ে যায়, গানটা থেমেছে।

মানিক স্তব্ধ, হঠাৎ একটা ডাক শোনে

—রাজা!

চমকে ওঠে রাজা—কে!

চাইতে দেখে শিখা এগিয়ে আসছে, শিখাই বলে

—এতদিন কেন মিথ্যা কথা বলেছিলে রাজা?

রাজা আজ ধরা পড়ে গেছে শিখার কাছে মুহূর্তের দুর্বলতার জন্যই।

শিখা বলে—কেন? কেন বলনি নিজের পরিচয়? অবশ্য আমার বোঝা উচিত ছিল, এত লোক থাকতে কেন তুমি আমায় সেদিন হাটতলায় বাঁচালে।

রাজাও খুশী, বলে সে

—সময় হলেই আসল পরিচয় দিতাম শিখা! বলতাম কেন এসেছি এখানে, সময় হয়নি তাই সব কথাই গোপন রাখতে হয়েছে।

শিখা এসে বসেছে ওর পাশে, আজ দুজনে দুজনের হারানো অতীতকে ফিরে পেয়েছে। শিখা বলে

—সব জেনে শুনেও ওই রতনবাবুর ওখানে কাজ নিলে?

রাজা বলে তার আসল উদ্দেশ্যের কথা, জানায় ওই রতনবাবুর সর্বনাশ করাই তার একমাত্র স্বপ্ন।

শিখা বলে—প্রতিশোধই নয় রাজা, এখানকার মানুষের ভালোর জন্য কিছু করো।

রাজা বলে—সেটা ওই রতনবাবুকে শেষ না করলে করা যাবে না, ও বাধাই দেবে।

শিখা বলে—কিন্তু সাধারণ মানুষ তোমার সহায় হলে কাজটা সহজ হবে, তারাও এই লড়াই এ তোমার পাশে থাকবে, তাই ওদের জন্যও কিছু করতে হবে।

কথাটা ভাবছে রাজা, মনে হয় এটাই হবে উচিত পথ, তাই বলে—তোমার কথাটাও ভেবে দেখছি শিখা।

শিখা বলে—কিন্তু নিজের বিপদের কথাটা ভেবেছো? রতনবাবুর ঘরেই বাস করে তার সর্বনাশ করতে চাইছ! যদি রতন তোমার আসল পরিচয় জানতে পারে, সেদিনও তোমাকে ছেড়ে দেবে না, ওকি সাংঘাতিক লোক তাতো জানো!

রাজা বলে—সে কথাও ভেবে রেখেছি শিখা। আর এ বিপদকে মাথায় নিয়েই চলতে হবে। এখন তুমিও জানলে কিন্তু মাস্টারমশাই, কাকীমাকেও বলবে না, ওটা সময় হলে আমিই জানাবো।

নগা, গোলাবীদি আর তুমিই জানলে এটা। আর কেউ যেন না জানে।

শিখাও বুঝেছে বিপদের গুরুত্বটা, তাই বলে

—তাই হবে রাজা, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

—তা করি শিখা।

আজ দুজনে দুজনেকে চিনেছে, শিখাও খুশী, আবার ভাবনাও বাড়ে তার, জানে রাজা খুবই জেদী, ও যখন একাজে নেমেছে। এতদূর এগিয়েছে, এর শেষ না দেখে ছাড়বে না।

কিন্তু ভয় হয় রতনবাবুর জন্য, লোকটাও অনেক বুদ্ধি রাখে, ওর লোকবল অর্থবল অনেক, রাজার খবর জানতে পারলে সে শত্রুকে রাখবে না, শেষ করবেই। রাজার যদি কোন বিপদ হয়!

শিখা বাড়ি ফিরে কথাটা ভাবছে, তার মনে আনন্দের থেকেও বিপদের আশঙ্কাটাই বড় হয়ে ওঠে।

কমলা দেখেছে শিখা ঘরে ফিরে চুপচাপ কি ভাবছে নিজের ঘরে বসে, মা এসে শুধোয়।

—কি হল রে, চুপচাপ বসে আছিস শিখা?

শিখা আসল কথাটা মাকে জানাতেও পারে না, বলে সে,

—কই না তো! কিছুই তো ভাবছি না।

মা বলে—রাত হয়েছে, নে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নিবি চল।

—বাবা কোথায়?

শিখার কথায় কমলাদেবী বলে

—ওই মহেশরা এসে ডেকে নিয়ে গেল, ওদের কি জরুরী মিটিং আছে।

শিখা জানে কিসের মিটিং।

ওই জেলেরা এখানের চাষীরা এবার রতনবাবুর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদই করতে চায়। তাই নিয়েই আলোচনা সভা বসেছে।

শিখা জানে না কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে।

এদের আন্দোলনের কথাটা কিন্তু রতনের কানে ঠিক পৌঁছে যায়।

চরণ ডাক্তারের কাছে অনেকেই আসে, চরণ ওষুধের দামও নেয় বেশী, আর ইনজেকশন তো ফুঁড়বেই আগাম টাকা নিয়ে।

আর মাঝে মাঝে ডাকেও যায়। তখন সেই জিল্‌জিলে ঘোড়াটাকে ওর কমপাউন্ডার কাম সহিস যদো জলার মাঠ এর ঘাসবন থেকে তুলে আনে। ঘোড়াটা সেখানে তিনপায়ে লেংচে লেংচে নিজের খাবার নিজেই সংগ্রহ করে।

আর কলে যাবার সময় যদো ওকে সামনের দুই ঠ্যাং-এর বাঁধন খুলে ত্রিপদ থেকে আবার চতুষ্পদ জীবে উন্নীত করে। শিরদাড়ার উপর পুরু করে চট কাঁথার আচ্ছাদন পেতে চরণ ডাক্তার উঁচু দাওয়া থেকে তার পিঠে সমাসীন হয়, আর যদু ডাক্তারী বাগ কাঁধে আর এক হাতে ছিপটি দিয়ে ঘোড়াটাকে নিয়ে, যায় ভিন্ গ্রামে রুগীর বাড়িতে চরণকে চাপিয়ে।

চরণ ওই পরিক্রমার সময়ই খবরটা পায় যে এবার এই অঞ্চলের জেলে চাষীরা গোপন মিটিং করছে, তাদের দাবী আদায়ের জন্য।

এমন জরুরী সংবাদটা চরণ ডাক্তার শুনে এসেছে রতনবাবুর কাছে। রতন তখন মহানকে নিয়ে কোন বাঁধের কাজে কত টাকা সরানো যাবে, সরকারি গ্রান্ট কত বের করা যাবে সেই হিসাব করতে ব্যস্ত। চরণ এসে বলে,

—সর্বনাশ হয়েছে রতনবাবু!

—মানে! রতন চাইল,

চরণ বলে—মহানও রয়েছে। ভালোই হলো, খবর পেলাম এখন এই অঞ্চলের জেলারা চাষীরা মিলে মিটিং করছে, ওরা নাকি ওই ভেড়ির থেকে টাকা ঠিকমত পাচ্ছে না, তাই জমিই ফেরৎ নিতে চায়।

—আর জেলেরা?

চরণ জানায়—শুনছি তারা নাকি সমবায় করে মাছ-এর ব্যবসা করবে, আপনার আড়তে মাছ দেবে না।

—আমার ঋণ নিয়েছে। রতন বলে

চরণ জানায়—সমবায়ের টাকা পেলে ওরা তা শোধ করে দেবে।

রতন বিপদের কথাই ভাবছে, বলে ওঠে মহান

—এ নিয়ে ভাবছেন কেন? আমিই ওদের মিটিংএ যাবো, ওদের আপনার বিরুদ্ধেও বলবো, সমবায় গড়ে দেবার ভার নেব।

রতনবাবু অবাক হয়—কি বলছ মহান!

মহান বলে—সমবায় কোনদিন হবে না, আর ওদের জমিদখলের আন্দোলনও মিটিং মিছিলেই শেষ হবে, আপনার গায়ে আঁচও লাগবে না।

এবার ব্যাপারটা বুঝে খুশী হয় রতন।

—দারুণ বুদ্ধি তো তোমার হে মহান! তা নামেও মহান, কাজেও মহান।

মহান বলে—তবে বেইমান নই, আপনাকে দেখছি, দেখবো, আপনি একটু নজরে রাখবেন ব্যাস—

পরদিন মহানই হাটতলাতে বিরাট মিটিং করে, চোঙ্গা লাগিয়ে সারা এলাকার চাষী, ওই জেলেদের দুঃখের কথা বর্ণনা করে বিগলিত ভাষায় আর ঘোষণা করে,

—আমি সদরের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবো। দরকার হয় মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং করবো। এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। জোতদার, মহাজনদের এঃ শাসন শোষণ কোন মতেই চলতে দেওয়া হবে না! আমরা গড়তে চাই শোষণ মুক্ত এক নতুন সমাজ।

চড় চড় হাততালি পড়ে, ফটিকের দল এর মধ্যে বেশ কিছু লোককে এনে জমায়েত করিয়েছে।

মহেশ, নিতাইরাও এসেছে, তারাও ভাবেনি যে মহানবাবু তাদের আন্দোলনকে এইভাবে সমর্থন করবে। মহান বলে তাদের,

—আমি এই আন্দোলনের সামনে আছি, থাকবোই, তোমরা জোট বাঁধো, এক হও, আমিই চেষ্টা করবো যাতে তোমাদের সমস্যার সমাধান হয়।

ওরাও জয়ধ্বনি দেয় মহান নেতা মহানবাবু—জিন্দাবাদ।

ফটিকের আনীত দলবল চীৎকার করে—জিন্দাবাদ। মহান ওই জনতাকে নিয়ে হাটতলা হয়ে গ্রামেব কিছুটা প্রদক্ষিণ করে, মহানই গর্জে ওঠে শূন্যে হাত তুলে

—মহাজনের কালো হাত, ভেঙ্গে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

শিখা ফিরছিল স্কুল থেকে। সেও দেখে ওই আন্দোলনকারী শোভাযাত্রীর দল মহানকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। মহেশ, নিতাই অন্যরাও চলেছে ওই দলে। তারাও এবার স্বপ্ন দেখে মহানবাবুই তাদের পাশে দাঁড়াবে।

শিখা দেখে ওই শোভাযাত্রা, ওই বঞ্চিত মানুষগুলোর মুখে চোখে দেখেছে আশার আলো।

কেদারবাবুর কানে এসেছে ওই রণহুঙ্কার, ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না। মনে হয় মহেশরাই বোধহয় মিছিল বের করেছে, নিজেরাই নিজেদের দাবীতে স্বোচ্চার হয়েছে, এটা ভালো লক্ষণই। তিনি একটা আশার আলো দেখেন।

অলক ইদানীং গাঁয়ে একটা আড়ত করেছে। সে জানে এই যুগে টাকার জোর, খুঁটির জোর না থাকলে চাকরী হয় না। ওদিকের সামান্য মাছ কিনে ক্যানিং-এ পাঠায়।

মনে হয় অলকই এগিয়ে এসেছে এই আন্দোলনে। এমন সময় শিখাকে আসতে দেখে চাইলেন কেদারবাবু। শিখাই বলে,

—হাটতলায় সমবায়, ওই জমির আন্দোলন নিয়ে মহানবাবু দেখলাম জোর মিটিং করছে।

কেদারবাবু অবাক হন—সেকি! মহান মিটিং করছে এদের হয়ে?

—তাই তো দেখলাম। শিখা জানায়—ও বলছে সমবায় হবেই।

—তাই নাকি! কেদারবাবু একটু অবাক হন, বলেন।

—এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! রতনবাবুর বিরুদ্ধে যেতে পারবে ও?

শিখা বলে—কে জানে, যা হচ্ছে তাই বললাম।

কেদারবাবু বলেন—শেষ অবধি সব চেষ্টা এদের ভণ্ডুল না করে দেয় মহান। ও যা করে খুব হিসাব করেই করে, তাই ভয় হয় সহজ সরল মানুষগুলোকে আন্দোলনের নামে শেষে না ঠকায়।

শিখা বলে—বাবা, ওরা এখন মহানবাবুর উপরই বেশী নির্ভর করছে, তুমি বল্লেও শুনবে না, নিজেদের পথেই চলতে দাও ওদের। ক্রমশঃ আসল সত্য কি তা পরে বুঝবে ওরা। এখন ওদ্দের ফেরাতে পারবে না।

হয়তো তাই—কেদাবাবুও চুপ করে যান, এ বিষয়ে আগ বাড়িয়ে তার করার কিছুই নাই।

মানিক দেখে ব্যাপারটা।

মহানকে সে চেনে, জানে তার এখানে আসার ইতিহাসটা। রতনবাবুর লোক সে, হঠাৎ এইভাবে তাকে পালটি খেয়ে ওই মিটিং মিছিল করতে দেখে অবাক হয়।

নগার ঘরখানাতেই রয়েছে সে, হাটতলার ওদিকে কয়েকটা শিরীষ গাছের পাশে ঘরটা, একটু নিরিবিলিই। নগা মাঝে মাঝে আসে, আজও এসেছে, রাজা এখন নগার দলকেও গড়ে তুলেছে, টাকা কড়িও দেয়, অন্য সব জিনিসও। অর্থাৎ রাজা একটা আশ্রয়, পথও গড়ে তুলছে—রতনবাবুর সঙ্গে লড়াই এর পথ।

আজ মহানকে ওই জেলে চাষীদের আন্দোলনে সামিল হতে দেখে বলে নগা —ওই মহান শ্যালা গিরগিটি রে।

—গিরগিটি!

মানিকের কথায় নগা বলে—জানিস না গিরিগিটি যখন তখন রং বদলাতে পারে, ও মাল তাই। রতনের চামচে—দ্যাখ ক্যামন হাত পা নেড়ে রতনবাবুর মুণ্ডুপাত করছে এদের সঙ্গে।

মানিক বলে—মাল নাটক করছে বোধ হয়, মহেশ খুড়োদেরই শেষে গাছে তুলে মই না কেড়ে নেয়।

নগা বলে—কে জানে, মিটিং-এ দেখলাম সমবায়ের জন্য ভিক্ষা, চাঁদা সব তোলা হচ্ছে, অনেকেই দিচ্ছে, হাটের সবাই, মেলা টাকাই উঠবে।

মহান সত্যিই করিকর্মা লোক, একদিনের মিটিং এ হাটবারের দিনই কয়েক হাজার টাকা উঠেছে, মহেশ বলে মহানকে।

—ওসব টাকাকড়ির হিসাব আপনিই রাখেন।

মহান বলে—তোমাদের আন্দোলনে আছি, আবার টাকাকড়ির দায়িত্ব কেন দিচ্ছ মহেশ, ওসব তোমরাই রাখো।

মহেশ বলে—মুখ্যু লোক, হিসাব কিতাব জানি না, ওসব আপনিই রাখুন গো।

মহান জানে কি করে হিসাব মেলাতে হয়, আর এদের বিশ্বাস অর্জন করে বেশ কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে হবে। বলে মহান

—এটা রাখছি, তোমরা এত করে বলছো, কিন্তু এতে তো হবে না। মহাজনের দেনা চুকোতে হবে, সরকারী সাহায্য পাবে, কিন্তু তোমাদেরও ফান্ড গড়তে হবে।

নিতাই বলে—তা সত্যি। আমি বলি সবাই রোজ ধর্মভাঁড় করো তাতে পাঁচটাকা করে জমাবে। মাসে সেটাও জমা পড়বে ওই ফান্ডে, বছরে কম টাকা হবে না।

মহান হিসাব করে মনে মনে, বলে—এতো খুব ভালো কথা। তোমাদের ফান্ডও জমবে।

সেইমত টাকা তোলার ব্যবস্থাও হলো। মহান দেখে একদিনে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা উঠেছে আর মাস মাস যা আসবে তাও কম নয়। মহানই কোষাধ্যক্ষ হয়ে গেল ওদের। টাকা রইল তার হাতে।

কেদারবাবু সবই শোনেন, ইদানীং মহেশরা হাটতলাতেই একটা ঘর নিয়েছে, মহানও মাঝে মাঝে বসে সেখানে।

রতনবাবুও বুঝেছে এখন কিছুদিন মহান তার হয়েই ওদের সামলে রাখবে, আর রতনবাবুও এদিকে তার শোষণ পর্বও সমানে চালিয়ে যাবে।

সুতরাং রতনের ভাবনার কিছুই নাই, এই ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত যে ওদের আন্দোলনের সদ্‌গতি করে দেবে মহানই। রতন তাই ওই আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে তার কাজকর্ম সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

সেদিন রতনবাবু চলেছে কাঠগোলার দিকে সঙ্গে চলেছে মানিক। এখন রতনবাবু তার ব্যবসার সব কাজকর্মেই ওকে লাগিয়েছে, ছেলেটা বিশ্বাসী। রতন বুঝেছে এখন মালপত্র সে ষোলআনাই পাচ্ছে। তার উপর বাটপাড়ি করতো ওই ফটিকের দল। মানিক তা করে না, ছেলেটা সৎ, আর ফটিকদের যে মেয়ে ঘটিত বদনাম আছে, এসব মানিকের নাই।

তার চিংড়ি ভেড়িতে অনেক মেয়েকে নিয়ে ফটিকদের ঝামেলা হয়েছে, মানিকই সেগুলো বন্ধ করেছে।

ভেড়িপথ তারা দিয়ে চলেছে, শিখা চলেছে স্কুলে।

রতনবাবু শিখাকে দেখে দাঁড়ালো, জরুরী কাজ এখন তার মাথায় উঠেছে।

মানিক দেখছে মালিকের এই ভাবান্তর, আর বুঝেছে রতনের মত লোভী লোকের নজর শিখার উপরও আছে।

রতন এগিয়ে যায়—আরে শিখা! মানে ইয়ে—আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম একটা সুখবর দিতে, কদিন ধরেই ভাবছি যাবো, কতদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই, তা দেখা হয়ে ভালোই হোলো—

শিখা বলে—স্কুলে যাচ্ছি।

—পরে যাবে, চলো সুখবরটা শুনে যাবে, ওই তো কাঠগোলার অফিসে চলো।

শিখা বলে—এখন সময় নেই, তা সুখবরটা কি?

রতন বোধহয় সুখবর কি শোনাবে সেটা ভেবে ঠিক করতে পারেনি তাই মানিককেই বলে।

—চিনিস একে?

মানিক দেখছে শিখাকে, শিখাও নীরব থাকে, জানাতে চায় না যে আদৌ মানিককে চেনে। মানিকই বলে

—আজ্ঞে না তো, আর মেয়েদের ব্যাপারে আমি দূরে দূরেই থাকি স্যার।

রতন খুশীই হয়, শুধোয়

—কেন রে? এই হচ্ছে শিখা—শিখা রায়, কলকাতার কলেজ থেকে পাশ করা। এখানের শিক্ষিকা, পণ্ডিত মেয়ে।

মানিক বলে—ওরে বাবা, একে লেখাপড়া জানা তায় সুন্দরী, স্যার এসব মেয়ে একেবারে ইলেকট্রিক কারেন্ট স্যার, কাছে গেলেই সট্ মেরে ছিটকে দেবে। তাই ওনাদের থেকে দূরেই থাকি স্যার, চিনবো কি করে?

রতন বলে—মেয়েদের থেকে দূরে থাকাই ভালো। আমার গুরুদেব বলেন চরিত্রবান হতে হবে পুরুষকে, তবেই তো কর্মবীর হবে।

মানিকও পুরো সায় দেয় গুরুবাক্যে।

—তাতো নিশ্চয়ই স্যার, আপনার গুরুদেবের কথা কি মিথ্যা হয়? তাই চরিত্র একেবারে গঙ্গাজলের মত রেখেছি স্যার, একেবারে পবিত্র।

রতনবাবু বলে—ভেরি গুড, হ্যাঁ শিখা—তোমাদের স্কুলের জন্য সরকারী গ্রান্ট-এর কথা বলেছি মহানকে, কাগজপত্রও দিয়েছি চলো না অফিসে। একটু বসে যাবে, যা রোদ—ঘামছো।

শিখা বলে—চলি, স্কুলের দেরী হয়ে গেল।

শিখা ওর চোখের সামনে সশব্দে রঙীন ছাতাটা খুলে বের হয়ে গেল। রতন হতাশ, তবু সে শিখার গতিপথের দিকে একদৃষ্টে তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে।

মানিক দেখছে নাটকটা, সে ডাকে

—স্যার!

রতনের হুঁস নেই, মানিক গলা চড়িয়ে ডাকে

—স্যার, শুনছেন স্যার।

—এ্যাঁ, এবার রতনবাবুর চমক ভাঙে—অ তুমি! কি বলছ?

মানিক বলে—

কারন্টের মত ছিটা

রতন এবার গা

শিখা দেখেছে হাসি চেপে

রেখেছিল সে, স্কুল গাছগাচালি

ঘেরা মানিকের ঘ

মাঝে মাঝে দেখা হয় তাদের, শিখা অবশ্য বাড়িতেও রাজার কথা বলেনি, মানিক বৈকালে তখন সবে ঘুম থেকে উঠে নিজেই চা বানাচ্ছে স্টোভে, তার ডিউটির ঠিক ঠিকানা নেই, রাতের বেলায় হঠাৎ বের হতে হয় কোনদিন, অনেক ঝুঁকি নিয়ে নানা মাল আসে, না হয় সে সব মাল পাচার করতেও হয় রাতের বেলায় গুদাম থেকে।

তাই ডিউটির কোন ঠিক ঠিকানা নেই, মানিক নগার নৌকা নিয়েও বের হয়, গোপনে তাদের ছেলেদেরও তালিম দিতে হয় আর মালপত্রের সঞ্চয়ও করে চলেছে। রাজা জানে চিরকাল এভাবে চলবে না, যে কোনদিকই তাকে রতনের মুখোমুখি হতেই হবে, তারজন্য সেও তৈরী হচ্ছে গোপনে।

হঠাৎ শিখাকে এক ঝলক আলোর মত হলুদ শাড়ি পরে তার ঘরে ঢুকতে দেখে

বলে মানিক,

—কি ব্যাপার? ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো! এসো—এসো,

শিখা বলে—আমার নামটার মানে জানো তো? চাঁদের আলো নই, আগুনের শিখা।

মানিক বলে—বসো, কোথায় বা বসতে দিই, এখানেই বসো। একটা টুল এগিয়ে দেয়, বলে—সাবধানে বসবে, ব্যালেন্সের খেলা কিন্তু এদিক ওদিক হলেই পপাত ধরনীতলে।

শিখা বলে—তোমার মতই, এখন তো দেখি মালিকের খুব গুড বুকে আছো, চরিত্রবান সৎ কর্মী। যেদিন আসল পরিচয় জানতে পারবে, সেদিন শেষই না করে দেয়, এসব পথ ছাড়ো রাজা।

রাজা বলে—তারপর কি করবো?

শিখা বলে—কলকাতায় কত চেনাজানা—ওখানে যদি আমি চাকরী নিয়ে যাই, তুমিও যাবে সেখানে, ভালোভাবে শান্তিতে বাঁচার পথ নিশ্চয়ই পাবে, এই মিথ্যা পরিচয়ে বারুদের স্তূপের উপর বসা ঠিক নয়, বড় ভয় হয় রাজা।

রাজা বলে—আমিও সুন্দর সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলাম শিখা, কিন্তু ওই রতনবাবু সে স্বপ্ন ছারখার করে দিয়েছে। আজ সেই রতনবাবুকে জবাব দেওয়াই আমার ধ্যান জ্ঞান। মরুভূমির বুকে সবুজ ঘাস, ফুল কিছুই জন্মায় না শিখা। ওই শয়তান আমার জীবনকে মরুভূমিই করে দিয়েছে—সেখানে কোন সবুজ স্বপ্নও নেই। আবার স্বপ্ন দেখবো নতুন করে বাঁচার যেদিন ওদের শয়তানির জবাব দিতে পারবো সেইদিন। তার আগে নয়।

শিখা চুপ করে শোনে রাজার কথাটা।

শিখা বলে—এত উত্তেজিত হয়ো না রাজা, হয়তো ভুল করে বসবে, তার ফলও মারাত্মক হতে পারে।

রাজা বলে,

—তা জানি শিখা, নিজেকে সংযত করেই রাখতে চাই, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে ঝড় ওঠে, বড় অসহায় মনে হয় নিজেকে।

শিখা এগিয়ে আসে। ওর হাতটা ওর হাতে, বলে সে

—ভেঙে পড়লে চলবে না রাজা। আমি তোমার পাশে আছি। ধৈর্য ধরে থাকো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে, গাং-এর বুকে লালচে বেগুনি রং-এর আবেশ, পাখীগুলো কলরব করে ঘরে ফেলে। শিরীষ গাছের পাতা ঘুমের আবেশে বুজে

আসে, জেগে ওঠে তারাগুলো আকাশের দিগন্ত প্রসারী আঙিনায়।

শিখা বলে—চলি।

রাজা বলে—মনে হয় ছুটে যাই কাকীমার কাছে, মাস্টারমশায়ের কাছে, সব খুলে বলি, এইভাবে চোরের মত বাস করতে আমিও হাঁপিয়ে উঠছি।

শিখা বলে—না-না, মা হয়তো হৈ চৈ করবে, বিপদ হতে পারে তোমার। হয়তো আমাদেরও, রতনবাবু তখন অন্য মূর্তি ধরবে।

—তাই ভেবেই দিন গুনছি শিখা! রাজা আজ যেন ক্লান্ত, তবু তাকে এই লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে।

ফটিকের দল ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখন রতনবাবুর কাছে তাদের গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেছে মানিকের জন্য, তাদের সেই বাড়তি আয়ও নেই।

বিশেষ করে আগে হাটবারের দিন ছিল তাদেরই প্রতাপ। সারা এলাকার মানুষ, ব্যাপারীর দল মায় হাটের দোকানদারও তাদের সমীহ করে চলতো।

এরাও যার কাছে যা ইচ্ছা তোলা তুলতো। ঘাটে যত নৌকা আসতো হাটবারে লোকজন, মালপত্র নিয়ে তাদের কাছেও ফটিকের দল জোর করে নজরানা তুলতো। না দিলে মারপিট করতো, নৌকাই ডুবিয়ে দিত গাং-এ।

মানিক এটা কিছুদিন দেখেছে। দেখেছে গোলাবীর মত যারা মাছ বেঁচে তাদের উপরও নানাভাবে জুলুম করতো, অত্যাচার করতো।

রাজাই বলে রতনবাবুকে—স্যার, ওই ফটকের দলের জুলুমে এবার এখানের হাটই বন্ধ হয়ে যাবে।

—কেন হে মানিক?

—যা অন্যায় জুলুম করে ওরা, মানিক জানায়।

রতনবাবুও শুনেছে ওসব কথা, এতদিন রতনবাবু ওই ফটিকদের কাজে বাধা দেয়নি, ওদের হাতে রাখার জন্যই চটাতে পারেনি ওদের।

কিন্তু এবার সেই প্রশ্ন ওঠে না, জানে রতন, ওই মানিক ওদের সযুত করেছে। তাই বলে,

—ওদের আর একদিন ওই হাটের মধ্যেই ওষুধ দিয়ে দাও, ব্যাস সিধে হয়ে যাবে, শুনি ওদের জুলুম নাকি সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এরপরের হাটের দিন মানিক নিজেই হাটে থেকেছে, এর মধ্যে মানিকের কিছু চ্যালাও জুটে গেছে, তাদের দু'একজনকে রতনবাবুর ওখানে কাজে লাগিয়েছে।

ফটিকরা দেখে হাটে মানিকই এবার নন্দ সরকারকে নিয়ে তোলা তুলছে,

ফটিকরা অবাক। বলে তারা

—এটা কি হচ্ছে মানিক?

—রতনবাবুকে শুধোগে, তার হুকুম, হাটে তোরা একদম তোলা তুলবি না। গাং-এর কোন নৌকার কাছে তোলা তুলতে যাবি না, ওসব বন্ধ।

—মানে? একটু রুখে ওঠে ফটিক, দলের সামনে তার ইজ্জৎও ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চায় মানিক। তাই সেও শেষবারের মত ফুঁসে উঠতেই মানিক এগিয়ে যায়, ধীরকণ্ঠে বলে,

—আর ঝামেলা করবি না, ফের কথা বল্লে সেদিনের মতই ধোলাই দিয়ে সবকটাকে রতনবাবুর কাছে নিয়ে যাবো।

রাজার আশেপাশে তার চ্যালারাও এসে জুটেছে, ইঙ্গিত পেলে তারাই এ কাজ করে দেবে।

ফটিক, মণ্টার দল বুঝেছে আর তাদের সর্দারী এখানে চলবে না। ফড়ে, ব্যাপারী মায় ছোট খাট পশারী যারা নিজেদের ক্ষেতের সামান্য ফসল এনেছিল তারাও খুশী হয়, দেখে ফটিকরা চুপ করে সরে গেল হাট থেকে।

ওরা বলে—যা জুলুম করতো ওরা, মনে হতো ই হাটে আর আসব নাই।

মানিক বলে—আর অন্যায় জুলুম হবে না, সরকারকেই তোলা দেবে, অন্য কাউকে নয়।

সেদিন থেকে হাট শুদ্ধ লোকের কাছে মানিক আপনজন হয়ে ওঠে। তারা শান্তিতে বেচাকেনা করে, আর রতনবাবু দেখে তার আদায় কমেনি বরং বেড়েছে। তাই মানিককে সে হাটের দিন ডবল পয়সা দেয়।

গোলাবী সেদিন আড়ালে বলে

—সত্যি একটা কাজের কাজ করেছিস রাজা, ওই শয়তানগুলো এখন সিধে হয়েছে, যা জুলুম করতো!

রাজা বলে—শয়তানের অভাব নেই গোলাবীদি, কতজনকে সিধে করবো?

—তবু করতেই হবে রে, গোলাবী বলে!

চরণ ডাক্তার হাটতলাতে ডাক্তারখানা সাজিয়ে বসে থাকে হাটবারের দিন তার সময় নাই, বড় বড় কাঁচের জারে আগে থেকেই মিক্সচার বানিয়ে রাখে লাল—নীল রং-এর, আর বেশ কিছু পেটের অসুখের, সর্দিজ্বরের গুলিও রাখে।

মুড়ি মুড়কির মত সে সব বিক্রী করে চড়া দামে, রোগীদেরও আগাম পয়সা না নিয়ে দেখে না।

গোলাবীর বুড়ি মা-টা রাতভোর কাশে, বুড়ির জ্বরও ছাড়ে না। বউটা গজগজ করে—মরে না, যমের মুখে নিমপাতা গুঁজে দিয়ে এসেছে, যমও ডাকে না ওকে।

বুড়ি জানে ছেলে বৌ তাকে দেখতে পারে না, গোলাবীর চালাঘরেই পড়ে থাকে। গোলাবী হাটে—আড়তে ব্যস্ত, তারপর দুধের রোজ দিতে হয় বাড়ি বাড়ি, তার সময় নেই।

সেদিন বুড়ির খুব বাড়াবাড়ি, কোনরকমে বুড়িকে নিয়ে এসেছে গোলাবী চরণ ডাক্তারের কাছে, অন্য রোগীদের ভিড়ও রয়েছে।

গোলাবীর মা-টাই সব, আর কেউ নাই, থেকেও না থাকা।

গোলাবী বলে—মা কে একটু দ্যাখেন গো ডাক্তারবাবু।

চরণ কানই দেয় না, বুড়ি দেওয়ালে হেলান দিয়ে কাতরাচ্ছে। চরণ তখন অন্য কোন রোগীর বাকী পাওনার জন্য তার কাছা কোঁচো হাতড়াচ্ছে যদি লুকোনো টাকা থাকে। রোগী বলে,

—আর নাই গো, পরের হাটে দিব।

চরণ চায় নগদ বিদায়, বাকী বকেয়ার হিসাব সে জানে না,

তাই বলে—খুঁট খোল, দেখি

এমন সময় গোলাবীকে ঘ্যান ঘ্যান করতে দেখে বলে

—গতবার সাতটাকা দিসনি, তার জন্য মায় সুদ দশ ট্যাকা আগে দিবি আর ই বারের পনেরো টাকা—মোট পঁচিশ টাকা রাখ তারপর দেখবো, না দিলে মরুক তোর মা, চরণ ডাক্তার দেখবে না।

—বাবু, গোলাবী বলে—হাটে বেচাকেনা করেই দোব টাকা।

—তখনই আনবি তোর মাকে, এখন যা।

চরণ ডাক্তার হঠাৎ চমকে ওঠে, টেবিলের উপর একটা শক্ত হাতের থাবা এসে পড়ে, মুঠোয় ধরা এক বাণ্ডিল নোট।

চাইল চরণ, দেখে মানিক।

—তুমি! চরণ চেনে ওই ছেলেটাকে। ওর এলেমও জানে, ফটিকরা চরণ ডাক্তারকে সাহায্য করতো, তারাও এখন ঠাণ্ডা, চরণের গলা আর চড়ে না।

মানিক বলে—এই টাকা রইল, ওর মাকে কেন গরীব যারা পয়সা দিতে পারবে না তাদের দেখবে, যদি বেগড়বাঁই করো—তোমার ডাক্তারখানা মায় তোমাকেও গাং-এর জলে ডুবিয়ে দেব। একেবারে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন করে দেবো, বুঝলে?

মানিক বলে—গোলাবী দি, তোমার মাকে দেখিয়ে ওষুধ নে যাবে, দরকার হয় ও যাবে মাকে দেখতে তোমদের বাড়িতে। বুঝেছো ডাক্তার।

চরণ বাধ্য শিশুর মত নীরবে মাথা নেড়ে সায় দেয়। চরণ জানে ওর মুখের উপর কথা বলা নিরাপদ হবে না। গোলাবীর কেন অন্য রোগীদের অনেকেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেয় মানিক ওই ভাবে। ওই একটা ছেলেই কিছুদিনের মধ্যে এই এলাকার সাধারণ মানুষদের পাশে দাঁড়ায়।

সেদিন শিখা স্কুলে শোনে মানিকের সম্বন্ধে এসব কথা, ওদের স্কুলে কাজ করে একটি মেয়ে, স্কুল বাড়ি সাফ সুতরো করে, খাবার জল আনে, সেই বলে

—দিদি, ওই মানিকবাবু, নতুন বাবু গো, গরীবের জন্য কত করে! হাটে ওই ফটিক মুখপোড়ার দল কি নষ্টামি, হুজ্জুতি না করতো ফড়েদের ওপর, এখন সব ঠাণ্ডা। চরণ ডাক্তার পয়সা না পেলে রুগী দেখবে না, তার মুখের সামনে ট্যাকা ফেলে বলে—সবাইকে দেখবে, নালি তোমাকে তোমার ডাক্তারখানা শুদ্ধ গাং-এর জলে বুড়িয়ে দোব।

গোলাবীদির মুখেও শুনেছে কথাটা।

শিখাই সেদিন গেছে মানিকের ওখানে, দেখেছে শিখা মানিক নিজেই ওর ঘরে হাত পুড়িয়ে রান্না করে, ভাতে ভাত না হয় ডাল—কিছু মাছ ভেজে নেয় মাত্র। তাও ডাল কোনদিন পুড়ে যায়। ভাতও ধরে যায় পোড়া গন্ধ ছাড়ে।

মাছ হয়তো কাঁচাই থাকে নাহলে পুড়ে যায়।

শিখা দেখছে একটা থালায় ওই সব অখাদ্য ঢেলে রাজা তাই খাচ্ছে।

শিখা ঢুকে দেখে,

মানিক বলে—খাবে, বসে পড়ো, যা মাছ ভাজা করেছি দ্যাখো টেস্ট করে।

শিখা বলে—ওই পিণ্ডির মত ভাত, ধরা ডাল—পোড়ামাছ তাই খাচ্ছো রাজা?

রাজা বলে—নাহলে যে উপোস দিতে হবে, আর এসব খাওয়ার অভ্যাস আমার হয়ে গেছে।

শিখা দেখছে রাজাকে।

এই রাজা ছেলেবেলায় তার সঙ্গেই খাবার নিয়ে ঝগড়া করতো, মাছ ঠিকমত ভাজা না হলে খেত না।

রাজা বলে—পেট বড় বালাই, এখানে কে আর আমাকে আগের মত রাঁধা ভাত দেবে বলো? মা নেই—ও পাট চুকে গেছে, কাকীমা থেকেও না থাকা, তাই এই রাজভোগই খাচ্ছি।

শিখা তাই মাঝে মাঝে মাকে দিয়ে টিফিন কিছু বানিয়ে নেয়, কোনদিন লুচি-হালুয়া, না হয় মালপোয়া, বাড়িতে পুলি পিঠে পায়েস যেদিন যা হয় তাই আনে

টিফিন বক্সে আর সেটা নিজে না খেয়ে ফেরার পথে মানিকের জন্য নিয়ে যায়।

আজ এনেছে লুচি আলুর তরকারী আর হালুয়া।

রাজা তাই দেখে বলে—আয় বাস! কাকীমার হাতের তরকারী মুখে দিলেই হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে।

রাজা গবাগব গিলতে থাকে, তারপর খেয়াল হয় তার,

—এ্যাই রে,

—কি হলো? শিখা দেখছিল ওর চোখে মুখে আনন্দের আভাষ, এবার ওর মুখে ভাবনায় ছায়া দেখে শুধোয় কথাটা।

রাজা বলে—তোমার টিফিন একাই পুরোটা ফিনিস্ করে দিলাম।

শিখা বলে—না-না, আমি খেয়েছি।

—ছাই! নিজের জন্য আনো মায়ের কাছ থেকে আর খাই আমি, আনাবো দোকান থেকে কচুরি, রসগোল্লা?

—থাক। ওসব খাই না, শোন।

রাজা চাইল, শিখা বলে—এখানে তো সাধারণ মানুষদের কাছে হিরো হয়ে উঠছো, ভোটে না দাঁড় করায় এবার তোমাকে রতনবাবু?

হাসে রাজা—ভোটে নয়, ফাঁসীকাঠে না ঝোলায় ব্যাটা।

রাজা বলে—ও আড়তে মাছ ওজন করার সময় কি করে জানো?

শিখা চাইল, রাজা বলে।

—ব্যাটা বাটখাড়া তো দুনম্বরী বেশী ওজনের চাপাবেই, আর পাল্লার তলাতেও চুম্বক দিয়ে কেজিখানেক মাল সাঁটিয়ে রাখে, দশকেজিতে মাল দাঁড়াবে আসলে আটকেজি, এক কুইন্টালে প্রায় কুড়ি কেজি মাল সাফ।

—সেকি! শিখা চমকে ওঠে—এইভাবে গরীব জেলেদের মারে?

—তারপর দরেও কমাবে।

শিখা বলে—তাই ওরা সমবায় করতে চায়, মহানবাবু নাকি ওদের নেতা।

রাজা বলে—বিড়ালকে মাছ পাহারায় পাঠিয়েছে রতনবাবু।

শিখা বলে—ওদের জন্য কিছু করা যায় না?

রাজা বলে—তাই ভাবছি, কোন পথে এগোতে হবে সেইটাই ভাবছি শিখা।

রাজার সামনে পথের সন্ধান আপনা হতেই এসে যায়। সব পথের সন্ধান ঘটনাপ্রবাহই সামনে এনে দেয়, আর যত কঠিনই হোক সেই পথে চলতে না পারলে কাজও হয় না। রাজার কাছে কোনপথই কঠিন নয়, রাজা তাই সেই পথই বেছে নেয়।

... সারা এলাকার চাষী জেলেরা বুঝেছে রতনবাবু পদে পদে তাদের ঠকাচ্ছে, তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে, তাই তারা প্রতিবাদ করতে চায়, কিন্তু রতনবাবু তাদের সেই প্রতিবাদী মনোভাবকে স্তিমিত করার জন্যই তোর পোষা নেতা মহানকে পাঠায় সেখানে উপকারীর বেশে।

মহান এর মধ্যে এককালীন চাঁদা—মাসিক চাঁদা এসব তুলেছে অনেক টাকার। সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য মহান কখনও শ্যামপুরে, কখনও কুলতালি, কখনও মানুষমারির হাটতলায় মিটিং করে, দল বেঁধে মানুষ আসে। অনেক নেতাও আসে। তারা লঞ্চে করে আসে, এদের পয়সায় পান ভোজন করে, বনভ্রমণ করে ফিরে যায়।

আর ভাষণ ছাড়া কোন কাজই হয় না।

মহেশ, নিতাইরা বলে—ও মহানবাবু, সমবায়ের কি হলো?

মহান বলে—সদরে লিখেছি, তদন্ত হচ্ছে, সরকারী আইন কানুন মোতাবেক। সব হবে, টাকা দেবার আগে সরকার দেখে নেবে তো?

একজন বলে—কতদিন দেখতে লাগে গো?

মহানের এক চামচা বলে—সরকারের বছর কতদিনে জানো? বারো মাসে লয় হে—আঠারো মাসে, সময় লাগবে তো!

ক্রমশঃ মহেশ, নিতাইরাও অধৈর্য হয়ে ওঠে। মহানও বুঝেছে ব্যাপারটা। রতনবাবুও জানে একদিন এদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেই, তাই ফটিকের দলকে গোপনে কাজে লাগাতে হবে কারণ রাজা ওই সাধারণ মানুষের গায়ে হাত দেবে না।

ফটিকরাও মৌকা খুঁজছে, মানিকের প্রাধান্য তাদের খর্ব করতেই হবে, রতনবাবুও চায় না মানিক এতখানি বেড়ে উঠুক। তাহলে মানিকের মত ছেলে মহানের মত সাজা নেতাকে হঠিয়ে নিজেই দাঁড়াবে আর ভোটে জিতে গেলে রতনের অসুবিধা হবে। রতনবাবু এখানের ভাগ্য বিধাতা, সব ভাঙ্গা গড়া ওর মর্জিমতই হবে।

ফটিকরা এটা টের পেয়ে এবার মানিকের উপর নজর রেখেছে, আর খবরও দেয় তারা রতনকে, যে মানিকের ওখানে কেদার মাস্টারের মেয়ে শিখা প্রায়ই যায়।

অবশ্য রতনও একদিন দেখেছিল কাঠগোলার ওদিকে ভেড়ির ধারে মানিক আর শিখাকে।

মানিক মাঝে মাঝে ওই মথুরের পোড়া পরিত্যক্ত ভিটেতে আসে, এখানে এখন ভেড়ির বাঁধ তার ওদিকে শুধু মাটির ঢিবিটা পড়ে আছে, ওই মাটির অতলে রয়ে গেছে রাজার কত স্মৃতি, কত সুখের দিন।

আজ হু হু ঝোড়ো বাতাসে ওঠে নিঃস্বতার হাহাকারই। শিখা দেখে রাজা এখানে এলে বদলে যায়, তাদের হাতে পোঁতা সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটাই অতীতের চিহ্ন নিয়ে টিকে আছে নিঃসঙ্গ রাজার মতই। সবুজ জিরি জিরি পাতা কাঁপে জোলো হাওয়ায়।

শিখা বলে—এখান কেন আসো রাজা, দুঃখু পেতে?

রাজা বলে—না-না, মনের জ্বালাটাকে নতুন করে ঝালিয়ে নিতে, যেন ওদের ভুলে না যাই, মা বাবার বদলা নিতে পারিনি আজও। তাই এখানে আসি শিখা এই পোড়ামাটির তিলক একে নিতে—এ মায়ের আশীর্বাদ, এতে মনে জোর পাই—

রতন ভেড়ির দিক থেকে ওদের দুজনকে ওখানে দেখে মাত্র অবাক হয়। মানিক সেদিন নিজেকে চরিত্রবান বলেছিল, যে শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েদের থেকে দূরে থাকতে চায়—হঠাৎ মানিককে শিখার এত কাছাকাছি আসতে দেখে অবাকই হয়।

শিখাই দেখেছে রতনকে ওদিকে, সে বলে

—রতনবাবু দেখেছে আমাদের?

মানিকও দেখেছে, সে জানে কি জবাব দেবে।

ও নিয়ে সে ভাবে না, বলে—চলো, সন্ধ্যা নামছে।

এখানে রতনবাবু একটা ব্যাপারে বেশ দরাজ দিল, কোন দেবদেবীকে সে বিশেষ মানে না, তবে নদী গাং-এ তার ব্যবসা, কাঠ এর নৌকা, মাছের ব্যবসা, মায় রাতে বর্ডার পার করে গাং দিয়ে মাল আনা হয়, তাই নদীনালার দেবী মা গঙ্গাকে সে খুব মান্যি করে, অবশ্য এখানের লোকজন মা গঙ্গা, আর মা বনবিবিকে খুবই মানে।

তার পূজোও হয় নানা ঠাঁই।

তবে এই এলাকার মধ্যে শ্যামপুর গঞ্জের গঙ্গাপূজোর চেহারাই আলাদা। এক নাগাড়ে সাতদিন ধরে মেলা বসে। ঘটা করে পূজো হয় আর যাত্রা পালাও হয়, কবি গানের আসরও বসে।

এই উপলক্ষ্যে রতনবাবু শহরের নেতা—মাতব্বর, বনবিভাগের সাহেবদেরও আমন্ত্রণ করে আনে, তার বাগান বাড়িতে জেনারেটর চালিয়ে আলো জ্বালা হয় রং বেরং এর।

আর কলকাতা থেকে নাচওয়ালীর দলও আসে। ক'দিন ধরে কর্তাদের পান ভোজন নাচগানের ব্যবস্থাও হয়।

রতনবাবু এবার গঙ্গাপূজোতে কি হবে—কার দল আনা হবে, কাদের নিমন্ত্রণ করা হবে সে সব হিসাবপত্র করছে, মানিককে ঢুকতে দেখে চাইল।

—কি রে?

মানিক বলে—একটা কথা ছিল।

চাইল রতন, মানিক বলে—সেদিন ওই যে শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়েটা আপনার কথায় কান না দিয়ে চলে গেল। সত্যিকথা বলতে কি স্যার আমার মনে ব্যাথা লেগেছিল, আপনাকেও মান খাতির করে না একি কাণ্ড!

রতন বলে—মেয়েদের ব্যাপারই আলাদা রে মানিক!

মানিক বলে—না-না। আমারও জেদ চাপলো স্যার, ও হাজার হোক সেদিন হাটতলায় ওর মান ইজ্জৎ বাঁচালাম। তাই ওকে বলছিলাম স্যার—কাজটা ভালো করোনি।

রতন ওর কথায় এবার আগ্রহ বোধ করে বলে—তা ও কি বললো?

মানিক বলে—ওকে একা ভেড়ির ওদিকে আসতে দেখে বল্লাম কথাটা। ওকে বলেছি রতনবাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, এই গঙ্গাপূজোতে স্কুলের মেয়েদের নিয়ে এস্‌টেজে নাচ-গানের, প্রোগ্রামের কথা বললাম, একটা নতুন জিনিস হবে স্যার।

রতন খুবই খুশী হয়, মানিকের এলেম দেখে।

বলে সে—ও কি বল্লে?

—কি আর বলবে? একদিন নে আসবো ওকে, সব আলোচনা হবে, তবে নাচগানের জন্য কিছু খর্চা পড়তে পারে।

রতন বলে—ওর জন্য ভাবিস না, গঙ্গাপূজোর খর্চার জন্য দেখিস নি আড়ত, হাটতলায় সব কেনাবেচার উপর ঈশ্বরবৃত্তি আদায় করি। দরকার হয় নিজে থেকে টাকা দোব। শিখাকে আসতে বল একদিন।

মানিক বলে

—আপনার মত না পেলে তো পাকা কথা দিতে পারি না স্যার। বললেন—এবার বলবো ওকে, যা প্রোগ্রাম হবে স্যার—আপনার কলকাতার ড্যান্সিং পার্টিও হার মেনে যাবে।

রতন বলে—তাহলে তো ভালো হয়, দ্যাখ।

মানিক রতনের মনের সামান্যতম প্রশ্নটাকেও মুছে দেয় ওইভাবে। রতন মহানন্দে উৎসবের আয়োজন করে।

কিন্তু ফটিকের দলের মনে শান্তি নাই, কারণ রতনবাবু তাদের তেমন পাত্তাই দিচ্ছে না। অন্যবার গঙ্গাপূজোর মূল উদ্যোক্তা থাকে তারাই, বেশ কিছু টাকা, মালপানিও পায় তারা।

এবার সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে, আর এসব ঘটেছে ওই মানিকের জন্যই, ওই মানিক আসার পর থেকেই তাদের দুঃখের দিন শুরু হয়েছে। ওরা চেষ্টাও করেছিল মানিককে খতম করতে কিন্তু ছেলেটা যেন ইস্পাতে তৈরী। ওরা কোনমতেই তার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং মানিকই একের পর এক তাদের ক্ষতিই করেছে।

ফটিক মণ্টারা বাঁধের ধারে শিরিষগাছের নীচে ঘাটওয়ালার ঝুপড়িতে বসে মদ খায়, প্রকাশ্যে হাটতলায় মদ খাবার উপায় আর নেই। সেদিনও বৈকালের পর ওরা ঝুপড়িতে বসে মদ খাচ্ছে, দেখে শিখা ব্যাগ কাঁধে চলেছে হাটতলার দিকে।

সেই ঘটনার পর আর তারা শিখার পিছনে লাগেনি, আজ চোখে সবে গোলাবী নেশাটা জমেছে শিখাকে ওদিকে যেতে দেখে মণ্টাই বলে—গুরু, মাল চলেছে ওই মানিকের ডেরাতেই, দুজনে বেশ জমেছে মাইরি।

ফটিক বলে—যে যা করে করুক, ঝামেলার মধ্যে যাস নে বুঝলি, ফল নিজেরাই ভুগবে, বলে না—আগুন খেলে আংরা বেরুবে, লোহাচুর খাও—সাবল, যেতে দে।

সে বোতলেই মন দেয়।

মণ্টা কি ভেবে একটু দেখে উঠে পড়ে। ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার। মণ্টা সাবধানে শিখার নজর এড়িয়ে হাটতলায় গিয়ে গোবরার চায়ের দোকানের মাচায় বসলো।

আজ বাড়িতে মা সরুচাকলি পায়েস করেছে, শিখার মনে পড়ে রাজার কথা। বেচারা এসব ভালো মন্দ কিছুই খেতে পায় না, আজ সে কোন ছাত্রীকে খাওয়াবে বলে বেশ কিছু পিঠে পায়েস টিফিন কেরিয়ারে পুরে নিয়ে চলেছে মানিকের ঘরের দিকে।

মানিক ওকে দেখে খুশীই হয়।

—আরে এসো, এসো। ব্যাগ দেখে মনে হচ্ছে মাল ঝাল কিছু এনেছো! বের করো, দারুণ খিদে পেয়েছে।

শিখা বলে—আর তর সইছে না, আগেকার মতই পেটুক গনেশ রয়েছো রাজা?

রাজা বলে—নামটাই বদলে মানিক হয়েছি, আসলে তো সেই শ্যামপুর গঞ্জের মথুরের ব্যাটা রাজাই, মানুষটাতো বদলায়নি।

শিখা বের করে ব্যাগ থেকে টিফিনগুলো, একটা প্লেটে সাজিয়ে দেয় পায়েস আর পিঠেগুলো। রাজা এতদিনপর তার প্রিয় খাদ্যগুলো দেখে বলে,

—কাকীমার হাতের পিঠে পায়েস কতদিন খাইনি।

নিজেই খেতে থাকে, শিখা দেখছে, রাজার খেয়াল হয়

—আরে তোমার ভাগটাও গিলছি, নাও, তুমিও নাও শিখা, আগে তো একসঙ্গে ভাগ করেই খেতাম, আজও খাও নাহলে—

রাজা খুশির চোটে শিখাকে ধরে ওর মুখেই জোর করে পায়েস পিঠে দিতে যাবে, শিখা ওই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে কি আনন্দে শিউরে ওঠে বলে

—এ্যাই, এ্যাই রাজা, একেবারে আগেকার রাজাই রয়ে গেছো এতটুকু বদলাওনি।

—শিখা—রাজা ওকে কাছে টেনে নেয়।

শিখাও আবেগ ভরা স্বরে বলে—রাজা, আমার রাজা!

মণ্টা কখন এসে দরজার বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা দেখছিল ওরা কেউ তা জানে না, মণ্টাও চম্‌কে ওঠে। রাজাকে সে ছেলেবেলায় দেখেছিল, জানে তার ইতিহাস, আজ বুঝেছে ও মানিক নয়, মথুরের ছেলে সেই রাজা। সেই রাজা আজ মানিক হয়ে ফিরে এসেছে শ্যামপুরে তার প্রতিশোধ নিতে। ওই রতনবাবুই তার প্রধান শত্রু, ওর সর্বনাশ করতেই এসেছে রাজা নাম পরিচয় লুকিয়ে। মণ্টা আজ এত বড় খবরটা জানতে পেরেই দৌড়ে রতনবাবুকে জানাতে যাবে, উত্তেজনার বশে পাশে পড়ে থাকা একটা ক্যানাস্তারার টিনেই পা পড়তে সেটা সশব্দে গড়িয়ে পড়ে আর অতর্কিত শব্দে মানিক লাফ দিয়ে বাইরে এসে দেখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মণ্টাই দৌড়ে পালালো।

চমকে ওঠে রাজা, মণ্টা তার আসল পরিচয় জেনে গেছে। আর বেশ জানে এ খবর এখুনিই পৌঁছে যাবে রতনের কাছে, তার আগেই মণ্টাকে ধরতে হবে, দরকার হয় শেষই করে দেবে তাকে, রাজা দৌড়লো ওর পিছনে।

মণ্টাও বুঝেছে ব্যাপারটা, সেও প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে, যেভাবে হোক রতনবাবুর ওখানে পৌঁছতেই হবে তাকে না হলে প্রাণে বাঁচবে না সে।

রাজাও দৌড়াচ্ছে। মণ্টাকে ধরতেই হবে। থামাতেই হবে তাকে, দরকার হয় চিরদিনের জন্য মণ্টার মুখ বন্ধ করে দিতে হবে যাতে তার আসল পরিচয় ওরা জানতে না পারে, জানতে পারলেই চরম সর্বনাশ হবে, রতনবাবুর এখানে অনেক ক্ষমতা, সে রাজাকে তার গুষ্ঠীর মতই নিঃশেষ করে দেবে।

দৌড়াচ্ছে রাজা, শিখা ওই ঘর থেকে বের হয়ে আসে কিন্তু অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না, ওরা দুজনেই কোথায় অন্ধকারে মিশিয়ে যায়, শিখাও ভাবনায় পড়ে।

রতনবাবু এসময় হিসাবপত্র দেখে, তার দু'একজন বিশ্বস্ত অনুচরও থাকে, রাতে মালপত্র কি পাচার করা হবে সে সব কথাও হয়।

এখন এদের আলোচনা চলেছে ওই ভেড়ির জমির মালিকদের নিয়ে। রতনের কাছে অনেক খবরই বাগানে এসে পৌঁছায়। ও জানতে পেরেছে যে একটা

প্রতিবাদের ভাষা মুখর হয়ে উঠছে, এতদিন ওই জমির মালিকদের তেমন কিছুই দেয়নি, নিজে ভেড়ি থেকে লাখ লাখ টাকার রোজকার করেছে, অথচ ব্যাঙ্কের টাকাও শোধ দেয়নি। ফলে রতনের লাভের অঙ্ক যেমন বেড়েছে ওই সমবায়ের দেনাও সূদে মূলে তত বেড়েছে। রতন জানে ওই সব ঋণের বোঝা তথাকথিত সমবায় ভেড়ির নামে পড়বে। ওদের জমি তখন ব্যাঙ্কই নীলামে তুলবে, এত টাকা দেবার সাধ্য ওদের নাই, রতনই ব্যবস্থা করে সেই নীলাম ডেকে সেই টাকা মিটিয়ে নিজেই সব জমির মালিক হবে।

কিন্তু অলক, মহেশের দল সেটা জানতে পেরে এবার ভেড়ি ভেঙ্গে তাদের সকলের জমি ফেরৎ চাইবে তারই আন্দোলন শুরু হয়েছে। এসবের জবাব দিতে হবে, কে কে আন্দোলন করছে তাদের কি ভাবে ঠাণ্ডা করা যায় এইসব আলোচনা হচ্ছে, তার জন্য রাজাকেও কাজে লাগাতে হবে, আড়তের গঙ্গাপূজার সময় জেলেদের এবার বোনাসও দেবে না।

হঠাৎ এইসব গুরুতর আলোচনার মধ্যিখানে ঝড়ের বেগে মণ্টাকে এসে ঢুকতে দেখে চাইল রতন।

—কি রে তুই! কি ব্যাপার মণ্টা?

মণ্টা তখনও হাঁপাচ্ছে, কথা বলার ক্ষমতা প্রায় নেই, রতন ধমকে উঠতে মণ্টা বলে—জল

ঘটিতে চুমুক দিয়েই বেশ খানিকটা জল খেয়ে এবার মণ্টা বলে

—সব্বেনাশ হয়েছে রতনদা।

—মানে?

ততক্ষণ ফটিকের দলও এসে জুটেছে, মণ্টা বলে।

—ওই মানিক কে জানেন? ও শালা জালি মাল—ও এখানের মথুরের ব্যাটা রাজা গো। সেই রাজা!

চমকে ওঠে রতন, মথুরের নামটা ভোলেনি। মনে পড়ে রতনের একটা তেজী ছেলে ওই রাজা বেশ কয়েক বছর আগেই তাকেও শাসিয়ে গেছল ফিরে আমি আসবোই রতনবাবু, আর মরা মা বাপের দিব্যি, তোমার হিসেব সেদিন কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেবে এই রাজা।

রতন অবাক হয়—বলিস কি, ওই ছোঁড়াটা রাজা!

ফটিক বলে—একেবারে তৈরী হয়েই এসেছে মালিক। কে জানে কলকাতার পুলিশের চর কি না? আর তোমার কাজ কারবার, দু নম্বর পার্টিদের খবর মায় তোমার গুদামের মালপত্রের সব খবরও জেনে গেছে। এবার তোমাকে বরবাদই না

করে দেয় মালিক, খুব যে খাতির করছিলে ওকে।

এখন রতনও বুঝেছে মস্ত ভুলই করেছে সে।

রাজা এসে পড়েছে বারান্দা অবধি, মণ্টা কি বলছে শোনা দরকার, ও বাইরে থেকে শোনে রতনবাবু তার সম্বন্ধে যা জানার তা সবই জেনে গেছে, শোনে রাজা ভিতরে রতন ফুঁসছে।

—এ্যাঁ, ব্যাটা রাজা আমার চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এই মতলবে এসেছে? ফটিক, মণ্টা—ওটাকে খতম করে বাগানে ওই নিমগাছের তলে ওর মা টা যেখানে পোঁতা আছে তার পাশেই পুঁতে দিবি ওটাকে। যা—

ওরাও প্রতিদ্বন্দ্বীকে শেষ করার হুকুম পেয়ে খুশী। দৌড়ে যাবে হাতিয়ার নিয়ে কিন্তু দরজাটা খুলতে গিয়ে দেখে বাইরে থেকে বন্ধ। দরজা খোলে না।

—একি! রতন অবাক হয়ে চাইতে দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাজা। সেই বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে আটকে ফেলেছে তাদের।

রাজা বলে—খড়ের ঘর হলে জ্বালিয়ে মারতাম তোদের সব কটাকে। যেমন করে আমাদের ঘর জ্বালিয়েছিলি তেমনি করেই জ্বালাতাম, তার উপায় নাই তাই বেঁচে গেলি, তবে রতনবাবু আজ যাচ্ছি—কিন্তু তোমার হিসাব চুকোতে ফের আসবোই।

রাজা চলে যায়। ওরাও তখন বন্ধ দরজাটা সকলে মিলে টেনে লাখি মেরে ভেঙ্গে বের হয়েই দৌড়ালো রাজার সন্ধানে, রতনও গর্জায়

—খোঁজ চারিদিকে, পালাবে কোথায় ওটা, শেষ করে দে—

এদিকে ওদিকে খুঁজছে দেখে ভেড়ির বাঁধের উপর দিয়ে চলেছে রাজা।

রাজা ব্যবস্থাটা সব সময়ই করে রাখে, জানতো যে কোন মুহূর্তেই সে ধরা পড়ে যেতে পারে তাই তৈরীই থাকতো। আজ সেই ব্যবস্থাটা কাজে লাগাতে হবে।

রাজা দেখে ওই ফটিক মণ্টাদের নিয়ে রতনবাবু দৌড়ে আসছে, ওদের হাতে তালোয়ার-ভোজালি আর কিছুও আছে কি না কে জানে? ওরাও সন্ধান পেয়ে ধেয়ে আসছে।

নগাও তার নৌকা নিয়ে তৈরী ছিল, রাজাকে দৌড়ে আসতে দেখে আর পিছনে ওদের হুঙ্কার শুনেই বুঝেছে রাজা বিপদে পড়েছে। নগা বলে—রাজা আমি এখানে।

নৌকাটা জোয়ারের জলে এসে তীরে লেগেছে, রাজা দৌড়ে এসে ভেড়ি থেকে লাফ দিয়ে একেবারে নৌকায় ওঠে। রতনবাবুও দলবল নিয়ে এসে পড়েছে, বলে—ধর ব্যাটাকে, নৌকা আন!

রাজা নৌকায় উঠে এবার খোল থেকে বন্দুকটা তুলে আকাশের দিকে কয়েকটা

গুলি ছোড়ে। ওই শব্দটা উন্মুক্ত নদীর বুকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

রতনও চমকে ওঠে—একি, ব্যাটা রাইফেল পেল কোথায়? মণ্টা গুদাম থেকে বন্দুক আনতে দৌড়ছিল, ওসবও মজুত থাকে সেখানে, মণ্টা এসে বলে

—গুদামের নতুন চালানের পাঁচটা বন্দুকই নাই গো, সব ওই রাজাই হাতিয়েছে মায় গুলির বাক্সগুলোও।

রতন চমকে ওঠে—সেকি!

এবার বুঝেছে রতন রাজাও এখন শক্তিমান, আর আটঘাট বেঁধেই রাজা কাজে নেমেছে। ওকে ধরাও যায় না। ওর নৌকার ইঞ্জিনটা চালু করে নগা। অর্থাৎ মটরবোটই বানিয়েছে রাজা।

রাজা ওই বন্দুকের নির্ঘোষে রতনের বিরুদ্ধে এক সোচ্চার যুদ্ধ ঘোষণা করে চলে গেল এখান থেকে।

পরদিন ভোরেই খবরটা শ্যামপুর গঞ্জের কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়ে। গোলাবীও হাটে এসে শোনে ব্যাপারটা, নগাও নাই, গোলাবী জানতো ব্যাপারটা।

চরণ ডাক্তার তখন হাটতলায় ভাষণ দিচ্ছে

—মথুরের ব্যাটা একটা ডাকাতই হে! এখানে ঘাপটি মেরে বসেছিল কোনদিন গঞ্জেই না ডাকাতি করতো।

একজন বলে—ও কি করবে গো ডাক্তার, তুমি তো দিনে ডাকাতি করছ, আর তোমার রতনবাবু তো ডাকাতের সর্দার, তোমরা তার চ্যালা।

চরণ এহেন অপবাদে তিড়িং করে লাফিয়ে গর্জে ওঠে—কে রে? এ্যাঁ! আমি ডাকাত! তবে আসিস কেন এখানে?

গোলাবী বলে—ছেলেটাকে তুমিও চিনতে পারোনি ডাক্তারবাবু! এত রোগ চোনো—এটা চিনতে পারলে না?

চরণ বলে—আমিও সন্দেহ করেছিলাম, কিন্তু ব্যাটা পালালো। নাহলে ওকে টাইট করে দিতাম।

সাধারণ মানুষও আজ ওই ছেলেটার অভাব বোধ করে, কারণ ওই ফটিকের দল আজ আবার তাদের হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেতেই নিজমূর্তি ধারণ করেছে, তারাও জেনেছে এই মুহূর্তে রতনবাবুর কাছে তারা খুবই দরকারী জীবে পরিণত হয়েছে।

তাই হাটতলাতে মদনের দোকানে আজ চায়ের বদলে মদের বোতল খুলে বসেছে, গোলাবীকে মাছ নিয়ে যেতে দেখে বলে ফটিক।

—কটা ডিমওয়ালা পারশে মাছ দিয়ে যা, ফেবাই করে খাবো। মদের মুখে

জমবে ভালো।

গোলাবী জানে আজ ওই শিয়ালগুলোই শের হতে চায়, সেও ওদের ডরায় না, বলে—ডিমওলা মাছ নিবি আড়তে যা, রতনবাবু ডিম পেড়ে দেবে।

ফটিক বলে—এ্যাঁ, বেশ বললি মাইরি, ঠিক আছে।

শিখাও ভাবনায় পড়েছে, কেদারবাবুর সকালে একটু বেড়ানো অভ্যাস, সকালের বাতাস তরতাজা থাকে, নদীর বুকে সূর্যোদয়ও দেখার মত। কিছুটা হেটে হাটতলা ঘুরে বাড়িতে যান।

কমলা ঘরের কাজ করছে, শিখা ওদিকে পরীক্ষার খাতা দেখছে, হঠাৎ বাবাকে ফিরে আসতে দেখে চাইল সে, বলে

--ফিরে এলে যে বাবা?

কেদারবাবু হাটতলাতেই খবরটা শুনে এসে বলে

—শুনেছিস, রাজা নাকি এখানেই ছিল এতদিন নাম ভাঁড়িয়ে, রতনবাবুরা তার আসল পরিচয় জানতে কাল গুলি করে ওদের হাত থেকে পালিযেছে। একেবারে মটরবোটও রেডি ছিল। কাল সন্ধ্যায় ক'টা গুলির শব্দও শুনেছিলাম, ও যে রাজার কাজ তা বুঝিনি।

শিখা চুপ করেই থাকে, কাল সন্ধ্যায় ঘটনাটার সূত্রপাত হতে সে নিজেই দেখেছিল, কিন্তু তার পরিণতি এই হবে তা জানতো না।

কমলা বলে—সেকি! রাজা এসেছিল এখানে?

কেদারবাবু বলেন—ওই যে মানিক বলে ছেলেটি—ওই তো রাজা! কত বছর পর দেখে আমি কিছুটা অনুমান করলেও চিনতে পারিনি, কেমন যেন মনে হয়েছিল।

কমলা বলে—ছেলেটিকে দেখে আমারও রাজার কথা মনে পড়েছিল। কিন্তু পালিয়ে গেল কেন?

কেদারবাবু বলেন—রতনবাবুর চোখে ও শত্রু।

—কিন্তু ওতো এখানের মানুষের জন্যই কিছু করতো, ওই হাড়বজ্জাত ফটিকের দলের হাত থেকে এখানের মানুষদের বাঁচিয়েছিল। শান্তিতে ছিল সবাই।

কমলার কথায় কেদারবাবু বলেন—ওটা রতনবাবু চায়নি, তাই হয়তো চলে যেতে হয়েছে বেচারাকে।

কমলা বলে—সাবধানে চলাফেরা করিস শিখা, ওই বদমাইসগুলো আবার মাথায় উঠবে।

কেদারবাবু যেন কি ভাবছেন।

আর তাই ঘটেছে, রতনবাবু এবার ওই ফটিকদেরই মাথায় তুলেছে। তার জের শুরু হয় হাটতলাতেই, এতদিন ফড়ে ব্যাপারীরা রেটমত টাকা দিত হাট অফিসে। কুপনও পেতো।

এখন ফটিকের দলই আবার বের হয় তোলা তুলতে, এতদিন এটা পারেনি তারা। এখন রাজা নাই, ওরা আবার জুলুম শুরু করে চাষীদের উপর, তারাও দেবে না, ফড়েরাও রাজী নয় বেশী টাকা দিতে। শুরু হয় মারপিট, কার মালই লুটে নিল ফটিকের দল।

হাটে গোলমালও শুরু হয়, ফটিকদের জুলুমও বাড়ে, সাধারণ মানুষকে গুণাগার দিতে হয়, একটা আক্রোশ জমতে থাকে সাধারণ মানুষের মনে, কারণ যেটাকে তারা অন্যায় অত্যাচার বলে জেনেছিল আবার সেটা চালু হতে তারাও মোটেই খুশী হয়নি।

সেই ব্যাপার আবার শুরু হয় রতনবাবুর মাছের আড়তে। জেলেরা ঝুড়ি ঝুড়ি মাছ আনে, কিন্তু দেখে তাদের মাছের ওজন আশ্চর্যজনকভাবে কমে গেছে কাঁটায়। নন্দ সরকার বলে—জলটা বাদ যাবেনি? মাছের জল মরে যাবে না কি বলিস? তাই ওজনে কমে যায়।

মহেশ এমনিতে ডাকাবুকো। সে হঠাৎ ওজনের পাল্লাটা ওলটাতে দেখে সেখানে চুম্বক দিয়ে একটা কেজি পাঁচেক বাটখাড়া গোপনে সেট করা আছে।

—একি গো! ফি আধমনে পাঁচ কেজির বেশী মারছো, তালে এক কুইন্টালে

সকলেই হামলে পড়ে, গর্জে ওঠে ওরা, ফটিকের দলও রতনের ইঙ্গিতে এবার ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তুচ্ছ কারণে, মারপিট চলে, এই ফাঁকে নন্দ সরকার পাল্লার বাড়তি মাল সরিয়ে বালির নীচে পুঁতে দিয়ে গর্জায়—কি বলছ তোমরা? কি দেখতে কি দেখেছো! কই পাল্লায় কি আছে দেখাও, এই তো দুদিক সমান পাল্লা—দ্যাখো।

রতন এবার উদগ্র হয়, বলে সে

—ধরম কাঁটায় কারচুপি করলে নরকেও ঠাঁই হবে না, দ্যাখ তোরা—

এবার দেখে—হ্যাঁ পাল্লাতো ঠিকই আছে,

মহেশ বলে—তবে যে দেখলাম।

—ও তোর চোখের ভুল, চশমা নে মহেশ। রতনবাবু জ্ঞান দেয়, কিন্তু ওদের সন্দেহ যায় না।

ওরা আড়ালে বলে—অন্য আড়তেই যেতে হবে।

কে বলে—কিন্তু রতনবাবুর দাদনের দেনা?

ও তাদের জীবনের সব দিলেও শোধ হবে না তা বুঝেছে ওরা, জানে না ওই চক্র থেকে কি করে বের হবে তারা।

সামনে গঙ্গাপূজা আসছে। এদের আবাদে দুর্গাপূজার তেমন হাঁকডাক নেই, আবাদ অঞ্চলের দু'চারটে বড় বড় মোকাম যেখানে কিছু ধনী লোকের বাস, বাইরের বাবুদের আনাগোনা সেখানে দু'একটা দুর্গা পূজা হয়, এরা দেখতে যায় মাত্র।

মা দুর্গার চেয়েও এদের কাছে মা গঙ্গা—মা বনবিবিই বেশী জাগ্রত। কারণ জলে বাদাবনে এদের ঘুরতে হয়, মাছ ধরে দিন চলে বেশী লোকের তাই মা গঙ্গাকেই এরা বেশী ভক্তি করে। তার পূজো হয় গঞ্জে খুব ধূমধাম করে, সাধারণ মানুষ এতে যোগ দেয়, তার প্রস্তুতি চলে দীর্ঘ দিন আগে থেকে, গঞ্জের হাটতলায় মেলা বসে।

সাতদিন ধরে মেলা চলে, কবিগান লেটো-জারি, সারি এসব তো হয়ই, যাত্রার দলও আসে বাইরে থেকে। সে কদিন গঞ্জ নতুন সাজে সেজে ওঠে। আত্মীয় স্বজনও আসে প্রত্যেকের বাড়িতে।

অবশ্য রতনবাবুও এতে বেশ টাকা দেয়, সেটা সে সারা বছর ধরে আড়তে কেনাবেচার উপর শতকরা পাঁচটাকা হারে সংগ্রহ করে, তার থেকে রতনবাবুর অতিথি সৎকার, মেলায় সময় তার বাগানে বাঈজী নাচের খরচ, পানীয়ের জন্য খরচও করা হয়।

ঢোল গোবিন্দ দারোগা এখন এই বাদাবনে বেশ সেট হয়ে বসেছে। সে জানে এখানে রতনবাবুর নির্দেশমত কাজ করলেই চাকরী পাকা। আর মহানবাবুর মত নেতাও তাই করে, সুতরাং গোবিন্দবাবুও তাই করেই এখানে বেশ শান্তিতে চাকরী করে চলেছে।

শুধু মেলার ক'দিন একটু নজর রাখতে হয়, অবশ্য সে কদিনে আরও কিঞ্চিৎ আমদানী হয়, মেলায় জুয়ার ছক পড়ে যত্র তত্র। ওই জুয়ার ছক যারা পাতে তারা মেলাকমিটি অর্থাৎ রতনবাবুকে মোটা টাকা প্রণামী দেয়, গোবিন্দবাবুরও কিছু জোটে।

ওরা নিশ্চিন্তে ক'দিন ধরে চাষী জেলেদের সর্বস্ব লুট করে জুয়ার ছকে, বাকীটা যায় ধেনো মদের পিছনে। তারও অবাধ বাণিজ্য চলে, ওই চরণবাবুর আর এক ভাগ্নে অর্থাৎ মহান নেতার ভাই বড় নৌকায় ট্যাঙ্কি ভর্তি করে মদ আনে।

গঙ্গাপূজার আর দেরী নাই, এর মধ্যে হাটে বাজারে সর্বত্র ফটিকের দল চাঁদার খাতা নিয়ে জুলুম শুরু করে মায় গাং-এ যেসব নৌকা যায় তাদের থামিয়েও মোটা টাকা আদায় করে, না দিলে নৌকা যেতে দেবে না। বাধ্য হয়েই তাদের টাকা দিতে

হয়, উৎসব এর প্রস্তুতি শুরু হয়, রাজার কথা ক'দিনেই রতনবাবু ভুলে গেছে।

হঠাৎ এমনি দিনে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জেগে উঠে হঠাৎ অগ্নিবর্ষনের মতই রাজার কর্ম শুরু হয়, আর ঘা মেরেছে সে রতনবাবুর উপরই।

রাজা সেই রাত্রে বের হয়ে এসে ঠিক করেছে ওখানে থেকে পারেনি, এবার বাইরে থেকেই রতনবাবুর উপর আঘাত করতে হবে, জানে রতনবাবুর হাতে পুলিশ রয়েছে। গ্রামেগঞ্জে তারা হানা দেবে, তাই রাজা একেবারে লোকালয়ের শেষ সীমান্তে যেখানে সুন্দরবন শুরু হয়েছে, বসতি আর নাই, শুধু বন আর বন, সেই অঞ্চলে এসে এবার স্থানীয় কিছু তরুণদের নিয়েই তার দল গড়ে তুলেছে।

গহণ গাং ওদিকে কেওড়া বাইন গরান গোলপাতা, হিতালের জঙ্গল, এখানেই লুকিয়ে থাকে সুন্দরবনের হিংস্র বাঘ, রাজাও তাড়া খেয়ে এবার এই গহন অরণ্যের মাঝে কয়েকখানা নৌকায় নিজের বসত গড়ে তুলেছে।

এদিকেই বেশী মাছ ধরা হয়, রতনবাবুর নিজস্ব নৌকাগুলো এদিকেই মাছ ধরে, অমাবস্যা, পূর্ণিমার জোয়ারে সমুদ্র থেকে মাছের ঝাঁক আসে, ইলিশের ঝাঁক ঢোকে সমুদ্র থেকে নদীতে, গাং-এর বুকে সাদা ইলিশের ঝাঁক ঝল্সে ওঠে। আসে পমফ্রেট, ভাঙ্গন, ভেটকির ঝাঁক।

সেদিন রতনবাবুর জেলেরা দুতিন নৌকা মাছ ধরেছে। প্রচুর মাছ, নৌকাগুলো এবাব ফিরে যাবে, এমন সময় রাজার কয়েকটা নৌকা ওদের ঘিরে ফেলে।

—খবরদার কেউ নড়বি না, নড়লেই গুলি করবো।

জেলেরাও জানে বাধা দিলে সুন্দরবনের গাং-এ ফেলে দেবে, তাই জেলেরাও চুপ করে থাকে।

ওই নৌকার সব মাছ কয়েক মিনিটের মধ্যে রাজার দল তাদের নৌকায় তুলে ওদের বলে

—যা গিয়ে বলগে তোদের বাপ রতনকে—এখানে মাছ ধরতে যেন আর না আসে, এলে কেউ ফিরবি না।

লোকগুলো ছাড়া পেয়ে কোনমতে বের হয়ে আসে, ওদের দাঁড়ের নৌকা, ভাঁটার সময় উপরের দিকে যেতে পারে না, ওরা আটকে থাকে জোয়ারের আশায় তারও দেরী আছে ঘণ্টা চারেক। ততক্ষণে রাজার মোটর ইঞ্জিন লাগানো নৌকা ওইসব মাছ এনে গোসাবার আড়তে বেচে দেয়, নগদ প্রায় সত্তর হাজার টাকা হাতে আসে। রাজা ভাবছে কথাটা, তার পরিকল্পনাও কিছু করেছে সে, সেইমত কাজই শুরু করবে এবার।

মহেশকে সেদিন আড়তে ওই পান্নার রহস্যভেদ করার জন্য ফটিকরা ছাড়েনি। শুধু মহেশ কেন অন্যরাও দুচার ঘা খেয়েছে, তাদের রাগটা রয়েছে।

ওদিকে ভেড়ির জমিও পায়নি কেউ, উল্টে রতনবাবু বলেছে

—ভেড়িতে লোকসানই হয়েছে, তোরাও তো মেম্বার, এই লোকসানের টাকা তোদেরও দিতে হবে, সেটা দে—তারপর জমি নিবি।

আর আড়তে তো বঞ্চনা চলেছেই।

মহেশ, অলকরা অন্যদের ডেকে এনেছে, রাতের বেলায় মিটিং করছে তারা। কিভাবে রতনের হাত থেকে বাঁচবে তারই আলোচনা চলছে। ওরা একজনকে শ্রদ্ধা করে, তাকেই বিশ্বাস করে, তিনি কেদারবাবু, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী লোক। শহরের মানুষদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, ওদের আলোচনার বিষয় এখন একটাই।

সামনে গঙ্গাপূজা, ওদের সকলেরই খরচ-খর্চা আছে। ছেলেমেয়েদের নতুন জামা কাপড় দেয় তারা এই সময়ই, উৎসবে আনন্দও করে। কিন্তু এবার রতনবাবু ওদের সাফ কথা বলেছে।

—কোন টাকাকড়ি দিতে পারবো না। অর্থাৎ ওদের উপর তার শোষণ শাসন আরও কঠিনভাবেই চালাতে চায় রতন।

তাই মহেশরা বিপদে পড়েছে। মানুষ যতক্ষণ পারে মুখবুজে সহ্য করে, কষ্ট-দুঃখের মাঝেই বাঁচার চেষ্টা করে, কিন্তু একটা সীমা আছে সব কিছুরই। বনের হিংস্র প্রাণীরাও মানুষের উপস্থিতি একটা সীমা পর্যন্ত মেনে নেয়। কিন্তু সেই সীমা ছাড়ালেই বনের পশুও তখন মরীয়া হয়ে আত্মরক্ষার জন্যই বিপদ জেনেও মানুষের উপর আক্রমণ করে।

প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষও তেমনি সহ্য করে, কিন্তু সীমা ছাড়ালে সর্বনাশ জেনেও সে তখন বাঁচার জন্য লড়াই করে। এই জেলেদের, চাষীদের অবস্থাও প্রায় তেমনিই করে এনেছে রতনবাবু, তাই তারাও এবার প্রস্তুত হচ্ছে একটা লড়াই এর জন্যই। কেদারবাবু তবু এদের বোঝাবার চেষ্টা করেন, নিজেদের সকলকে সংঘবদ্ধ হতে বলেন, তারপর ভেবে চিন্তে পথ বের করতে হবে।

রাত নেমেছে, নদীর বুকে জোয়ারের সঙ্গে বাতাসের হানাদারির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে, হঠাৎ অন্ধকারে কাকে আসতে দেখে চাইল ওরা। আজ মহেশ কেন আবাদের সবাই জেনেছে ওর আসল পরিচয়। এগিয়ে আসছে বলিষ্ঠ তরুণ। মহেশ বলে,

—রাজা!

কেদারবাবু চাইলেন, রাজা এসে প্রণাম করে ওকে। বলে,

—তখন পরিচয় দিতে পারিনি মাস্টারমশায়, উপায় ছিল না।

মহেশ বলে—চলে গেলি হঠাৎ?

—রতনবাবু চিনে ফেলার পর এখানে থাকলে শেষ করে দিত। কিন্তু ওকে শেষ করবোই তাই চলে গেলাম। রাজা জানায়। বলে সে,

—মহেশ কাকা গঙ্গাপূজার সময় তোমাদের খর্চা তো রতনবাবু দেবে না শুনলাম।

—তুই শুনলি কি করে? কেদারবাবু অবাক হন, হাসে রাজা।

বলে—এখানের খবর দেবার লোক আমার আছে মাস্টারমশায়, তাই কিছু টাকা এনেছি পূজোয় সকলকে দিন। রাজা হাজার তিরিশ টাকা বের করে দেয়। বলে

—এ আমার নিজের রোজকার মহেশ কাকা, নিলে খুশী হবো।

কেদারবাবু বলেন—এতো হলো রাজা, এতে ওদের দুঃখ ঘুচবে আর ক'দিন? রতনবাবুর আড়তে ওরা খেটে মাছ ধরে যা পায় রতনই তা কেড়ে নেয়।

মহেশ বলে—ওই পিশাচের হাত থেকে আমাদের মুক্তি যদি মিলতো বাঁচতাম রে, আমরা নিজেরা মাছ ধরে সমবায় করতাম। যা দাম পেতাম তাতে ভালোই চলতো, কিন্তু বতন বলে—যাবি যা, তার আগে আমার দেনা মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

রাজা শুনছে ওদের কথা, সেও জানে রতন ওদের কিভাবে ঠকায়, তাই শুধোয়—কত টাকা মোট দেনা বলছে?

নিতাই বলে—শ্যালার কাছিমের কামড় রে—মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না। ওর দেনাও তেমনি, ছাড়ান পাওয়া খুবই শক্ত।

অলক হিসাবপত্র বোঝে। লেখাপড়া জানা ছেলে, এখন চাকরী না পেয়ে গঞ্জে দোকান করেছে, আর এই জেলেদেরও আপনজন। অলক বলে

—তা প্রায় লাখ দেড়েক টাকা দেখাচ্ছে। জাল, নৌকা ভাড়া, দাদনের টাকা, তার সুদ নানা ভাবে টাকাটাকে বাড়িয়েছে। ওই টাকা দিতে পারলে এরা সরে আসতে পারে নিজেরা ভালোভাবে বাঁচতে পারে রাজা, কিন্তু কোথায় পাবে এরা এত টাকা?

রাজাও ভাবছে কথাটা।

কেদারবাবু বলেন—বাড়ির দিকে চলো রাজা।

রাজা বলে—এখন সাবধানে এখানে আসতে হয় মাস্টারমশাই, জানেন তো রতনকে। এখন যাবো না, সময় এলে নিজেই যাবো কাকীমাকে বলবেন, আজ চলি।

মহেশ বলে—গঙ্গাপূজায় আসবি তো?

—দেখি, রাজা এদিক ওদিক চেয়ে অন্ধকারে বের হয়ে যায়। গঞ্জে রাতের স্তব্ধতা নেমেছে। দূরে রতনবাবুর বড় বাড়িটা দেখা যায়, ওদিকে ঘাটে নদীতে দেখা যায় নৌকাগুলো রয়েছে।

এদিকের আঘাটায় বাইন গাছের ঘন পত্রবরণের আড়ালে নগা নৌকা নিয়ে বসেছিল রাজার প্রতীক্ষায়। অন্ধকারে একটা রাতজাগা পাখী ডেকে ওঠে দুবার, নগা জানে রাজা এসেছে, এ তারই সাংকেতিক পাখীর ভাষা।

নগাও দুবার ওই ডাক ডেকে নৌকাটা বাইরে আনে, রাজা নৌকায় উঠতেই নৌকা ছেড়ে দেয়। নগা বলে,

—গঙ্গাপূজাতে আসবি না রাজা?

রাজা কোন কথাই বলে না। সে ভাবছে ওই মহেশের কথাটা।

রতনের হাত থেকে মহেশদের সরিয়ে নিতে পারলে রতনকে একটা ঘা সে দিতে পারবে। এই অসহায় মানুষগুলো বাঁচতে পারবে।

কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবে সে, তাই ভাবছে রাজা। নৌকোটা তারাজ্বলা অন্ধকারে লোকালয় পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকেছে।

আকাশে এক ফালি চাঁদের আলো, তার ম্লান আলো পড়েছে খালের জলে, বনের বুকে। সারিবদ্ধগাছগুলো খালকে যেন সসম্ভ্রমে পথ দিয়েছে।

এই আদিম অরণ্য থেকে রাজাকে লোকালয়ে ফিরতেই হবে। আর তাই রতনবাবুকে সযুত করার দরকার,। ওকে সরাতেই হবে ওই প্রতিষ্ঠার জগৎ থেকে।

গঙ্গাপূজার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছে।

রতনবাবু আলোচনা করছে ওইসব ব্যাপারে। শহর থেকে মহানও এসেছে। সে এখন এদিকের এম-এল-এ। বাঁধ-এর লাখ লাখ টাকার কাজ তার হাতে, উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ টাকাও দেবে সে।

রতনবাবু জানে স্বনামে বেনামে ওই সব কাজ সেই করবে। অবশ্য মহানকে দশপার্সেন্ট হিসাবে দিতে হয় তার জন্য। ক'বছরেই মহান নেতা হয়ে শহরে বাড়ি - ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। মিনিবাসও করেছে দুখানা।

এখন শীর্ণ মহান এর গালে আপেলের আভা এসেছে, ভুঁড়িটাও বেশ নধর হচ্ছে, আর শিখে গেছে ভাষণ দিতে। এলাকার মানুষকে শুধু আশ্বাস দিয়েই চলেছে তিনবছর ধরে। আর একবার এম-এল-এ হতে পারলেই মহানবাবু এবার মন্ত্রীত্ব পাবে, তার জন্য অবশ্য নেতাদের সে প্রণামী ভালোই দেয়। দলের ফান্ডেও মোটা টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে দেয়, সর্বহারাদের ভাত মেরে।

মহান বলে—রতনবাবু, এবার গ্রাম্য মেলার উদ্বোধন করানো হবে মন্ত্রী আমাদের কালিদাকে দিয়ে, তাতে গ্রাম উন্নয়নের ফান্ড থেকেও ভালো টাকা আসবে।

রতন টাকার গন্ধ পেতেই বলে—তাহলে তাই হবে।

আর প্রধান অতিথি হবেন জেলার নেতা—হরগোবিন্দদা।

হঠাৎ এমনি সময় আড়তের সেই সর্বস্বান্ত জেলেরা কাদা মাখা অবস্থায় এসে হাজির হয়।

ফটিক ধমকে ওঠে—এখন রতনদা মিটিং-এ ব্যস্ত, দেখা হবে না।

রতনবাবু শুধু মিটিংএই নয়, ইটিং, ড্রিংকিং ইত্যাদিতে তখন ব্যস্ত, দারোগা গোবিন্দবাবুও রয়েছে। তার অবশ্য পাঁচ সাত পেগে নেশা হয় না। এই বিশাল উদরে গ্লাশ কয়েক পানীয় কোনও প্রভাবই ফেলতে পারে না।

তাই ঢোলগোবিন্দ তখনও মদ্যপান করছে, মহান অবশ্য আগে খেতো না এসব, কিন্তু নেতা হবার পর থেকে এসব ধরেছে।

তার নেশাটা বেশ জমেছে। এমন সময় ভগ্নদূতের মত ওই জেলেদের ঢুকতে দেখে বলে—এরা এখানে কেন রতনবাবু?

জেলেটা বলে—আমরা তিন নৌকো ইলিশ, ভেটকি নে আসছিলাম, মানুষমারির গাং-এ সব লুট করে নেল বাবু।

মহান নেশার ঘোরে বলে— ঠিক আছে।

রতন খবরটা শুনে চমকে ওঠে—মানে! তিন নৌকো মাছ! কত দাম জানো? সত্তর আশি হাজার টাকা, বরবাদ হয়ে গেল।

জেলেরা বলে—ওরা আরও শাসিয়েছে ওই হরিণগাড়ার গাংএ মাছ ধরতে গেলে শেষ করে দেবে।

—সেকি! রতন বুঝেছে তার এত আমদানীতে এবার বাদ সেধেছে কেউ।

রতন শুধোয়—কার এত বড় হিম্মৎ, কে সে? কারা?

জেলেরা বলে—আজ্ঞে রাজা সর্দারের দল। রাজাকেই দেখলাম যেন।

এবার চমকে ওঠে রতন। সমূহ বিপদই ঘটবে এবার।

এই বাদা অঞ্চলে অনেক তরুণই নানা অত্যাচারে বিব্রত হয়ে মহাজনদের কবল থেকে বাঁচার জন্যই লোকালয় ছেড়ে বনে গিয়ে আশ্রয় নেবে। গহিণ বন, ঘন অরণ্য আর তার গভীরে ছড়ানো অসংখ্য খাল, সেখানে সভ্যজগতের মানুষ যায় না। সেই দুর্গম অরণ্যে তারা ঘাঁটি গেড়ে এবার গাং-এর নৌকা, মায় বসতিতে হানা দেবে।

সুন্দরবনে অতীতে ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুর দল। তারা নির্বিচারে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে নারী, পুরুষ, শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যেতো, দেশ বিদেশের হাটে

তাদের বিক্রি করতো ক্রীতদাস হিসাবে।

এখন ক্রীতদাস প্রথা আর নাই। সেই পর্তুগীজ হানাদাররা ও আর নেই। কিন্তু চম্বল উপত্যকার দস্যুদের মত সুন্দরবনের গহণে জলদস্যুরা এখনও বিরাজমান—তাদের ক্ষমতাও অনেক।

পুলিশ, প্রশাসনও তাদের কাবু করতে পারে না। রাজার উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সেগুলো সে মেনে নিতে পারেনি। তাই প্রতিকারের পথ হিসাবে সে ওই পথই বেছে নিয়েছে। রতনের ব্যবসা বাণিজ্য চলে প্রধানতঃ ওই জলপথেই। কিন্তু এবার যে হানাদারি শুরু হয়েছে তাতে প্রমাদ গণে রতন।

আজ তার লাখখানেক টাকাই গেছে, —এর প্রতিকার না করতে পারলে আরও বড় ঘা দেবে রাজা।

রতন বলে—শুনছেন দারোগাবাবু?

দারোগার চোখে তখন পরস্মৈপদী মদ্যপান করে গোলাবী নেশার আমেজ এসেছে, একটু ঘুম ঘুম আসছে, মহান স্বপ্ন দেখে সে মন্ত্রীই হয়েছে।

রতনের কথায় দারোগাবাবু তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে—এ্যাঁ! কিছু বলছেন রতনবাবু?

রতন গর্জে ওঠে—না। এদিকে আমার নৌকোয় ডাকাতি হলো, শাসাচ্ছে ব্যাটারা, আর দারোগা হয়ে ঘুমুচ্ছে? এই মহান—এ্যই দেশ নেতা? খচ্চর!

মহান এবং দারোগা দুজনেরই এহেন বাণীতে নেশা কিঞ্চিৎ ছুটে যায়, দারোগা বলে—ওই ব্যাটাদের সবকটাকে এ্যারেস্ট করবো। কালই তদন্ত শুরু করছি, ভাববেন না রতনবাবু।

মহান বলে— হ্যাঁ! রতনবাবুর নৌকায় ডাকাতি করবে! সবকটাকে ফাটকে পুরে দিতেই হবে।

পুকুরে ঢিল পড়লে একটা আলোড়ন হয়, জল কেঁপে ওঠে। সেই আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে সারা পুকুরে, তারপর ক্রমশঃ আবার সব শান্ত হয়ে ওঠে। রতনের নৌকায় ওই ডাকাতির খবর নিয়ে সারা গঞ্জে বেশ ক'দিন আলোড়ন শুরু হলো। মহেশরাও শুনেছে কথাটা। আরও দেখে রতনবাবুর নিজস্ব জেলেরাও জাল নৌকো নিয়ে আর ঐ বনের দিকে যায় না।

ঢোলগোবিন্দ দারোগা অবশ্য ধড়াচূড়া পড়ে আটজন বন্দুকধারী কনেষ্টবল নিয়ে বোটে ওই অঞ্চল ঘুরে আসে, অবশ্য বনের মধ্যে কোন খালে সে ঢোকেনি। জানে বনের মধ্যে থেকে গুলি চালাতে পারে ডাকাতরা, ওদের হাতেও নাকি অনেক আধুনিক অস্ত্র আছে। বাইরে বাইরে টহল দিয়ে মুরগীর মাংস, নদীর তাজা মাছ ভাজা

দিয়ে খাদ্যপানীয় গ্রহণ করে নদীর শোভা দর্শন করে, দু'একটা নৌকাকে জিজ্ঞাস করে— ডাকাতদের দেখেছিস?

নৌকার মাঝিরা বলে— না তো বাবু, বড় ভয় হয়।

দারোগা বলে— নির্ভয়ে চলে যা, এই গোবিন্দ দারোগাকে যমেও ভয় করে। ডাকাত তো ছার, ব্যাটাদের ধরবোই।

অবশ্য স্বাভাবিক নিয়মেই আবার সব শান্ত হয়ে আসে।

রাজার দলও সব খবর রাখে, তার লোকজনই নদীতে জেলে সেজে মাছও ধরে।

তারাও দেখেছে দারোগার নৌকাটা। অন্যরা বলে

—ব্যাটা দারোগার নৌকাতেই ঘা দেব নাকি নগাদা?

নগা বলে— না, মাছ ধরছিস ধর, আর দেখে যা, রাজা এখন ক'দিন চুপচাপ থাকতে বলেছে।

রাজা জানে এবার একটু থিতিয়ে আরও তৈরি হয়ে তাকে আরও বড় আঘাত হানতে হবে। ক'দিনেই রতনের আড়তে মাছ-এর আয়ও কমে গেছে, রতন গঙ্গাপূজার পর নিশ্চই কিছু করবে।

এই দারোগাও ঘুরে গিয়ে বলে গঞ্জে।

রতনবাবু, ওসব ছুটকো চুরি—ডাকাত কেন হবে? আমিও কম্বিং অপরারেশন করে এসেছি, তেমন কিছুই পাই নাই, অল ক্লিয়াব।

রতন বলে— তাহলে কাজকর্ম চালু করবো? কিছুদিন ওদিক থেকেও মাল আনা নেওয়া বন্ধ রেখেছি।

দারোগা, মহান দুজনেই তা জানে, এতে তাদেরও সমূহ লোকসান হচ্ছে। কারণ প্রতি চালানেই এদেরও ভালো প্রণামী জোটে, এখন তা আসছে না। তাই মহান বলে— দারোগাবাবু যখন বলছেন, শুরু করে দিন।

রতন বলে গঙ্গাপুজো যাক, দেখি মা গঙ্গা যদি দয়া করেন ভালো চালানই আনবো।

সারা গঞ্জ, আশপাশের এলাকার, মানুষ ক'দিনের জন্য সব অভাব ভুলে আনন্দে মেতে ওঠে। ধূমধাম করে পূজো হয়, হাটতলার ওদিকের মাঠে চটের ছাউনি দিয়ে বিশাল প্যান্ডেল হয়েছে।

যাত্রা হবে ক'দিন।

একদিন হবে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নাচগান। আর রতনবাবু তার বাগানবাড়িতে কলকাতা থেকে এক নাচনেওয়ালীকেও আনিয়েছেন। নামী ঘরওনার নাচনেওয়ালীর নাচও তিনি জনসাধারণকে দেখাবেন।

তবে মূলতঃ তাকে এনেছে রতন তার নামী অতিথিদের বিশেষ আপ্যায়ণের জন্য, বাগান বাড়িতেই থাকবেন জেলার নেতারা, অন্যসব নেতরা, মহান নিজে তাদের আনবে লঞ্চে করে। তার জন্য রতনবাবুর গুদামের ঘাটে অস্থায়ী জেটিও তৈরি হয়েছে কাঠ দিয়ে। কারণ নামী দামী অতিথিরা বাদাবনে এসে ভাঁটার সময় পলিকাদায় নামবেন কি করে।

অবশ্য এখানের মানুষজনের জন্য ওসব কোনো ব্যবস্থাই নেই। নারী, পুরুষ, শিশু সকলকেই হাঁটু কাদায় নেমে কর্দমাক্ত অবস্থায় উঠে আসতে হয় তীরে, লঞ্চ বা নৌকা থেকে নামাটাও খুবই কঠিন। লগিটা কাদায় পুঁতে থাকে একজন নৌকা থেকে, একটা পাটায় কৌশলে পা দিয়ে লগি ধরে ব্যালেন্সের খেলা দেখাতে দেখাতে নামতে হয় ওই কাদায়, বেকায়দা হলে ছিটকে পড়বে কাদায়। পড়েও।

সাধারণ মানুষ যারা বাদাবনের আবাদে থাকে তারা এটাকে রোজকার ব্যাপার বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু মানী লোকদের ব্যাপার আলাদা। তাই রতনবাবু এসব করেছে। গ্রামগঞ্জের মানুষ আসে ভিড় করে মেলায়, চারিদিকে জুয়ার ছক পড়েছে, এদের টাকাও চলে যাচ্ছে জুয়াড়ীদের পকেটে। ওদিকে মন্দিরের সামনে তখন নাচগান শুরু হয়েছে গঞ্জের মানুষের, গোলাবীও আজ সেজেছে।

রাজা, নগার দল আজ আর থাকতে পারেনি, উৎসবের অনেক স্মৃতি তাদের মনে ভিড় করে। রাজার মনে পড়ে বাবা, মা, কলির কথা। তাদের মাটির বাড়িটাকে মা উৎসবের সময় গোবর দিয়ে নিকোতো। ঘট এনে প্রদীপ জ্বেলে আলপনা দিত।

বাবা রাজা কলির জন্য হাট থেকে নতুন জামা কাপড় এনে দিত। কেমন নতুন একটা বাস্ ছাড়তো সেই জামা প্যান্টে। সে, কলি, নগা, ভূতো আরও অনেকে নতুন জামা প্যান্ট পরে যেতো মেলা দেখতে। মা একটা টাকা দিতো, সেটা ওই জিলিপি আর কলাই ভাজা খেতেই চলে যেতো।

মা বাড়িতে পূজোর দিন খিঁচুড়ি, পায়েস করতো। সেই স্বাদ, মায়ের মুখখানা, সুন্দর আলপনা সাজানো উঠান এখনও রাজার চোখে ভেসে ওঠে।

বনের মধ্যে নৌকার পাটাতনে বসে ভাবছে রাজা সেই স্মৃতির কথা—

নগা বলে—চলো না গুরু, একদিন ঘুরেই আসি গাঁয়ে।

রাজা বলে—রতনবাবু যদি জানতে পারে?

নগা বলে—কি করবে? মেলায় তো কত লোকই যায়, আমরা যাবো না?

রাজারও মন টানে, তাই বের হয়।

রাতেরবেলাতেই ওরা চলে আসে গঞ্জের ঘাটে। নদীতে বহু নৌকা, ডিঙ্গির ভিড়,

অনেক মানুষজন এসেছে আবাদ অঞ্চল থেকে, ওদিকে জেনারেটারের ভট্ ভট্ শব্দ ছাপিয়ে প্যানাডেলের বাদ্যিবাজনা গানের সুর ওঠে।

দোকান পশারও বসেছে, লোক গিজ গিজ করছে, নগার বাড়িটা অবশ্য এখনও আছে, তার ভাই ওখানে থাকে। নগা রাজা ওখানেই ঘুরে যাবার মনস্থ করে।

মেলায় তখন সেই নাচনেওয়ালীর অনুষ্ঠান চলেছে, মঞ্চও বাঁধা হয়েছে, সেখানে বসিরহাট থেকে কোন আলো, মাইক কোম্পানীর লোক এসে সব ব্যবস্থা করেছে।

প্যান্ডেলে প্রথম দিকে বেশ কিছু চেয়ারে বসে আছে রতনবাবু, কিছু বাইরের অতিথি। মহানও রয়েছে, ওদিকে দারোগাবাবুও রসিক দর্শকের মত বসে ওই যৌবনোচ্ছল মেয়েটির নাচ উপভোগ করছে, চরণ ডাক্তার বলে

—রতনবাবু, খাসা নাচনী এনেছেন মাইরি, এ যেন একেবারে উর্বশীর নাচ।

ও যেন স্বর্গলোকে গিয়ে উর্বশীর নৃত্য দেখে এসেছে, রতন বলে

—ভালো নাচছে তাহলে মেয়েটা? কদিন রাখবো ভাবছি ওকে।

ঢোল গোবিন্দ বলে—তাহলে তো ভালোই হয়, রতনবাবু. এসব নাচ পাবলিকের মধ্যে ভালো জমে না, বাগান বাড়িতেই বেশ ঘরোয়া আসরেই এনজয় করা যায়।

মহান বলে—তা সত্যিই, আমাদের হরমোহনদাকে আনি একদিন, মস্ত বড় নেতা।

রতন বলে—তাই হবে, আনো ওকেও, নাচনীকে রাখছি—টাকা কিছু বেশী নেবে, তা নিক।

জনতা খুশী।

ওই নাচের আসর থেকে কেদারবাবু উঠে বের হয়ে যান, তার এই সব পছন্দ নয়, দেখেছেন তিনি রতনবাবুর মাননীয় অতিথিরা মায় চরণ ডাক্তার অবধি দ্রব্যগুণে ফিট হয়ে আছে, ওখানে যা সুবাস উঠছে তিনি থাকতে পারেননি।

চরণ ওকে উঠে যেতে দেখে বলে—বেরসিক!

ওই ভিড়ের মধ্যে রাজা, নগাও ঢুকেছে, শীতের আমেজ তখনও রয়েছে, রাতে গাং থেকে হিম হাওয়া আসে। চাদরে মাথা ঢেকে রাজারাও এসেছে। দেখছে ওই নাচ।

আর দর্শকদের উন্মাদনা, কে চীৎকার করে

—ঘুরে ফিরে নাচো!

—সাবাস!

নাচ নয় যেন একটা অন্যকিছুই ঘটছে মঞ্চে। আর বসিরহাটের আলোওয়ালা ওই নৃত্যরত মেয়েটির উপর লাল নীল আলো ঘোরাচ্ছে, উন্মাদ জনতা পয়সা ছুড়ে তাদের উল্লাস জানাচ্ছে।

বের হয়ে আসে রাজা।

সরে আসে রাজা ওই কোলাহল থেকে, নদীর বুকে তারার ফুল ছিটোনো, নাচগান হৈ হুল্লার শব্দ ভেসে আসছে, হঠাৎ রাজা সামনে কাকে দেখে দাঁড়ালো।

তারার অলোয় শিখাও দেখেছে রাজাকে, সেই চলে যাবার পর দুজনের এই প্রথম দেখা।

—তুমি! শিখা এগিয়ে আসে।

রাজা বলে—গঙ্গাপূজোয় বাইরে থাকতে পারলাম না, চলে এলাম।

শিখা বলে—পূজোয় এদের জন্য টাকাও দিয়েছো শুনলাম, ভালোই করেছো, তা কি করছ এখন?

রাজা বলে—এমনি! ওই হিঙ্গলগঞ্জের দিকে মাছের ব্যবসা করছি।

রাজা শিখাকে আসল কথাটা বলতে পারে না, ওর সামনে ছোট হতে পারবে না রাজা।

শিখা বলে—বাড়ির দিকে চলো, মা তোমার কথা প্রায়ই বলেন। বাবাও খুশী হবেন দেখা হলে।

রাজা বলে—আজ সময় হবে না শিখা। মাস্টারমশাইকে বলো, আমি পরে একদিন আসবো সুবিধামত। আর জানো তো—রতনবাবু জানতে পারলে বিপদ হতে পারে।

—সাবধানে যেও রাজা, সময় সুযোগ পেলে এসো।

—নিশ্চয়ই আসবো। রাজা সরে আসে।

আজ মনে হয় সবই পেতো সে, কিন্তু ওই রতনের জন্যই তার জীবন একটা শূন্যতা, ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরে গেছে, সব কিছু হারিয়েছে সে ওই মানুষটার জন্য। তাকে সে ক্ষমা করতে পারবে না।

রাতেই ফিরে যাবে সেই বনভূমিতে রাজা। কিন্তু নগা এর মধ্যে গোলাবী, মহেশদের কাছে ধরা পড়ে গেছে। তারাও শোনে রাজা এসেছে গঙ্গাপূজার রাতে। তাই ওরাও কয়েকজন এসেছে নগার বাড়িতে।

অলকও এসেছে ওদের সঙ্গে। অলক শুনেছে রাজাই এবার সাধারণ মানুষদের সাহায্য করেছে, তাছাড়া অলকের মনে হয় তাদের আন্দোলনে রাজার সাহায্যের দরকার। কারণ একমাত্র ওরই শক্তি আছে রতনবাবুকে আঘাত কৱার।

গোলাবী বাড়ি থেকে মাছ এনেছে। বলে নগার ভাইবউকে—মাছ গুলান ভালো করে রাঁধ, কতদিন পর রাজা এসেছে, বেচারা কোথায় থাকে, কি খায়, একটা রাত তবু ভালো করে খাক, ঘরের দুধ, পাটালি এনেছি, পায়েস কর।

রাজা ওদের দেখে খুশী হয়।

অলক বলে—তোমাকেও আমাদের সাহায্য করতে হবে রাজা। ওই রতনবাবুর

অত্যাচার আমরা শেষ করবোই। আড়তের জুলুম বন্ধ করতে হবে, আর ওই ধাপ্পা দিয়ে জমি জবর দখল করে চিংড়ির ভেঁড়িও তুলে দেব। যে যার জমির দখল নোব।

রাজা বলে—জোর করে, ওসব এখন করতে যেও না অলক, মহেশ কাকা। থানা পুলিশ ওর হাতে, টাকার জোর ওর বেশী। ও ছেড়ে কথা কইবে না।

সময় এলে তখন ওসব করা যাবে, ওকে একটা একটা করে ঘা দিতে হবে, কমজোরী করে তুলতে হবে, তারপর ওইসব করতে হবে, তার আগে নয়।

মহেশ বলে—তা সত্যি, প্রথমে ওর আড়ত যদি বন্ধ করতে পারতাম এত লোক বাঁচতো, ওর আমদানীও বন্ধ হতো। অবশ্য এখনই ওরা বাদাবনের মাছ আর ধরতে যায় না ওদিকে কিন্তু আমাদের উপর জুলুম আরও বেড়েছে।

নিতাই বলে—বছরভোর আমাদের পয়সা কেটে নিয়ে গঙ্গাপূজোর নামে নিজেই বেশী টাকা মারে, মাসখানেক ধরে নাচনেওয়ালী এনে রাখে। জেলার মাতব্বর, কর্তাদের এনে খ্যামটা নাচের আসর বসায়, আর আমরা উপোস দিই।

অবশ্য এটাই সমাজের রীতিনীতি। এক শ্রেণীতো চিরকালই এইভাবে একে অন্যের উপর শাসন শোষণ করে, আর নিপীড়িত একটা সমাজ নিষ্ফল রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে, তাতে ওদের কিছুই যায় আসে না। তারা সদর্পে বলে—এমন তো হয়ই, নতুন আর কি।

অর্থাৎ সমাজের বুকে এই ধারাই চলবে, চলেও। কিন্তু মাঝে মাঝে সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। সেদিন সমাজব্যবস্থা বদলাবার এই প্রচেষ্টাকে এরা মেনে নিতে পারে না। তাদের সর্বশক্তি দিয়েই ওই শোষণকারীর দল তাদের দখল কায়েম রাখার চেষ্টা করে।

অলক জানে এই আবাদে তেমনি একটা সর্বনাশই ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু এটা আসবেই, পরিবর্তন আসার জন্য এই কষ্ট বিপদকে মেনে নিতেই হবে।

আজ রাজাকে সে ভালোবাসে। তারমধ্যে ওই প্রতিবাদী মনকে সে শ্রদ্ধা করে।

রাজা বলে—তোমাদের পাশে আছি, থাকবো। তবে ফেরার উপায় আজ নাই, বাইরে থেকেই একাজে মদত দোব।

সকালটা এখানে মনোরম, ভোর হয়ে গেছে, উৎসব ক্লান্ত গঞ্জ। কাল রাত্রিভোর অনুষ্ঠান, নাচগান দেখে সকলেই ক্লান্ত। সূর্য ওঠে তখনও লোকজন সব জাগেনি।

সকালের এই হাওয়ার রাজা বের হয়। এবার ফিরতে হবে তাকে। নগাও উঠেছে। রাজা জানে রতনবাবু, তার চ্যালারা রাতভোর মদ্যপান করে নাচগান দেখে এখন বেলা অবধিই পড়ে থাকবে নেশার ঘোরে। তারপর উঠে আবার দুচার ঢোক

পান টান করে তারপর ফিট হবে।

আজ রাজার মনে পড়ে বাড়ির কথা।

মা বাবা কলি কেউই নাই, এই উৎসবের দিনের সাজানো বাড়ির কথা বার বার মনে পড়ে।

কি আকর্ষণে রাজা বের হয়, নগা বলে

—কোথায় চল্লি, চা করছি, বেরুতে হবে আমাদের।

রাজা বলে—আসছি, দেরী হবে না।

নগা অনুমান করে রাজা যাবে ওই মাস্টারমশায়ের বাড়িতেই, শিখার সঙ্গে রাজার দেখা হয়েছে তা জানায়নি রাজা।

নগার মনে হয় ওখানেই যাবে রাজা। সেও জানে রাজার মনে শিখার জন্য একটা টান রয়ে গেছে, মুখে প্রকাশ না করলেও মনের ভাষায় তা বোঝে নগা।

নগা আর কথা বলে না, রাজা বের হয়ে গেল।

ভেড়ির লকগেটটা পাকাপোক্তভাবেই তৈরী করিয়েছে রতনবাবু। রাজা একনজর দেখে ভেড়িটাকে, বিস্তীর্ণ ধান জমি ছিল, শরতে বর্ষায় ওখানে নামতো সবুজের ঢেউ, হেমন্তে আসতো দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেতে সোনা রঙের আবেশ।

মঞ্জরীর ভারে নুয়ে পড়তো ধান গাছগুলো, আজ সেখানে বিস্তীর্ণ জলই। ওসব জমিকে শস্যরিক্ত করে, বহুমানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে রতনবাবু চিংড়ি চাষ করেছে, বিদেশে রপ্তানী করে নিজে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

তাদের জমির প্রায় সবটাই রতনবাবু জবর দখল করে নিয়ে ভেড়ি করেছে, শুধু বাস্তুভিটেটা পড়ে আছে ওদিকে, এখন আর ঘর বাড়ি নাই, মাটির ঢিবিতে পরিণত হয়েছে, শুধু অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়া গাছটা। আজ গৃহস্থের আগল, সঙ্গী তার আশপাশে নাই, গাছটা একক নিঃসঙ্গই। তবু কোথা থেকে খবর পেয়েছে সে কে জানে তার সবুজ পাতায় এসেছে লাল ফুলে স্তবক।

গাছটা ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে এই নির্জনতার মাঝে। ওই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ওই কৃষ্ণচূড়া লাল সাজে সেজে উঠে যেন বাঁচার কথাটাই সোচ্চারে ঘোষণা করছে।

—বাঃ। রাজা ওর ফুলসাজ দেখে মুগ্ধ হয়।

ও একাই যেন রতনবাবুর সব নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা করে জীবনের জয়গান গাইছে।

রাজার মনে পড়ে নিজের হাতে সে ওই গাছটাকে পুঁতে ছিল। এতটুকু চারাটা এনেছিল ফরেস্ট কলোনী থেকে। মা বলতো,

—দেখবি একদিন কত ফুল ফুটবে।

আজ সেই ফুল ফুটেছে। মা দেখে গেল না। বাবাও চলে গেল, কলিও। রাজা সেই লাল ফুল তুলে আজ ওই পোড়ামাটির স্তূপে ছিটিয়ে দেয় তাদেরই উদ্দেশ্যে।

ওই পোড়ামাটি, ছাইগুলো আজও রয়েছে তার নিঃস্বতার সাক্ষী হয়ে, রতনের নিষ্ঠুরতার প্রতীক হয়ে। রাজা ওই পোড়ামাটির তিলক আঁকে কপালে, বিচিত্র একটা অনুভূতি জাগে সারা দেহমনে। এ যেন তার মায়েরই স্পর্শ। একটা জোর পায় মনে মনে।

হঠাৎ ওই নির্জনতার মাঝে, নিস্তব্ধতার মাঝে কার পায়জোরের শব্দ শুনে চমকে ওঠে, চাইল সে।

দেখেই চিনেছে রাজা। কালকের রাতের ওই রতনবাবুর প্যান্ডেলে এই নাচনেওয়ালীই লাস্যময়ী ভঙ্গীতে নাচছিল, গাইছিল, আর তাকে লক্ষ্য করে সিটি বাজছে, কেউ টাকা ছুঁড়ছে কি পৈশাচিক লালসায়।

সেই মেয়েটাকে এদিকে আসতে দেখে চাইল, আরও অবাক হয় রাজা মেয়েটা বাঁধ থেকে নেমে তাদের উঠানেই এসে দাঁড়িয়েছে, এই অঙ্গনের শুচিতাকেই যেন নষ্ট করেছে মেয়েটা।

রাজা চটে ওঠে ওর ঔদ্ধত্যে!

রাজা শুধোয়—তুমি কে?

মেয়েটা বলে—আমি এখানে নাচ-গান করতে এসেছি, সকালে গ্রামে গঞ্জে বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসেছি।

রাজা ফুঁসে ওঠে—নাচগান করে, ছলাকলা করে পয়সা লুটছো লোটো। তা দিনের আলোয় ওই পোড়া মুখ মানুষকে দেখাতে লজ্জা করে না তোমার? এখানে কেন?

মেয়েটার দুটো চোখ চক্ চক্ করে ওঠে কি নীরব বেদনায়। এমন নিষ্ঠুর আঘাতের জন্য তৈরী ছিল না সে, নাচনেওয়ালী হলেও সে একজন মেয়ে, একটা বেদনা তার মনেও রয়েছে যেটাকে রাজার ওই নির্মম সত্যকথাটা প্রকাশ করে দিয়েছে।

বেদনাহত কণ্ঠে মেয়েটি বলে।

—তা করে বৈকি!

রাজা ফুঁসে ওঠে—ছাই করে। করলে ওই শয়তান রতনের পয়সা নে এমন রং ঢং করে নাচতে পারতে না। আর ঢং করে গাঁ বেড়াবার নামে এমনি করে সেজেগুজে ঘুরতেও পারতে না। বুঝলে খ্যামটাউলি!

মেয়েটি বলে—আমারও বাড়িঘর, মা বাবা আপনজন ছিল। সবই ছিল, নেহাৎ ভাগ্যের দোষেই আজ আমাকে এই পথে আসতে হয়েছে। আপনি আমার দাদার মত—

আপনার যদি বোন থাকতো—ওই একটা কথা আজ রাজার সারা মনে ঝড় তোলে।

গর্জে ওঠে রাজা—খবরদার, বোন! আমার বোন, মা বাবা তুলে একদম কথা বলবে না। বোন! আমার বোন যদি তোমার মত হতো আমিই তাকে গলা টিপে শেষ করে দিতাম। হ্যাঁ-হ্যাঁ তাকে বাঁচতে দিতাম না, শেষই করে দিতাম। বোন!

রাজা ওর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে যাবার জন্যই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায় ওই ধ্বংসপুরী থেকে।

মেয়েটার দুচোখে জল নামে, হয়তো সে আজ খ্যামটাউলি, মানুষের একটা বিকৃত রূপকেই দেখেছে সে বারবার, তবু তার অন্তরের সেই চিরজাগ্রত নারীত্ব আজ কি দুঃসহ অপমানে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে।

তার চোখে নামে অশ্রুধারা, নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনাকে এত নির্মমভাবে সে কোনদিন অনুভব করেনি।

কিন্তু তার এছাড়া আর করারও কিছু নাই, জীবন তাকে এই পরিবেশের মধ্যে এনে ফেলেছে, তবু এর মাঝেই বাঁচতে হবে কাজলীকে। কাজলীও তা জানে।

তাই পায়ে পায়ে রতনবাবুর বাগানের দিকে এগিয়ে চলে। ক'দিন হলো কাজলীবাঈ এসেছে শহরতলীর এলাকা থেকে তার বাজনদারদের নিয়ে এখানে।

এই প্রথমই সে এখানে এসেছে, ওদের বায়না ধরার দালাল নিধুবাবু অবশ্য কাজলীকে অনেক বায়নাই দেয়, শহরের বাবু, শেঠদের বিশেষ অনুষ্ঠানেও যায়, সেখানে নাচগান এর 'তারিকা' আলাদা। পরিবেশও আলাদা।

নিধুবাবু বলে—আবাদেও দুচার জন টাকার কুমীর আছে রে, দুহাতে টাকা দেয়, তবে একটা হাল্‌কা ফুলকা লচকদার নাচগান চাই।

মেঠো লোক তো—

কাজলী প্রথমে রাজী হয়নি, নিধুবাবু অবশ্য বলে

—মাসখানেক সেখানে দলবল নে সুন্দর ফুল বাগানে থাকবে।

কাজলি বলে—নরকেই বাস করি, তার আবার ফুলবাগান! তা কত টাকা দেবে তোমার ওই বাদাবনের শিয়াল রাজা?

নিধু বলে—তোমাকেই দেবে দশ হাজার, বাজনদারদের আলাদা। আর থাকা খাওয়া ফিরি, মাছ-দুধ-মান্‌সো যত পারো খাবে।

হাসে কাজলী—তাহলে বায়না কিন্তু পাঁচহাজার চাই, কুন বাদাবনে যাবো, ট্যাকাটা এখানে রেখে যাবো। বাকী পাঁচ নোব ওখানে।

অবশ্য কাজলী এখানে ভালোই আছে, বাগানবাড়ির ওদিকের ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা

হয়েছে, সঙ্গে তার কাজের মেয়েও রয়েছে। কাজলী এত সুখ সুবিধার মধ্যেও কেমন যেন উদাস হয়ে ফেরে। ওই কথাগুলো বারবার মনে পড়ে কাজলীর।

রতনবাবুর এখানে উৎসবের জের এখনও কাটেনি, মেলা এখন ঝিমিয়ে এসেছে, উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার মত পুঁজি এখানের মানুষের সীমিত।

তাই মেলা ভাঙ্গছে, নাগোরদোলা, ঘূর্ণি—দুমুগুওয়ালা মানুষের ভেলকি সব চলে গেছে এখান থেকে নৌকায় মালপত্র তুলে। কিছু দোকান পশার এখনও টিকে আছে, আর আছে ধোনা, দিশী, চোলাই ইত্যাদির ঠেক।

রতনবাবুর বাগানে অবশ্য উৎসব থামেনি, সেখানে মহান শহর থেকে নেতা, মাতব্বর, কর্তাদের দু'চারজনকে আনে, দারোগাবাবুও জোটে সন্ধ্যায়। বেশ জমিয়ে আসর বসে নাচের আসর।

রতন অবশ্য এই আসর নিয়ে বসলেও নিজের কাজকর্ম ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে মেলায় বর্ডারের ওপর থেকেও মান্যগন্য অতিথিদের এনে খাতিরদারি করেছে, তারাও বলে যায় এবার বেশ বিরাট চালানই পাঠবে, প্রচুর দামী মাল আসবে।

রতন সেইমত ফটিক মণ্টাদের পাঠিয়েছে বোট নিয়ে, ওরা রাতের অন্ধকারে এদিকের মাঝ গাং-এ অপেক্ষা করবে।

সেইমত ফটিকরা বেশ কয়েক ঘণ্টা বোট চালিয়ে এসে হাজির হয়েছে সীমান্তের ওদিকের গাং-এ, বিস্তীর্ণ গাং-দূরে সুন্দরবনের বনরেখা অন্ধকারে বিলীন।

এরা বোটের আলো নিভিয়ে নোঙর করে রয়েছে, দূরে দু'একটা বোট, লঞ্চ চলে যায়, আবার স্তব্ধতা নামে। হঠাৎ অন্ধকারে নদীর বুকে একটা আলো জ্বলে ওঠে। একবার লাল, একবার নীল, বারবার তিনবার ওদিকের আলোটা জ্বলতে ফটিকও এদিক থেকে তিনবার ওইভাবে আলো জ্বালে। এই তাদের পরিচয় পত্র আদানপ্রদান হয়ে গেল।

এবার বড় বোটটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে এদের বোটের গায়ে লাগাতে ফটিক এগিয়ে যায়। ওদিক থেকে একজন বলে ওঠে—ফটিক ভাই!

তারপরই মাল, পেটি—বাক্স সব তাড়াতাড়ি এদের বোটের খোলে ওরা তুলে দেয়, কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ, ফটিকের হাতে একটা এটাচি দিয়ে বলে—আসলি মাল, হুঁসিয়ার, অর্থাৎ অনেক দামী মালই পাঠাচ্ছে এবার।

ফটিকরাও বোট চালু করে দেয়। তখন মাঝ রাত, ঘণ্টা সাতেকের পথ, রাতারাতি যতটা পথ এগিয়ে যেতে পারে ততই মঙ্গল, এসময় এদিকে টহলদার বোট বিশেষ থাকে না। কারণটা ফটিকও কিছু অনুমান করে।

রতনবাবু নানা বিভাগের অনেক লোকজনকে হাতে রাখে, তাদের কাছে রতনবাবুরও গতিবিধির, কাজকর্মের অনেক খবরই থাকে, তাই রতনবাবুই ফটিকদের দিনক্ষণ বলে

দেয়, সেইমত তারা মাল নিয়ে যাতায়ত করে।

তেমন কোন বিপদ তাদের হয়নি।

ফটিক বোটের মাথায়, পিছনে মণ্টা ইঞ্জিনটাকে চালু রেখেছে, রকেট অন্য ক'জন এখন একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে, পরে তাদের ত জেগে উঠে ডিউটি দিতে হবে।

বোট দুটো চলেছে ওরা বড় গাং ছেড়ে পথ কমাবার জন্যই বনের মধ্যেকার খাল দিয়ে চলেছে, তখন আঁধার মুছে আসছে, পূব আকাশ তখন ঝিনুকের মত সাদা—রূপালী ভাব এসেছে, এরপর আসবে গোলাপী আভা।

সারা সুন্দরবন জেগে উঠছে, পাখীদের কলরব ওঠে। হরিণ-এর পাল বোটের শব্দে দৌড়ে পালালো উজ্জ্বল রেখার মত। বাতাসে খল্‌সে—গরাণ ফুলের সুবাস, নদীর জল ফুলের ঝরা পাপড়িতে চন্দনের রং ধরেছে, আর ঘণ্টা তিনেকের পথ, তাদের চেনা গাং-এ এসে গেছে ফটিকরা। বনের মধ্যে খালটা থেকে দুদিকে দুটো সরুখাল বের হয়েছে, ওরা এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ খালের সামনে থেকে একটা ছিপ এগিয়ে আসছে, আর দুদিকের দুটো খাল থেকেও দু তিনটে বোট বসে তিনদিক থেকে ফটিকদের ঘিরে ফেলে।

গর্জে ওঠে একজন—খবরদার! গুলি করলে কেউ বাঁচবি না। বোট ফুটো করে ডুবিয়ে দেব সব কটাকে, বাঁচতে চাস বন্দুক ফেলে হাত তুলে দাঁড়া।

ফটিকই বন্দুক তুলেছিল, একটা গুলি তার বন্দুকেই লাগতে সেটা ছিটকে জলে পড়ে যায়, এরাও থেমে যায়। এগিয়ে আসে বোটটা, ফটিক চমকে ওঠে—রাজা!

রাজা গর্জে ওঠে—হ্যাঁ, নেমে আয় বোট থেকে।

মানে! ফটিক ইতি উতি করতে রাজা, নগারা ওদের বোট থেকে এদের নৌকায় লাফ দিয়ে পড়েছে। সঙ্গে আরও কয়েকজন, রাজা বলে—সব কটাকে বেঁধে ওই নৌকায় তুলে নে যা।

ফটিক বাধা দিতে রাজার এক লাথি খেয়ে সে খোলের মধ্যে ছিটকে পড়ে, আর রাজার লোকরা ওদের পাঁচ ছ'জনকে বেঁধে খড়ের বাণ্ডিলের মত তুলে এনে অন্য নৌকা গাদা করে।

রাজা বলে—একটাকে ছেড়ে দে ওই ডিঙ্গিতে ও চলে যাক।

নিজেই একজনকে বাছাই করে রাজা বলে—তুই যা, গিয়ে তাদের বাপ রতন বাবুকে বলগে রাজা ওর সব মাল, মায় ওই ফটিকদেরও আটকে রেখেছে। পাঁচলাখ টাকা কাটিখালের জঙ্গলে লোক দিয়ে পাঠাতে হবে সাতদিনের মধ্যে। নাহলে ওর চ্যালাদেরও খতম করে দোব, ওর সব মালও হজম করে দোব, যা—বলগে তোর বাপকে।

লোকটা ছাড়া পেয়ে একাই প্রাণ নিয়ে নৌকা বাইতে থাকে, যেভাবে হোক বাঁচতে

হবে, খবরটা পৌঁছে দিতে হবে রতনবাবুকে।

রতনবাবু তখন স্বপ্ন দেখছে, বাগানে বেশ জোর মহফিল বসেছে, মহান, দারোগাবাবু—সদরের দু'একজন মাথাও এসেছে, রতন ওই চিংড়ি এক্সপোর্ট এর একটা বড় কনট্রাক্টই পাচ্ছে এবার। মহানই মৎস্যমন্ত্রীর সঙ্গে লাইন করে বেশ কিছু টাকা ও বের করছে ফিশারী ডেভেলপমেন্ট স্কিমে।

রতন বলে—তোমারও কিছু থাকবে মহান। তারপর সামনে ইলেক্‌সন আসছে। ভোটের খর্চাও আছে। মহানও জানে রতনবাবুর দয়া না হলে ভোটে সে জিততে পারবে না। তাই সে বলে

—ভেড়ির টাকা পাবেনই, আর বিদেশের অর্ডারও এনে দিচ্ছি, শুধু মাছ যোগান দেবেন আর ডলার আসবে ঘরে, চাইকি একবার ফরেনও ঘুরে আসবেন। ও ব্যবস্থা আমিই করে দেব।

চরণ ডাক্তারও বাঘের পিছনে ফেউ এর মত এসে জোটে, বিনা পয়সার মদ, মাংস মেলে এখানে। চরণও ধুঁয়ো ধরে—তাই যান রতনবাবু, ফরেনেই ঘুরে আসুন, মেমসাহেব দেখবেন।

রতন স্বপ্ন দেখে বিদেশে গেছে সে।

মনে পড়ে আজ বিদেশী মালের বড় চালান আসার কথা, ঘড়ি দেখে, এতক্ষণ তো ওদের এসে পড়ার কথা। পাটের গাঁট কয়েকটা উপরে থাকবে—আর নীচে থাকবে লাখ লাখ টাকার মাল, সোনার বিস্কুটও কিছু আসার কথা, এখনও এল না।

ফটিকদের উপর রাগ হয়, ব্যাটারা আকর্মা। রাজা যতদিন ছিল ঠিক সময়ে পুরো মাল নিয়ে এসেছে. এরা যেন অন্য মতলবে চলে, আবার ভয় হয়, নতুন বি এস এফ এর লোকজন আসেনি তো? তারা যদি ধরে ফেলে!

কিন্তু সে রকম বদলির খবর নাই, মহানও তাকে বলেছে লাইন ক্লিয়ার।

নাচগান চলেছে, মহানও উসখুস করে, মাল এসে পৌঁছলে সেও বেশ কিছু টাকা পাবে, কিন্তু মালের খবর নাই, উত্তেজনার বশে বেশী করেই মদ গিলছে সে।

হঠাৎ এমনি সময় সেই দলের একজনকে ঝোড়ো কাকের মত আসতে দেখে চাইল, রতন এগিয়ে যায় উৎকণ্ঠা নিয়ে, শুধোয়

—সব ঠিক ঠাক এসে গেছে তো রে নোটন?

নোটন ওই বাদাবন থেকে ছাড়া পেয়ে ওই উজানেই ডিঙ্গি বেয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁচছে। হাফাচ্ছে সে, বলে

—সব্বোনাশ হয়েছে মালিক।

—মানে! রতন গর্জে ওঠে—কি হয়েছে? ফটকেরা কোথায়?

—নোটন বলে, বনে!

—বনে কি করছে ব্যাটারা? রতন ধমকে ওঠে—কি করছে তারা?

নোটন বলে—অজ্ঞে রাজা সব মালসমেত বোট আটকেছে, ফটিকদেরও বেঁধে রেখেছে বনে।

রতন কি ভাবছিল, মাল এসেছে নিরাপদেই এই স্বপ্নই দেখছিল, তাই বলে

—বেশ করেছে!

তারপরই চমক ভাঙ্গে, এবার যেন বজ্রাঘাত হয় তার উপর, বিপদের গুরুত্ব বুঝে চমকে ওঠে—কি বললি? মাল সমেত ওদের বনে আটকে রেখেছে রাজা? সেই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটার এত বড় হিম্মৎ!

মহান, দারোগোবাবুও এসে পড়ে, চরণ ডাক্তার ওদিকে নিবিষ্ট মনে মুরগীর ঠ্যাং চুষছে, মদ্যপান করছে।

নোটন বলে—হ্যাঁ, বল্লে সাতদিনের মধ্যে পাঁচ লাখ টাকা না দিলে ওদেরও মেরে ফেলবে।

—ফেলুক! তবু মাল দিক, রতনের কাছে ফটিকদের থেকে মালের দাম অনেক বেশী। কিন্তু নোটন জানায়—ওদের তো মারবেই, সব মালও হজম করে নেবে ওরাই!

রতন এবার গর্জে ওঠে—শোন দারোগোবাবু, ব্যাটা কালকের ছেলে আমার সর্বনাশ করবে? মহান—এ্যাই শালা নেতার বাচ্চা, তোমাদের পুষেছি কেন হে? ভোটে জেতাবো, ট্যাকা দোব, মাল খাওয়াবো, আর আমার এত বড় লোকসান হবে দেখবে না?

মহানের প্রভূত লোকসান হয়ে গেল, তাছাড়া কিছু না করতে পারলে সামনের ভোটেও দাঁড়াতে পারবে না। তাই বলে,

—আমি সদরে গিয়ে বলছি কর্তাদের, স্টেপ নিতেই হবে, দরকার হলে ওই অঞ্চলের জলদস্যুদের অরাজকতা নিয়ে এসেম্বলীতে কোশ্চেন করবো, জবাব চাইব হোম মিনিস্টারের কাছে।

রতন এবার গোবিন্দবাবু দারোগাকে শাসায়,

—তুমি কি করতে আছো এখানে হে দারোগা? ফূর্তি করতে? আমার সর্বনাশ আর তোমাদের হবে পৌষমাস?

দারোগাও এবার বুঝেছে তাকে বিক্রম দেখাতেই হবে, হাজার হোক দারোগা, তাই সে নেশার ঝিমুনি কাটিয়ে বিশাল মৈনাকের মত দেহ কাঁপিয়ে বলে,

—ওদের এ্যারেস্ট করবোই, সারা সুন্দরবনে কম্বিং অপারেশন চালাচ্ছি, দেখবেন ওই হারামাজাদাকে দলবল সমেত ধরে আনছি, মালও পাবেন, আপনার লোকদেরও

ছাড়িয়ে আনছি, নো ফিয়ার।

—তাই করো! রতন গর্জে ওঠে—ওদের ধরা চাই।

ওদিকে নাচও থেমে গেছে, নাচওয়ালী কাজলীও শুনছে ওদের কথা। রাজা না কে রতনবাবুর সমূহ ক্ষতিই করেছে, এখন পাঁচ লাখটাকার ফেরে ফেলে দিয়েছে তাকে।

চরণ ডাক্তার নেশায় বুঁদ, সে চোখবুজেই বলে—

—এ্যাই নাচ থামালে কেন? চালাও।

এবার একটা শক্ত হাত তার কাঁধটা চেপে ধরতে চাইল চরণ

—কে বাবা?

দেখে রতনই তার ঘাড় ধরে টেনে তুলেছে, রতন বলে

—বাড়ি যাও, ঢের হয়েছে, আমি মরছি নিজের জ্বালায় উনি নাচ দেখবেন মদ গিলে? শালা খচ্চর!

চরণ এবার ধাতস্থ হয়। রতন গর্জাচ্ছে,

—ওই রাজাকে হাতে পেয়েও ধরতে পারলাম না, ওর বাপ মাকে শেষ করেছি, ওটাকেও করতেই হবে। এ্যাই দারোগা ধরে আনো ওটাকে, না হয় বাদাবনে দেখা পেলে গুলি করেই খতম করে দেবে।

মহান বলে—তাই ভালো, শত্রুর শেষ রাখতে নাই, বুঝলেন দারোগবাবু, ওকে শেষ করে রিপোর্ট দেবেন—লড়াই করতে গিয়ে মারা গেছে, ফিনিশ। বাকী আমি সামলে নেব। ডায়েড ইন এ্যাকশন

দারোগা বলে—তাই হবে, কালই বের হচ্ছি বাদাবনে।

বিশাল এলাকা জুড়ে এই অরণ্য, মানুষের বসবাসের অযোগ্য। ঘন বন, চলা ফেরা করার উপায় নাই, সূর্যের আলোও ঢোকে না। জোয়ারের সময় বনভূমি জলে ডুবে যায়, ভাঁটায় জাগে। তখন পলিতে থকথকে, যার মাটি ফুঁড়ে উঠেছে শূলের মত শিকড়গুলো, পা পড়লে গেঁথে যাবে। বনের মধ্যে সেই এক ধরনের গাছ, বাইন কেওড়া-গরান, হিতাল প্রভৃতি আর খালগুলো ওর বুক চিরে চলে গেছে, পথ চেনা দায়। অভিজ্ঞ বাওয়ালিও খাল চিনতে না পেরে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরে। এ হেন বাদাবনের গাং-এ এসেছে ঢোল গোবিন্দ দারোগা বোট নিয়ে, সঙ্গে আট দশ জন সশস্ত্র কনেস্টবল, এদিক ওদিক ঘুরছে তারা।

সঙ্গে সেই মাঝিটাও রয়েছে, তারা এসব বনে যাতায়াত করে, খালগুলো চেনে, এই অঞ্চলকেই বলা হয় হরিণগাড়ার গাং। সেই ভোরে ওদের ওই গাং এই ধরেছিল রাজার দল, ওই খালের মুখে।

দারোগা লোকজনদের বন্দুক লোড করে সতর্ক থাকতে বলে এগিয়ে যায়, বলে—রাজার দলের মুখোমুখি হলেই দরকার হলে ফায়ার করতে হবে।

কিন্তু কোথায় রাজা, কোথায় তার দল, কেউ কোথাও নেই, শূনশান বনভূমি, এদিক ওদিক দেখে হতাশ হয় দারোগা,—কই রে! এখানে তো কেউ নাই।

মাঝি বলে—তাহলে অন্য কোথাও সরে গেছে হুজুর, ছিল তো এইখানেই। ওই সূত থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা।

একটু ফাঁকা ডাঙ্গামত জায়গা রয়েছে গাং-এর ধারে, তার ওদিকেই সুরু হয়েছে বনভূমি, দারোগা বলে ওর লোকদের—চলো, একটু নেমে দেখতে হবে।

একজন বলে—বাদাবনে ঢুকবেন স্যার? ডাকাতই নয় বাঘও থাকে এখানে!

ঢোল গোবিন্দ গর্জে ওঠে—ভীরুর দল, পুলিশে কাজ করতে গেলে সাহসী হতে হবে, কর্তব্যপরায়ণ হতে হবে, চলো—আমি সঙ্গে আছি, ভয় কি!

তবু একজন নামতে নামতে বলে—স্যার, বাদাবনের বাঘ খুব শয়তান! একেবারে চুপিচুপি আসে, টেরও পাবেন না, টের পাবেন যখন ঘাড়ে কামড়ে ধরবে তখন আর করার কিছুই থাকবে না।

দারোগা বলে—দুজন বনের দিকে বন্দুক নিয়ে নজর রাখ, আমি এদিকটা দেখছি, ব্যাটারা যাবে কোথায়?

গোবিন্দবাবুই বিশাল দেহ নিয়ে সাবধানে নদীর ধার ধরে এগোতে থাকে, পিছল মাটি, ক'ঘণ্টা আগে জোয়ারে ডুবে ছিল, এখন জেগেছে, নদীর জলস্তর অনেক নীচে, ঢালু কাদায় ভরা নদীর তীরভূমি, কেওড়া গরাণ গাছগুলোর নীচে দিয়ে চলেছে ঢোল গোবিন্দ, তার কনেস্টবলদের সামনে সে তার বীরত্ব, সাহস দেখাতে কসুর করে না।

হঠাৎ কিসের শব্দ শুনেই চমকে ওঠে—বোধহয় রাজাদের কেউই হবে, না হয় বাঘও হতে পারে, ঢোল গোবিন্দর মুখ থেকে অজান্তেই বের হয় কাতর আর্তনাদ... ব-ব-বাঘ!

তারপরই ঘুরতে গিয়ে পা পিছলে যায় ঢোল গোবিন্দর আর বিশাল দেহটা স্থানচ্যুত হতেই পা দুটোও বিশ্বাসঘাতকতা করে, ঢোল গোবিন্দ ছিটকে পড়েছে ওই ঢালু তীরভূমিতে আর বিশাল দেহটা পিপের মত ওই পলিকাদায় গড়াতে গড়াতে গিয়ে সবেগে সশব্দে জলেই পড়েছে,— ছপাং।

কোনমতে ওঠে গোবিন্দ, সর্বাঙ্গ তখন কাদার প্রলেপে ভরা। ওই অবস্থাতেই রিভলবারটা বের করে দেখে বাঘ নয়, সামনের কেওড়াগাছের ডালে কয়েকটা বাঁদর তার ওই বিচিত্র মূর্তি দেখে দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসছে।

গর্জে ওঠে ঢোল গোবিন্দ—এ্যাই রাস্কেলের দল, দাঁত বের করা হচ্ছে, গুলি করে

খুলি উড়িয়ে দেব, গোবিন্দ দারোগাকে চিনিস না?

বাঁদরের দল লজ্জা পেয়ে সরে যায় অন্য ডালে, দুজন কনেস্টবল অনেক কসরৎ করে ওই চলমান কাদার পাহাড়কে ডাঙ্গায় তোলে।

গজরাচ্ছে কর্দমাক্ত দারোগা সাহেব।

নৌকায় উঠে এবার ওই দারোগার কর্দমাক্ত পোষাক ছেড়ে সর্বাঙ্গে ধুয়ে মুছে লুঙ্গি পরে বসে এবার পানীয়ের সন্ধান করে।

বোট বের হয়ে আসে বন থেকে তদন্ত শেষ করে, ওদিকে গাং-এ দুটো জেলে নৌকা মাছ ধরছে, দারোগা তাদেরই শুধোয়

—রাজাকে দেখেছিস ? তার দলকে?

লোকগুলো বলে—না তো!

তারপরই দারোগাবাবুর নজর পড়ে ওদের নৌকার খোলে রাখা তাজা ইলিশগুলোর দিকে। দারোগা বলে—গোটা কয়েক ইলিশ দে, লোকটা বলে—দাম!

এবার একজন কনেস্টবলই গর্জে ওঠে—দারোগাবাবুকে ইলিশ দিয়ে দাম নিবি? ব্যাটার লাইসেন্স আছে মাছ ধরার, পারমিট? লোকটা চুপ করে যায়, ওসব ওদের নাই, সামান্য মাছ ধরে,

মাছগুলো নিয়ে দারোগাবাবুই বলেন—যেতে দাও।

দয়া করেই ছেড়ে দেয় ওদের, ততক্ষণ মাছভাজা দিয়ে পানীয়ের পর্ব শুরু হয়েছে তদন্তের পর।

রাজার আস্থানা এখন বনে মধ্যে একটা খালে, খালটা এখানে বেশ চওড়া, দুদিকে ঘন বন, আর দুতিনটে সরুখাল বনের মধ্যে ঢুকে গেছে।

অর্থাৎ বের হয়ে যাবার পথ অনেক, রাজা সেদিন ওই বোটসমেত ফটিকদের ওই বন থেকে সরিয়ে আরও এদিকে এই তিনমোহানীর খালে আস্তানা গেড়েছে।

অবশ্য তার চর অনুচররা সর্বত্রই ছড়ানো। তাদের অনেকেই এদিক ওদিকের গাং-এ মাছমারা সেজে ঘোরে।

তারাই খবর আনে রাজার কাছে।

— দারোগাবাবু লোকজন নে এসেছিল মধুখালির গাং-এ, বনেও ঢুকেছিল।

— তারপর?

রাজার কথায় ওরা বলে—ফিরে গেল, বুঝলো—ক'খান ইলিশ ধরলাম, তাও কেড়ে নে গেল ব্যাটা মোটকা দারোগা।

রাজা বলে—যাক্! তাহলে ঘুরছে গাং-এ, একটু নজর রাখবি।

ওদিকে খালের ভিতর নৌকার খোলে হাত পা বাধা ফটিক, মণ্টার দল বসে আছে। এরা খাবার অবশ্য দেয়, মোটা ফাটা লাল চালের ভাত আর কোনোদিন কুমড়ো পিয়াজ আলুর তরকারী আর মাছ।

ফটিক কদিন মদ পায়নি, বলে—মদ নাই?

একজন গাং এর নোনা জল তুলে দেয়—নে খা! শালা রতনবাবুর জামাই।

রাজা বলে—তাই, তোর বাপ যদি টাকা দেয় তবে ফিরে গে মদ গিলবি গঞ্জে। না দেয়—যাবি ওই গাং এর তলে। ফটিক, মণ্টারা ক'দিনেই বুঝেছে রতনবাবু যদি না ছাড়ায় তাদের চরম বিপদই হবে।

ফটিকও ভাবছে কথাটা। সেইই বলে রাজাকে,

—ওই রতনবাবুর ওখানে আর কাজ করবো না রাজা।

মণ্টাও বলে—হ্যাঁ, আমাদের মজুরিও পাই না ঠিকমত।

ফটিক বলে—আর ওর গোলামী ভালো লাগে না রে, মনে হয় ওসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তোর এখানেই থাকবো।

নগা শুনছে ওদের কথা, বলে ওঠে সে

—রাজা, এযে দেখি ভূতের মুখে রাম নাম রে?

ফটিক বলে—সত্যি, তোদের দলেই থাকবো।

রাজা চেনে ওদের বলে—তোরা তো পচা আলু রে। রতনবাবু তোদের পচন ধরিয়ে দিয়েছে, এখানে থাকলে দুদিন পর আমাদেরই সর্বনাশ করবি, আর ফটিক শোন, ডাকাত আমি নই। ওই রতনের সর্বনাশ করার জন্যই এসব করেছি, তোরাও ছিলি আমার বাবাকে যখন মারে, মাকে যখন শেষ করে তখনও। ঘরে আগুন দিয়েছিলি তোরাই! বল?

ফটিক চুপ করে থাকে, রাজা বলে

—তোদেরও এর দাম দিতে হবে, তোদের সবকটাকে আমি চিনি।

রাজা চলে চায় ডিঙ্গি নিয়ে বড় বোটের দিকে, ফটিক বেশ বুঝেছে কোন কৌশলেই তারা বের হতে পারবে না। যদি না রতনবাবু তাদের ছাড়াবার ব্যবস্থা করে।

রতন আশা করেছিল দারোগা ওদের ধরতে পারবে, না হলেও ওদের পাত্তা করে আসবে, কিন্তু শুধু হাতেই ফিরেছে ঢোল গোবিন্দ, রতন থানাতেই ছিল। ওদের ওইভাবে ফিরতে দেখে বলে,

—কোন কম্মের নও তুমি দারোগা, একেবারে ট্যাড়স্।

ঢোলগোবিন্দ হার মানতে চায় না, বলে সে

—লোক লাগিয়েছি, খবর আসবেই, দরকার হয় আবার যাবো বাদাবনে।

—থাক, মুরোদ বোঝা গেছে। রতন গজগজ করে,

সে এবার বিপদেই পড়েছে, কারণ অন্ধকার জগতের কারবারেও একটা অলিখিত নিয়ম আছে, তারা সেগুলো মেনে চলে, নাহলে খুন খারাপিও ঘটে যায়, আর এমন নিপুণভাবে সেগুলো ঘটে যে তাকে এ্যাকসিডেন্টই বলা হয়।

শীতলগঞ্জের দেবু ধাড়াও অন্ধকারের ব্যবসায় একবার ব্যাপারীদের অনেক টাকার মাল হাপিস করে সরে গেছল, দাম দেয়নি, এ নিয়ে অবশ্য সোরগোল, থানাপুলিশও হয় না, এসব খবর সীমিত থাকে মহাজনদের মধ্যেই।

দেবু ধাড়াই রতনবাবুকে এই পথে এনেছিল, ক্রমশঃ রতনবাবু টাকা, লোকবল দিয়ে এখন নিজের ব্যবসা বাড়িয়েছে, দেবু ধাড়া মাসতিনেক শীতলগঞ্জেও আসেনি, মোটা টাকা মেরে শহরে গিয়ে অন্য ব্যবসা শুরু করেছিল।

তার তিনচার মাস পর এখানে জমি জায়গা দেখতে এসেছিল, নিজের পানসীতে করে যাচ্ছিল, মাঝ নদীতে সেই পানসীর তলার কাঠ খুলে যায়, ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেবু ধাড়া রায়মঙ্গলের অতলে তলিয়ে গেছল।

লোকে জানে দুর্ঘটনা, এমন ঘটনা নদীনালার দেশে ঘটতেই পারে, কিন্তু রতন জানে একাজ কাদের, ওই অন্ধকারের মানুষদের হাত অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। তাদের অসাধ্য কিছুই নাই, তাদের মালের দাম যথাসময়েই মিটিয়ে দিতে হবে।

এর মধ্যে তাদের কাছেও খবর চলে গেছে, তারা ওসব জানে না। রতনের কাছে তাদের লোকও আসে।

রতন বলে—দেখলেন তো কোন মালই আমার হাতে আসেনি।

কিন্তু তারা বলে—আপনার লোকের হাতে সব মাল ডেলিভারি দিয়েছি, আমাদের পুরো টাকা দিতে হবে, আপনিই যে আমাদের টাকা মারার জন্য এসব ডাকাতির নাটক করছেন না তা কি করে বলবো বস্‌কে? টাকা দিতেই হবে।

রতন ঘাবড়ে যায়—এসব কি বলছেন?

সেই লোকটি বলে—এসব আপনার ব্যাপার, আপনি বুঝবেন, পনেরোদিনের মধ্যে সব টাকা পৌছে না দিলে আর মাল দেব না, আর এ টাকা আদায় না হলে ফল ভালো হবে না তাতো জানেন, পরে খবর নোব রতনবাবু।

লোকটি শেষ কথা শুনিয়ে চলে যায়, রতনবাবুও ভাবনায় পড়ে।

তবু মাল পেলে ওদের টাকা শোধ দিতে পারবে, তবে লাভ হবে না এই চালানে। কারণ পাঁচ লাখটাকা রাজার দলকে দিতে হলে তার আর কিছুই থাকবে না, লাভের গুড় পিঁপড়েতেই খেয়ে নেবে, তবু ব্যবসা বহাল রাখতে গেলে, বাঁচতে হলে ওই

অন্ধকারের জীবদের টাকা মিটিয়ে দিতেই হবে রতনকে।

রতন বুঝেছে এবার তার সামনে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু সহজে ভেঙ্গে পড়বে না সে, আর বুঝেছে ওই দারোগা, মহানের মত নেতাদেরও সাধ্য নেই এই বিপদ থেকে তাকে বাঁচাবার।

তাই বাধ্য হয়েই পুরো পাঁচলাখ টাকা নিয়েই ওদের কথা মত কুলতলির জঙ্গলের বড় খালের বাঁদিকের বড় কেওড়াগাছের উপর ওই টাকাটা রেখে আসে।

দিন পার হয়ে যায়, রতন দূরে অপেক্ষাও করে ঘাপটি মেরে, কিন্তু কাউকে দেখে না, কোন নৌকাও যায় না ওদিকে, সূর্য অস্ত যেতে অন্ধকার নামে, রতন জানে টাকা ওখানেই রয়েছে, ওই মুখ আধারির সময় টাকাটা আনতে গিয়ে দেখে টাকাটা সেখানে নেই।

কখন কেউ ওই বনের ভিতরের দিক থেকে এসে ওটা নিয়ে গেছে। চমকে ওঠে রতন, তাহলে টাকাও গেল, তার মালও চলে গেল এত টাকার। এবার কি হবে?

রাত নামছে, নৌকার লোকরা তাড়া দেয়

—চলে আসুন বাবু, টাকা যখন নিয়েছে কাজ হবেই।

রাজা নৌকায় বসে আছে দেখা যায় নগা ফিরছে তখন সন্ধ্যা হয় হয়, হাতে সেই এটাচি।

রাজা বলে—ওরা দেখেনি তো?

নগা বলে—গাং-এ তফাতে ওব্যাটা খাপ্ পেতে ছিল, আমরা সূত বয়ে বনে ঢুকে পিছন থেকে মাল নে এলাম, দেখে নাও, ঠিকঠাক আছে কিনা, ওই রতন শালাকে বিশ্বাস নাই।

টাকা পুরোই আছে। রাজা বলে—যা, ফটকেদের ছেড়ে দে, বল গে—বোট নে চলে যাক।

রতন ফিরেছে তখন অনেক রাত, ঘুমও হয় না আজ। চারিদিক থেকে লোকসানই শুরু হয়েছে। ভোর হয়ে আসছে, রতনের একটু চোখ বুজে আসে, এমন সময় ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠে বন্দুকটা তুলে নেয়।

স্বপ্ন দেখছিল সে রাজা দলবল নিয়ে এবার তার বাড়িতেই হানা দিয়েছে, কেড়ে নোব সব, মায় প্রাণটুকু অবধি। রতন বন্দুক তোলে,

ফটিক বলে—আমি গো রতনদা! ফটিক-মণ্টা আমরা!

রতনের সম্বিৎ ফেরে, ধাতস্থ হয়ে এবার ওদের দেখে,

—তোরা! ছেড়ে দিয়েছে তাহলে ব্যাটা! মালপত্র?

ওটারই তার বেশী দরকার, ফটিক বলে

—হ্যাঁ, সব মালপত্র নে এসেছি, চলেন।

রতনও বের হয়, বোট থেকে মালপত্র সব নামছে গুদামে, রতন কিছুটা আশ্বস্ত হয়। —তাহলে ব্যাটা ছেড়েছে তোদের?

ফটিক বলে—এবার ওর ডেরার খবর এনেছি রতনদা, ওখানেই হানা দিয়ে ব্যাটা রাজাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসবো।

—পারবি! রতনও তাই চায়, বলে সে—তাই করবো, তোরাই নয় এবার দারোগাও যাবে পুলিশ ফোর্স নিয়ে।

গঞ্জের মানুষের কাছেও কথাটা ছড়িয়ে পড়ে কোন রন্ধ্র দিয়ে, মহেশ, নিতাই অলকরাও শুনেছে কথাটা। রতনবাবুকে এবার একটা মোক্ষম ঘা দিয়েছে রাজা।

কেদারবাবুও বাড়িতে সেদিন কথাটা বলেন, কমলাদেবীও খুশী, কিন্তু শিখা আনাজ কুটছিল, সে বলে

—বাহাদুরীর কাজ কিছুই করেনি রাজা,

—কেন? কমলা বলে

শিখা জানায়—মা একজন চোরকারবার করে, কালাধান্দা করে সে নিশ্চয়ই দোষী, তার জন্য পুলিশ আছে, আইন আছে, কিন্তু তাই বলে তার মাল আটকানো—এটাও ঠিক নয়।

কেদারবাবু বলেন—কিন্তু পুলিশ, নেতারাও যখন কিছু করছে না তখন?

শিখা শোনায়—তাই বলে নিজের হাতে আইন তুলে নেব? এটা ঠিক নয় বাবা।

শিখা উঠে যায়, ওর স্কুলের বেলা হয়ে গেছে। শিখাও শুনেছে কথাটা, রাজার উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে তা শিখাও জানে, রাজাকে চলে যেতে হয়েছে।

শিখাই বলেছিল রাজাকে এখান থেকে শহরে যাবে তারা, সেখানে যেভাবে হোক বাঁচবে, শিখা শহরে একটা চাকরীর ব্যবস্থাও করেছিল, কিন্তু রাজা যেতে চায়নি।

তার বুকের জ্বালাটাকে ঠিক বুঝতে পারেনি শিখা। তাই অভিমানই হয়েছিল তার রাজার ওই প্রত্যাখানে, কিন্তু রাজা এখান থেকে চলে গিয়ে বাদাবনে একটা অমানুষ হয়ে উঠবে তা ভাবতেও পারেনি শিখা। তাই রাগটা শিখার রাজার উপর বেড়েই চলেছে। রাজার এই কাজগুলোকে তাই সে সমর্থন করতে পারে না।

রতনবাবুর এখন অনেক টাকাই লোকসান হয়ে গেছে, সেই অন্ধকারের বস্ এর টাকা অবশ্য মিটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজার দলের ভয়ে আর নতুন মাল আনতে পারেনি, সেই ব্যবসাও এখন বন্ধ রাখতে হয়েছে।

ফলে তার নজর পড়েছে মাছের আড়ত আর ভেড়ির দিকে, জেলেদেরও চাপ দিচ্ছে বাকী টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। তাই বেশী করে টাকা কাটছে, ওদিকে ভেড়ির জমি যাদের নিয়েছে তাদেরও কোন টাকাই দিচ্ছে না।

হাটতলাতেও বাড়ছে ফটিকদের তোলার উপদ্রব। তাদের মালিকের দাবী আরও টাকা চাই, ফলে অত্যাচারও বেড়েছে।

জেলেরা—সাধারণ মানুষও নাজেহাল হচ্ছে, জেলেদের অনেকেই এবার আলোচনা করে, অলক অন্যরাও এসেছে।

কেদারবাবুকেও ডেকেছে তারা, রাতের অন্ধকারে তাদের গোপন মিটিং হয়, সদরে চেষ্টা করছে তারা কোন ব্যাঙ্ক যদি টাকা দেয় ওরা সমবায়ই করবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক চায় তাদের কাছে কোন আমনত, গ্যারান্টি নাহলে এত টাকা তারা কি করে দেবে? কিন্তু এদের সে সামর্থও নাই।

সেদিন রাতে এইসব আলোচনাই চলছে, স্তব্ধ রাত্রি, হঠাৎ কাদের আসতে দেখে চাইল এরা।

—তোরা! মহেশ চাইল—রাজা, নগা!

ওদের দেখে এরাও চমকে উঠেচে, রাজা বলে

—কি হল গো মহেশকাকা, চমকে উঠলে যে?

মহেশ সামলে নেয়, ওদের সম্বন্ধে রতনবাবু গঞ্জে অনেক কথাই রটিয়েছে।

রাজাও তা জানে, বলে—অবশ্য আমার বদনাম দেবার লোকের অভাব নাই তা জানি, তবে কিছু কাজ করতে গেলে ওসব গায়ে মাখলে চলে না।

প্রণাম করে রাজা মাস্টামশাইকে। রাজা বলে

—ভালোই হালো তোমরা সবাই রয়েছো, তা তোমাদের সমবায়ের কি হলো? রতনবাবুর খপ্পর থেকে বের হতে পারলে?

মহেশ বলে—কই, কোন পথ তো দেখি না, এত টাকা কে দেবে আমাদের, দেড় দু লাখ টাকা তো কম নয়। রাজা বলে—নগা, শোন

নগা এগিয়ে আসে, চাদরের তল থেকে একটা পুটুলি বের করে বলে

—নাও কাকা দুলাখ আছে, ওই রতনবাবুর দেনা মিটিয়ে নিজেরা জাল নৌকা করে এবার সমবায় করো। আর একটা কথা, যথা ধম্ম কাজ করবে, লাভ এর টাকা সমবায়ে জমাবে, পরে ও টাকা ফেরৎ দিতে হবে কিন্তু, অন্য কাজে লাগবে, রাজী?

ওরা হতবাক। মহেশ, অলকরা ভাবতেই পারেনি এইভাবে এত লোকের বাঁচার সমস্যাটার এত সহজে সমাধান হবে।

কেদারবাবু দেখছেন রাজাকে, ওরা কেউ জানে না যে রতনবাবুই এটাকা দিয়ে এসেছে

রাজাকে। আর রতন রটিয়েছে সে পুলিশ দিয়েই জোর করে রাজার ডেরা দখল করেছিল, ওরা সবাই পালিয়েছিল ভয়ে, তবে মালপত্র লোকদের সেই উদ্ধার করে এনেছে, তার সঙ্গে টক্কর দেবার সাধ্য রাজার নাই এই কথাটাই রটিয়েছে সে গঞ্জে।

আরও ঘোষণা করেছে রাজাকে সে দু চারদিনের মধ্যেই ধরে ফেলবে।

তাই কেদারবাবু শুধোন—এত টাকা তুই কোথায় পেলি রাজা?

রাজা বলে—কিভাবে পেয়েছি? নিজের চেষ্টাতেই রোজকার করেছি মাস্টারমশাই, কোন অন্যায় করিনি। আর এ টাকা রোজকার করেছি ওদের রতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই। এটাকে কাজে লাগাও মহেশকাকা, অলক।

আজ ওরা রাজার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।

মহেশ বলে—এর প্রতিটি পয়সা কাজে লাগবে রাজা। আর সমবায়ের লাভ হবেই। অনেক ঠকেছি আমরা, আর ঠকতে রাজী নই।

নিতাই বলে—অলক, কাগজপত্র সব তৈরী করো, রতনবাবুর হিসাবটাও বের করো, কালই তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ওর খপ্পর থেকে বের হতে চাই আমরা।

সকলেই রাজী, আজকের রাত যেন তাদের জীবনের দুর্ভোগের শেষ রাত হয়, রাজাই আজ তাদের সকলকে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে।

সকালেই আড়তে ধূপধুনো দিয়ে ভক্তিভরে গণেশের মূর্তিতে প্রণাম করে নন্দ সরকারের দিন শুরু হয়, অবশ্য আড়তের কাজ সকাল থেকেই চালু হয়ে যায়।

রাতভোর মাছ ধরে সার সার নৌকা মাছ নিয়ে আসে আড়তে, নন্দ ততক্ষণে কাটা পাল্লা খাটিয়ে ধূপধুনো দিয়ে নেয়, ফটিকরাও এসে পড়ে।

ঘাটে তখন রাজ্যের নৌকার মাছ মারার দল ঝুড়িতে করে রকমারি মাছ আনে। ওদিকে গাদা করে মেয়েরা বাছাই এর কাজ শুরু করে।

দিনের মাছমারার দল ভোরেই বের হয়ে গেছে, দিনভোর মাছ ধরে তারা ফিরবে সন্ধ্যার মুখে। সন্ধ্যার পর আবার আড়ত সরগরম হয়ে ওঠে। এর মধ্যে মাছ চালানের হিসাবপত্র হতে থাকে।

রতনবাবুও একটু বেলায় এসে আড়তে বসে ক্যাস নিয়ে। অমাবস্যা, পূর্ণিমার কোটালের দুতিন আগে থেকেই নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছের আমদানীও বেড়ে যায়, গোণের সময়। অমাবস্যার ভরা কোটাল গেছে।

নন্দ বলে—ফটিক, চা টা খেয়ে নে, নৌকার ঝাঁক আসতে শুরু করবে, ফটিকরা চা খায়, তখনও কোন নৌকার দেখা নাই। বেলা বাড়তে থাকে আড়ত প্রায় শূন্য, দু'একজন মাছমারা ছিটকে ছাটকে আসছে বড় দলের তখনও দেখা নাই।

নন্দ সরকার দূর গাং এর দিকে চেয়ে কোন নৌকার সন্ধান না পেয়ে বলে—ব্যাটারা সব গেল কোথায় রে, একটারও দেখা নাই! ফটিকও অবাক হয়—তাই তো গো।

রতনবাবুও এসে পড়ে, সেও আড়তের স্তব্ধতা দেখে অবাক হয়, এ সময় জেলেদের চীৎকার, মাছের স্তূপ—কলরব নানা কিছুতে আড়ত ভরে থাকে, আজ একেবারে শুনশান! রতন বলে,

—কি ব্যাপার রে, কেউ নাই?

এমন সময় দেখা যায় মহেশ, নিতাই, নিরাপদ, মদন, অলক অন্যদের। আজ নৌকাতে নয় তারা হেঁটে আসছে ভেড়ির উপর দিয়ে দল বেঁধে। পিছনে আরও অনেক মানুষই।

রতন অবাক হয়—কি ব্যাপার, ওরা কেউ মাছ ধরতে যায়নি দেখছি।

এসে পড়ে মহেশের দল। রতন বলে

—কি রে? কেউ জালে যাসনি? কি হলো তোদের?

ওরা নীরব। রতন ধমকে ওঠে—জবাব দিচ্ছিস না যে?

ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসে অলক, হাতে একটা ফাইল, অলক বলে

—ওরা আর আপনার জালে যাবে না রতনবাবু।

—মানে! রতন গর্জে ওঠে—যাবে না বল্লেই হলো? আমার এত টাকা দাদন গিলে বসে আছে বাবুরা আর দেনা শোধ দেবে না?

অলক বলে—দেনা শোধ দিতেই এসেছে ওরা।

—মানে? রতন অবাক হয়।

মহেশ বলে—আপনার দেনার হিসাবে তো দিয়েছেন।

ওটা রতনের কাছ থেকে ওরা নিয়েছিল ক'দিন আগেই, মহেশ বলে।

—সেই টাকা আপনি লিয়ে লেন, আমাদের পোষাচ্ছে না এখানে, আপনার আড়তে আর মাছ দেব না। কই গো মাস্টার—হিসাব বের করো। রতনবাবু আমাদের টাকা বুঝে লিয়ে সই করে দ্যান।

সকলেই স্তব্ধ শুধু বাতাসের গর্জন ওঠে। রতনও ভাবতে পারেনি যে এত টাকা এরা শোধ করে দেবে, তাই বলে সে,

—যদি টাকা না নিই?

অলক বলে—আমরা কোর্টে গিয়ে হিসাব মত টাকা জমা করে দোব। আর কাল থেকে মাছও দেব না। টাকা নিতে হয় নিন—নাহলে কোর্টেই যাবো।

রতন বুঝেছে ওরা তৈরী হয়েই এসেছে। আর কোর্টে টাকা জমা দিলে সে টাকা বের করতেও কম হ্যাঁপা পোয়াতে হবে না। তাই গুম হয়ে বলে

—সরকার, খাতাপত্রগুলো আনো, কাউকে এক পয়সাও ছাড়বে না। পুরো টাকা আদায় দিতে হবে।

নিজেই গদিতে বসে এবার টাকা জমা নিতে থাকে রতন।

আড়তের কাজ সেদিনই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ এরাই বেশী মাছ ধরে আনতো। এরাই ছিল তার বাঁধা লোক, এতদিন ধরে এদের মাছেই সে আড়ত চালিয়েছে। বাকি যারা মাছ আনে তাদের স্থিরতা কিছু নেই। তারা যখন যেখানে মাছ ধরে তার কাছাকাছি আড়তেই মাছ নিয়ে যায়, তাদের উপর ভবসা করে আড়ত চলে না। তাই রতন এবার বিপদে পড়েছে, আমদানী তো কমেছেই আর তার চেয়ে বড় কথা বাবার আমলের আড়ত যা এতদিন ধরে রমরম করে চলেছে তা বন্ধ হয়ে যাবে এটা ভাবতেই পারে না। রতনবাবুর মানসম্মান জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে।

কিন্তু লোকসান দিয়ে আড়তই বা চালানো যায় কতদিন? রতন দেখে ওই মহেশ, নিতাই, মদনের দল এখন নিজেরাই মাছ ধরে গোসাবার আড়তে মাছ দেয়।

সেখানের আড়তদারও এদের ভালো দর দেয় আর এরা দেখেছে ওজনও ঠিক দেয় মালিক। রতনবাবুর মত সবদিক দিয়ে তাদের ঠকায় না, তাই তারাও দুটো পয়সার মুখ দেখে। ওরাও বুঝেছে রতনবাবু এতকাল তাদের নির্মমভাবে ঠকিয়ে এসেছে, তাদের রাগটাও এবার প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে।

রতনবাবুর কাছে একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে ব্যাপারটা। ওই গরীব মানুষগুলো হঠাৎ এত টাকা পেল কোথা থেকে? কে জানে আজকালকার রাজনীতি বিচিত্র ধরনের, রতনবাবু এতদিন এই বাদা অঞ্চলের সম্রাট হয়েছিল। পঞ্চায়েতের প্রধান হতো সেইই তার দলবল, কিছু পেটোয়া ব্যক্তিই হতো নির্বাচিত। চরণ ডাক্তারও পঞ্চায়েতের সভ্য, সেটা হয়েছে ওই রতনের দয়াতেই।

চরণের সাধ এবার এম এল এ হবে, কিন্তু মহানকে হঠানো মুস্কিল। ... চরণই খাল কেটে কুমীর এনেছিল, কারণ মহানকে এখানে এনেছিল সেইই, দূর সম্পর্কের ভাগ্নে, সেটাও লতায় পাতায় সম্পর্ক।

চরণ দেখেছে ক'বছরেই মহান শহরে বিশাল বাড়ি, গাড়ি করেছে। তার এক ভাইকে দোকান করে দিয়েছে, অর্থাৎ টালির ঘর থেকে শহরে এখন প্রাসাদ বানিয়েছে।

কিন্তু চরণ পঞ্চায়েতে থেকে ছিটে ফোঁটা নিয়েই খুশী থাকতে বাধ্য হয়েছে। তেমন কোন উন্নতিই হয়নি তার, আর মহানও তাকে পাত্তাই দেয় না। ছাদে ওঠার জন্য মই লাগে, উঠে গেলে আর মইটার দরকার হয় না, মামাকে আর দরকার নাই।

চরণের গিন্নীও তাই চরণকে বলে

—যম জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা! কথাটা সত্যি হলো তো?

চরণ স্ত্রীকে বলে—দ্যাখো না এম এল এ এবার আমিই দাঁড়াবো। চরণও স্বপ্ন দেখে নেতা হবার।

তাই মহানের সম্বন্ধেই রতনবাবুকে এখন দু'একটা সে কথা বলে। সেদিন চরণই সন্ধ্যার আড্ডায় রতনবাবুকে বলে,

—রতনবাবু, ওই জেলেদের টাকা কে দিয়েছে কিছু জানেন?

রতন চাইল, চরণ বলে—ঠিক কিনা জানি না, তবে এখন দেখি মহানকে ওই অলকের সঙ্গে বেশ হেসে কথা টথা বলতে। কুলতলি গাঁয়েও প্রায় যাচ্ছে মহান, শহরের কোন মক্কেলকে ধরে ওদের টাকার ব্যবস্থা করেছে কিনা কে জানে?

রতন কথাটা শোনে মাত্র। এটা নিয়ে সে ভাবছে, মহান তার জন্য কিছুই করতে পারেনি, রাজাকে ধরতে পারেনি, দারোগাও যাবে বলেছিল, যায়নি বাদাবনে। দু একবার নামকাওয়াস্তে গেছে আর ফিরে এসেছে শূন্য হাতে।

রতনের এদিকের আড়ত প্রায় বন্ধই, তাই রাতের ব্যবসা শুরু করতেই হবে, কিন্তু ভয় হয় রাজা যদি এবার মাল আটকায় বিপদ হবে। তবুও ঝুঁকি নিতেই হবে, টাকা তার চাই। আর রাজাকেও জবাব এবার দেবে সে। তাই ভাবে তৈরী হয়েই যাবে সেও, মৌকা পেলে রাজাকেই গুলি করে শেষ করে দেবে।

গ্রামের মানুষ রতনের সঙ্গে একটা যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, এখন তাদের হাতে টাকাও আছে, শান্তিতে আছে তারা, এসবের মূলে ওই রাজাই।

রাজাও এখন ওই শেষ লোকালয়ের ওদিকেই রয়েছে। অন্য কারো নৌকার উপর তার নজর নাই, বরং এই এলাকায় যারা দুচারটে ডাকাতি করতো, তাদেরই নিরস্ত করেছে।

সাধারণ যাত্রী মালবাহী নৌকায় হানাদারি বন্ধ হয়েছে। রাজা তার দলবল মাছ ধরে, এদিকের গাং-এ মাছের অভাব নাই, ওই করেই ভালোই আছে তারা।

তবু রাজার সেই জ্বালাটা কমেনি, শ্যামপুরগঞ্জের খবরও তার কাছে আসে। মহেশদের সঙ্গেও দেখা হয়। তারাও বলে,

—বাড়িতে ফিরে আয় রাজা।

রাজা বলে—যাবো না, তার জমি তো সব ওই রতনের ভেড়িতে।

—একা তোর জমিই নয়, সারা গায়ের লোকের জমি রয়েছে, তারাও ফেরৎ পায়নি।

রাজা বলে—আড়ত তো গেছে, এবার ওই ভেড়ির জমিই দখল করে নাও।

মহেশ বলে—সেইটাই করতে হবে, গঙ্গাপূজাটা যাক। তারপরই শুরু করবো ওই কাজ।

দেখতে দেখতে বেশ কটা মাস কেটে গেছে, আবার গঙ্গাপূজো আসছে।

রাজা বলে—তার তো দেরী আছে, এখন থেকেই কাজে নেমে পড়ো, লোকজনদের নিয়ে মিটিং মিছিল করো। সোজা কথায় ও জমি দেবে না, জবর দখল করতেই হবে, তার জন্য লোকজনকে তৈরী হতে বলো।

মহেশ-অলকও কথাটা ভাবছে, সামনে ভোট আসছে, তার আগেই রতনবাবুকে কিছুটা বিপর্যস্ত করতেই হবে।

এবার অলককেই দাঁড় করাবে আবাদের লোক, তাই রতনবাবুর মুখোস খুলে দিতেই হবে, রাজাও তাই চায়।

এদিকে রতনবাবুও বসে নাই, গঙ্গাপূজো এবার নাকি হবে না গঞ্জে। এটাই রটে গেছে, তাই গ্রামের মানুষ, জেলেরা মিটিং করে, সেখানেই কথা ওঠে ঈশ্বরবৃত্তির অনেক টাকা রয়ে গেছে রতনবাবুর কাছে। সেটা আদায় করে জনসাধারণ নিজেরাই পূজো করবে, গঙ্গা পূজো কোন মতেই বন্ধ হবে না। ওরা রতনবাবুর কাছে টাকার দাবী জানাতে যাবে।

রতন তখন মহানকে ডাকিয়ে এনেছে, আর মহানও জেনেছে যে টাকাটা শহরের কেউ ওদের দেয়নি। রতন শুধোয়।

—তাহলে এত টাকা ওরা পেল কোথায়?

মহান বলে—জেলেদের দেওযা টাকাগুলো আছে না খরচ হয়ে গেছে?

রতন টাকা খর্চা সহজে করে না, ওই টাকা তার কাছেই ছিল সিন্দুকে, সে তার দুনম্বরী টাকা ঘরেই রাখে। নিজেই গুনে বাণ্ডিল করে আর বাণ্ডিলে নিজের হাতে টাকার অঙ্কটাও লিখে রাখে।

রতন বলে—টাকাটা ঘরেই আছে।

মহান বলে—বের করুন তো, হয়তো অঙ্ক মিলে যাবে, ব্যাপারটা তখন মাথায় আসেনি, বের করুন টাকাগুলো।

রতন বাইবের দরজা বন্ধ করে এবার সিন্দুক থেকে সেই টাকার বাণ্ডিলগুলো বের করে, বলে—এগুলোই ব্যাটারা দিয়েছিল আমাকে আড়তে ওদের দেনা বাবদ।

মহান বাণ্ডিলগুলো উলটে পালটে দেখে, আর রতনের হাতের লেখা অঙ্কগুলোও দেখা যায়, মাঝে মাঝে শয়ের বাণ্ডিলে রতন টিক মেরে রাখে।

মহান নিবিষ্টভাবে দেখে বলে—এই লেখাগুলো কার? দেখুন তো?

রতন উল্টে পাল্টে দেখে এবার চিনতে পারে—এতো সব আমারই হাতের লেখা। এতো সব আমার টাকার বাণ্ডিল, হ্যাঁ—এই তো, আমার চিহ্ন, নীলকালির লেখা, এগুলো ওরা পেল কি করে? ওই জেলেরা?

মহান বলে—আপনি ওই রাজাকে মুক্তিপণ দিয়েছিলেন কি এই টাকায়?

রতনের মনে পড়ে ওই সিন্দুক থেকেই টাকার তাড়া বের করে বনে রাজার জন্য নিয়ে গেছল। বলে রতন,

—তাই তো? আমিই এ টাকা সুন্দরবনে রাজাকে দিয়েছিলাম।

মহান বলে—আর রাজা তার থেকেই এই টাকা দিয়েছে ওই মহেশদের। আপনার নোড়া দিয়েই আপনার দাঁতের গোঁড়া ভেঙ্গেছে ওরা।

রতনের কাছে এত সহজ ব্যাপারটাও পরিষ্কার হয়নি এতদিন। এবার সব জলবৎ পরিষ্কার হয়ে যায়।

গর্জে ওঠে রতন—তাহলে এসব রাজারই কাজ! মহেশরাও ডাকাতির পয়সায় আমার সর্বনাশ করেছে? পুলিশে যাবো—ওরাই ডাকাত।

মহান বলে—মাথা গরম করবেন না, আদালতে গেলে প্রমাণ করতে তো পারবেনই না, উলটে ইনকাম ট্যাক্সই আপনাকে চেপে ধরবে। কেঁচো খুড়তে গিয়ে সাপ বের হবে।

রতন চুপ করে যায়, তার অনেক দুর্বলতা আছে, এক্ষেত্রে সব জেনেও তার করার কিছুই নাই।

এ যেন চোরের মায়ের কান্না, জোরে কাঁদারও উপায় নাই, নিজেই ধরা পড়ে যাবে।

তবু রতনবাবু ফুঁসতে থাকে—রাজাই তাহলে ওদের দিয়ে এসব করাচ্ছে?

মহান বলে—তাই সাবধানে এগোতে হবে।

রতন বলে—এতদিন চুপ করে ছিলাম, এবার রাজাকেই ধরতে হবে, পুলিশ না পারে আমিই দেখবো। মহান—তুমিও যোগাযোগ করো—ওপার থেকে মালপত্র আসবে, মাল আসা যাওয়া শুরু হলেই রাজাও বাধা দিতে আসবে, তখন ওকেই শেষ করে দোব।

মহানও তাই চায়, তাই বলে সে।

—ঠিক আছে, আমিও যোগাযোগ করছি, তাহলে এবার আসল শত্রু কে তা বুঝেছেন তো!

রতন তা বুঝেছে, এবার সাবধানেই এগোবে সে। আজ জেনেছে রতন শত্রু তার চারিদিকে, আর রাজাই তাকে এইভাবে চারিদিক থেকে আক্রমণের মতলব করেছে।

কেদারবাবুও দেখেছেন স্থানীয় মানুষের মনের ক্ষোভটা এবার আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু রতনবাবুও কোন সমঝোতা করতে রাজী নয়, বিনা যুদ্ধে সে এক ইঞ্চি মাটিও ছাড়বে না, তাই সেও প্রস্তুত হচ্ছে, এদিকে গ্রামগঞ্জের মানুষও তৈরী হচ্ছে। ফলে এলাকার সেই শান্ত পরিবেশও কেমন বিষিয়ে উঠছে। রতনবাবু চায় কেশববাবু

তার দিকেই আসুক, ওই জনতা তাকে মানে, কেশববাবু তাদের বুঝিয়ে শান্ত করুক।

রতনবাবু এখন ওই গার্লস স্কুলের জন্যও কিছু করতে বলেছে মহানকে। সরকারী স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা চালাতে বলেছে, এর জন্য রতনবাবু টাকাও দেবে।

সেই সব কথা আলোচনার জন্যও রতনবাবু শিখার স্কুলে যায়, বাড়িতেও আসে। বলে সে কেদারবাবুকে,

—ওসব আন্দোলনের পথে যেতে চাই না মাস্টারমশায়। আড়ত নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল, সেটা তুলে দিলাম, সামান্য যা ব্যবসা আছে তাই শান্তিতে করতে চাই। আর এলাকার উন্নতি করতে চাই। তাই গার্লস স্কুলকে মাধ্যমিকে পরিণত করতে চাই, এলাকায় নারী শিক্ষার প্রচার হোক তাই চাই।

শিখাও দেখেছে রতনবাবুকে, মনে হয় তার উদ্দেশ্য সৎ। কেদারবাবুও সাতপাঁচ বোঝেন না, ওর এই উন্নতির চেষ্টাতে তারও সায় আছে। তাই বলেন তিনি

—এতো ভালো কাজ, নিশ্চয়ই করবেন।

রতন বলে—আমি তো করতে চাই, কিন্তু দেখছেন তো পরিস্থিতি, ভালো কাজ করলেও লোকে বলবে কোন মতলব নিয়ে করছি। তাই শিখাকে বলছি, তুমিই করো, পিছন থেকে সব সাহায্য করবো আমি।

শিখাও ভাবে স্কুল মাধ্যমিক হলে এখানের মেয়েদের লেখাপড়া করা সম্ভব হবে, তাই সেও রাজী হয়।

রতনের এটা একটা দিক। কিন্তু ভিতরে তার আর একটা সত্ত্বা আছে সে হিসাব করে প্রতি পদে পদে। আর সেই মত কাজ করে। তাই কেদারবাবুর কাছে নিষ্কাম কর্মী, সমাজসেবক সাজার চেষ্টা করছে একদিকে অন্যদিকে সে তার নিজের পথেই চলছে।

গ্রামের মানুষরা চায় ভেড়ি বন্ধ হোক—তাদের জমি তারা ফিরে পাক। জমির দখল নিয়েই ইতিহাসে অনেক সংঘাত ঘটে গেছে, বহু রক্তক্ষয়, সর্বনাশ হয়েছে, কিন্তু এই মানসিকতা বদলায়নি মানুষের।

শ্যামপুরগঞ্জেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। রতনবাবুরই এই একটা ভেড়িই নয়, এই আবাদের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক ভেড়ি আছে। আর সব জায়গাতেই অন্যেব জমি দখল করেই তা করা হয়েছে। রতনবাবু জানে আবাদের অন্য অঞ্চলের মানুষ এখনও মাথা তোলেনি।

এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে এই গঞ্জেই আর এটা সম্ভব হয়েছে ওই রাজার জন্যই। কিন্তু এখানের আন্দোলন যদি সফল হয়, এখানের মানুষরা যদি ভেড়ি ভেঙ্গে তাদের জায়গার দখল নেয় তখন আর ঠেকানো যাবে না।

এই আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে আবাদে আর রতনের সব ভেড়িই

বেদখল হয়ে যাবে। তাই রতন এই অন্দোলনকে সব শক্তি দিয়ে বাধা দেবেই।

তার জন্য নানা পথও নিতে হলে তাই নেবে। মহানও বলে—সহজে এসব হতে দেব না রতনবাবু।

রতন শুধোয়—কি করে বাধা দেবে?

মহান হাসে, ক'বছর রাজনীতি করে সে এখন অনেক কলাকৌশলই জেনেছে, সে বলে—চুপচাপ দেখে যান কি করি।

রতন বলে—আর ওদিকে ওপারের মালের ব্যবসার কি হবে?

মহান বলে—সে সব চক্কর চালিয়েছি, এখানের পুলিশকেও বলেছি। চালিয়ে যান।

রতনবাবু চায় রাজাকে ধরতে, তার খোঁজ খবর পায়, এখানেও নাকি আসে মাঝে মাঝে, কিন্তু ফটিকরা নজর রেখেও ধরতে পারে না।

গোলাবীও আসে রতনবাবুর বাগানে, আসে ওদের আসরে। রতন, মহান দারোগাবাবুরা মদের নেশায় নানা আলোচনা করে সে সবও শোনে গোলাবী।

দারোগাবাবুর পেটে মদ পড়লে তখন সে অন্য মানুষ।

সব কথাই বলে ফেলে, গোলাবী এদের মদ যোগায়, মাছভাজা দেয় আর শোনে কথাগুলো।

রাজাকে ধরার প্ল্যানও করছে তারা। রতন বলে,

—রাতের মাল বোট দেখলেই রাজা লুট করতে আসবে।

দারোগা বলে—তখনই ধরবো ব্যাটাকে।

রতন বলে—ধরতে না পারলেও খতমই করে দেবে ওটাকে।

গোলাবী শুনছে ওদের প্ল্যান, রতনবাবু যে রাজাকে খতম করতে চায় তা জেনেছে গোলাবী।

রতন বলে—তাহলে এই বুধবার রাতেই বের হবো। সব যেন তৈরী থাকে।

নগার ভাইটাকে এসে গোলাবী খবরটা দেয়। বলে সে,

—তুই রাতের ভাটিতে গে খবর দিবি রাজাকে। নগার ভাইও বের হয়ে যায় ডিঙ্গি নিয়ে। সে জানে মধুখালির হাটতলার যাদব দোকানদারকে খবর দিলেই সময়মত খবর রাজার কাছে পৌছে যাবে।

রাজা যথাসময়েই খবরটা পায়। কালরাতে রতনবাবুর লোক মাল নিয়ে ফিরবে বড় গাং দিয়ে, রতনবাবু তার লোকজনকেও নির্দেশ দিয়েছে যে গুলিই চালাবে, আর দারোগাবাবুর নৌকাও নাকি থাকবে আশপাশে।

রাজা অবাক হয়—কি রে নগা, পুলিশ বোট চোরাই বেআইনী মাল ধরে, এ ব্যাটা দুনম্বরী মাল পাহারা দে নিয়ে যাবে? ক্যামন পুলিশ রে!

নগা বলে—রতনবাবুর পুলিশ, রতনও যে মাইনে দেয় ওদের।

রাজা বলে—মাল নেওয়াচ্ছি, তৈরী থাক তোরা, এবার রতনবাবুকে মুখের মত জবাব দিতে হবে।

স্তব্ধরাত্রি, বনের বুকে রাতের আঁধার নেমেছে, আকাশে মেঘের আনাগোনা, তারাগুলোও ঢেকে গেছে, ফলে চারিদিকে অন্ধকার।

ফটিক মণ্টার দল এবার নিশ্চিন্ত। তারাও তৈরী হয়ে আছে, ওদিকের সীমানা পার হয়ে এবার এ পাশের গাং-এ ঢুকছে, গাং-এ আসতে ওদিক থেকে গোবিন্দ দারোগার বোটটাও তাদের সঙ্গে আসছে, আগে আগে ওদের পথ দেখিয়ে আনছে।

ফটিক, মণ্টারা জানে রাজা সাহস করবে না আর, তাই মালও এবার অনেক নিয়েছে। খুশ মেজাজে আসছে, তাদের পাহারাদার এখন খোদ দারোগাবাবু।

তাই ওরা বনের মধ্যে দিয়ে বেশ বীর বিক্রমে চলেছে। পুলিশের বোট আগে চলেছে, একটু পিছনে ওদের বোট। বন পার হয়ে বড় গাং-এ পড়লে ওপারেই শুরু হবে লোকালয়। ওরা প্রায় এসে গেছে, হঠাৎ বনের মধ্যে সব খালের দিক থেকে পর পর কয়েকটা গুলির শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে বনভূমি।

পুলিশের বোট বেশ একটু আগে, আর পিছনে তাদের বোটের উপর গুলি আসতেই ফটিক মণ্টারাও গুলি করে, ততক্ষণে আরও কয়েকটা গুলি এসে পড়েছে ওদের বোটে।

দারোগাও ঝিমুচ্ছিল, পিছনে গুলির শব্দ সচকিত হয়ে সেও হুঙ্কার ছাড়ে—ফায়ার।

কিন্তু কাকে ফায়ার করবে তারা জানে না। তবু কয়েকটা গুলি তারা শুন্যেই ছুঁড়ে এগিয়ে আসে বোটটার দিকে।

আর কাউকে আশপাশে দেখাও যায় না। চারিদিকে ঘন বন। গাং-এর বুকে তারা, হঠাৎ ফটিক চীৎকার করে।

—সর্বনাশ হয়েছে—বোটের গায়ে ওরা গুলি করে বেশ কয়েকটা ফুটো করে দিয়েছে আর সেই ফুটো দিয়ে ফাটা কাঠ সরে গিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে জল উঠছে নৌকায়। তিন চারটে ফুটো নীচের দিকে—জল উঠে নৌকা একটু বেশী নামলেই উপরের ফুটোগুলো দিয়েও তোড়ে জল ঢুকছে, মালপত্র, পেটি সব ডুবে যায়, দেখতে দেখতে।

বেশ বুঝেছে ওরা তাদের প্রাণে মারতে চায়নি, সব মাল সমেত নৌকাটাই ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে, তাই এভাবে গুলি করে ঝাঝরা করেছে নৌকাটাকে।

পায়ে জল লাগে, নৌকা লাখ লাখ টাকার মাল নিয়ে ডুবছে অতলে। আর করার কিছুই নাই! ফটিক মণ্টার দল এবার প্রাণ বাঁচাতে পুলিশের বোটেই ওঠে, আর

তাদের সামনে বোট মালসমেত তলিয়ে গেল অতলে।

নদীর বুকে একটা আবর্ত ওঠে মাত্র, নদীর এখানে গভীরতাও অনেক। আর জোয়ার ভাঁটার তোড়ও খুব বেশী, ফলে কোথায় যাবে ডুবন্ত নৌকা, কোথায় যাবে তার মাল তাও কেও জানে না।

দারোগা বনের এদিক ওদিক জোরালো সাতব্যাটারির টর্চের আলো ফেলে, কিন্তু যারা এ কাজ করেছে তাদের কোন চিহ্নই মেলে না। চারিদিকে ফিকে কুয়াশা নেমেছে বনে, গাং-এর বুকে, তারা বিনাবাধায় এত বড় কাণ্ডটা ঘটিয়ে বনের গহনেই মিলিয়ে গেছে।

রতনবাবু নিশ্চিন্ত হয় এবার মাল সব বিনাবাধায় আসবে, আর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে রাজাকে ধরে আনতে পারবে, না হয় খতম করার খবরও আসবে।

রাজা শেষ হবে, আর এদিকে এই ভেড়ি বন্ধের আন্দোলনে মহানও একটা দারুণ প্ল্যান করেছে, রতনের প্রতিষ্ঠা আবার কায়েম হবে।

সামনে গঙ্গাপূজোও এবার ধূমধাম করে করবে রতন, মা গঙ্গার দয়াতেই তার সব ব্যবসা বানিজ্য চলছে।

সকাল হয় গঞ্জে। রতন এসেছে গাং-এর ধারে। ওদের ফেরার সময় হয়ে গেছে। গাং-এর বুকে সকালের সোনা রোদ রং বাহার তুলেছে, পুলিশের বোটটা জেটিতে এসে লাগে, রতন এগিয়ে যায়।

এদিক ওদিক দেখে, তার বড় বোট যাতে আসল মাল আসার কথা, সেটার দেখা নাই, পুলিশের বোট থেকে নামছে দারোগা তার দলবল নিয়ে। পিছু পিছু নামছে ফটিক মণ্টার দল। মুখ চোখ শুকনো।

রতন শুধোয়—বোট কোথায়? আমাদের বোট!

ফটিক চুপ করে থাকে। মণ্টাই বলে ব্যাপারটা।

—এ্যাঁ! চমকে ওঠে রতন, এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি, তার লাখ কয়েক টাকার মাল ওরা ডুবিয়ে দিয়েছে। আর পাবার কোন আশাই নাই।

রতন রাগে গর্জে উঠে ফটিককেই একটা লাথি মারে, ছিটকে পড়ে ফটিক ওই পলিকাদায়, গড়াতে গড়াতে জলেই গিয়ে পড়ে অতর্কিত লাথির চোটে। মণ্টাকেও সপাটে এক চড় কসে এবার গর্জে ওঠে দারোগাকে।

—এতগুলো টাকা দে তোমাকে পাঠালাম, রাজাকে ধরে আনবেই, মালও আসবে সেফ্‌লি, খুব যে ফুটানি করে গেলে। কি হলো?

গোবিন্দও ভাবতে পারেনি যে রাজা ওৎ পেতে বসে থাকবে ওই বনের মধ্যে আর

এইভাবে তাদের আক্রমণ করবে। তার জবাব দেবার কিছুই নাই, নীরবে চলে গেল সে।

রতন গর্জাচ্ছে—অপদার্থের দল!

রাজা যে এভাবে জবাব দেবে তা ভাবেনি। সেবার তবু মালপত্র পেয়েছিল, এবার তাও পাবে না। অথচ এত টাকা দিতে হবে মহাজনকে, তার চারিদিকে শত্রু। আর এখানের সব খবরই দেবার লোক আছে রাজার, সেটাও বুঝেছে রতন।

দুপুরে একাই বসে আছে গদিঘরে, নন্দ সরকার খাতাপত্র লিখছে। এমন সময় মহেশ, অলকদের ঢুকতে দেখে চাইল, রতনের মেজাজ আজ ভালো নাই। আর ওদের কথা শুনে তেলে বেগুণে জ্বলে ওঠে সে।

মহেশ বলে—আড়ত তো তুলে দিলেন গত মাস, এই দশমাসের ঈশ্বরবৃত্তির ট্যাঁকা তুলেছেন, সামনে গঙ্গাপূজা আসছে, আপনি তো পূজো করবেন না আড়তে। টাকা আমাদের দ্যান, পূজো মেলা আমরাই করবো, ও টাকা তো আমাদের কাছ থেকেই কেটে নিয়েছেন ঈশ্বরবৃত্তি বাবদ।

রতন দপ্ করে জ্বলে উঠতে গিয়েও কোনমতে রাগটাকে থামালো। ওই লোকগুলো আজ সকালে তার নৌকা ডুবির খবর শুনে খুবই আনন্দ পেয়েছিল। ওর সর্বনাশ চায় তারা। এ বেলায় এসেছে টাকার দাবী করতে।

রতন সংযত হয়ে বলে—পূজো কেন হবে না? মা গঙ্গা কি একা তোদের? আড়ত না থাক, পূজো যেমন হচ্ছিল তেমনিই হবে, অবশ্য তোরা আলাদা করতে চাস তো করবি, আসল পূজো হবেই তাতে যা খর্চা হয় করবো।

মহেশ বলে—তাহলে টাকা দেবেন না।

রতন বলে—বললাম তো পূজো হবে, এখন যা।

অর্থাৎ এক কথায় রতন তাদের তাড়িয়েই দিল। রতন পূজো করবে সেখানে তাদের আমন্ত্রণ থাকবে মাত্র, ওরা বের হয়ে আসে। অলক বলে—পূজোও দখল করবে নাকি?

মহেশ জানায়—এর বিহিত করতেই হবে, সবকিছু দখল করার দিন ওর গেছে।

গঞ্জে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে, রতনবাবুর মালবোঝাই নৌকা লুটই হয়েছে বাদাবনে, খবরটা নানা রং চড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। অবশ্য দারোগাবাবুও সদরে রিপোর্ট দিয়েছে বাদাবনে জলদস্যুদের উৎপাত খুব বেড়েছে, তাদের ধরার জন্য স্পেশাল ফোর্স চাই।

গোবিন্দ দারোগাও বেশ তেতে আছে, হয়তো কেন সে নিশ্চয়ই জানে এ রাজারই

কাজ। রতনবাবুর মালই ডুবিয়েছে সে, আর এত নৌকা যাতায়াত করে তাদের উপর কোন আক্রমণ হয় না।

তবু দারোগা কর্তৃপক্ষকে জানায় ডাকাতরা খুবই সক্রিয়, ওদের ধরতেই হবে।

এমনিদিনে ওই মহেশ, নিতাইরা হাটতলায় মিটিং ডাকে সব চাষীদের। এলাকার অন্য চাষীরাও এসেছে, তারা ওই চিংড়ি ভেড়ির জমির দখলই নেবে।

আরও অবাক হয় মহেশরা মহানবাবুকে আসতে দেখে, ওদের মিটিং তখনও শুরু হয়নি, মাইকে লোক জড় করার ঘোষণা চলছে, গান বাজছে, হাটতলায় জমছে মানুষ, অলক একটু অবাক হয় মহানকে দেখে—আপনি?

মহেশ অবশ্য খাতির করে চেয়ার এগিয়ে দেয়—বসুন গো।

মহান বসে বলে—তোমাদের আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি, ভেড়ি মালিক-এর জোর করে জমি দখল করে রাখার কোন অধিকার নাই, সেই কথাটাই বলতে এসেছি।

অলক শুনছে ওর কথাগুলো, নিতাই বলে

—কিন্তু রতনবাবু তো তা বোঝেন না।

মহান এখন বুঝেছে রতনবাবুকেও তার দরকার, অথচ এই জনতাই তাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, সামনেই নির্বাচন, এখন রতনবাবুকেও চটাতে পারে না। তাকে সাহায্য করতেই হবে এদেরও হাতে রাখতে হবে, সে নেতা নয় এখন অভিনেতাই। তাই তাকে নিখুঁত অভিনয়ই করতে হবে, বলে মহান।

—তাকে বোঝাতে হবে, আর জনমতকে জাগ্রত করতে হবে যাতে তিনি মানতে বাধ্য হন, আর আমিও যথাসাধ্য তাই করবো।

মিটিং শুরু হয়, সাধারণ চাষী-মানুষরা ভিড় করেছে সারা আবাদ থেকে এসে। অন্য ভেড়ির জমি যাদের, তাদের অনেকেই এসেছে, মহেশরাও বলে, এবার ভাষণ দিতে উঠেছে মহান।

সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই এসেছে। তাই তেজস্বিনী ভাষায় সে জোতদার, ভেড়ি মালিকদের বিরুদ্ধেই ভাষণ দেয়, আর তার ভাষণে ঘন ঘন হাততালি পড়ে।

মহান বলে—দরকার হয় আমরা ওই জমির দখল নিজেরাই নোব। ভাই সব মাটিই মা। মায়ের এই অপমান, মায়ের উপর এই জুলুম সইব না, তার জন্য বুকের রক্ত দিতে হয় তাই দেব!

হাততালি পড়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, জনতা গর্জে ওঠে—তাই নোব।

মহান দুহাত তুলে বলে—উত্তেজিত হবেন না ভাই সব, এর জন্য আমাদের ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে মিছিল করে যেতে হবে, পরে আলোচনা করে আমাদের কর্মসূচী আপনাদের

জানাবো, সেদিন কর্মসূচী মত কাজ হবে।

বেশ গরম করে দিয়েছে মহান। রাতারাতি সে আজ এই মানুষগুলোর সামনে দরদী জননেতারূপেই স্বীকৃতি পায়।

চরণ ডাক্তারও তার ডাক্তারখানার নড়বড়ে চেয়ারে বসে বক্তৃতা শুনছিল। মহান যে এভাবে রতনবাবুর বিরুদ্ধে বলবে প্রকাশ্যসভায়, তারই খেয়ে তার বিরুদ্ধে এমনি করে লোকদের উত্তেজিত করবে তা ভাবেনি।

এবার চরণেরই সুবিধা হবে, ভাগ্নেকে বেকায়দায় ফেলে এবার সেইই রতনবাবুর সাহায্যে ভোটে জিতবে, তার দিন ফেরাতে পারবে।

কেদারবাবুও এসেছিলেন এদিকে। প্রকাশ্য সভায় তিনি যান না, কারণ রাজনীতিতে তার বিশ্বাস নাই, আজকের দিনে রাজনীতিতে কোন সত্যিকার ভালো মানুষ থাকতে পারে না বলে তার বিশ্বাস। এই মানুষগুলোর সুখ দুঃখের সঙ্গে তিনি জড়িত। ওদের সমবায়ের তিনিই প্রধান, এটা হতে হয়েছে রাজার কথাতেই।

সমবায় ভালোই চলছে, এখন এদের আর্থিক অবস্থাও বদলেছে।

কিন্তু এই জমি দখলের মিটিংএ তিনি আসেননি।

পালমশায়ের দোকানে এসেছিলেন কিছু জিনিষপত্র কেনার জন্য। শিখা ক'দিনের জন্য কলকাতায় ওর মামার ওখানে গেছে।

শিখাও বলে— এখানের ওসব আন্দোলনে থেকে না বাবা। আমারও এখানে আর ভালো লাগে না।

—কেন স্কুল মাধ্যমিক হচ্ছে। কেদারবাবুর কথায় শিখা বলে।

—কিন্তু পরিবেশ যেভাবে বদলাচ্ছে তাতে এইখানের শান্তিও থাকবে না। চেষ্টা করছি কলকাতায় যদি কোনও কাজ পাই।

কমলাদেবী বলেন— তাই ভালোরে, রাজাও নাই, সে তো চলেই গেল আবার।

রাজার কথা তিনি ভুলতে পারেননি। বলেন— সে থাকলে তবু ভরসা পেতাম। এখন তো এখানে সবাই রাজা।

শিখা রাজার প্রসঙ্গ টানলে বলে— সে থাকলে ওদের মতই হতো, এখন তো শুনি সে নাকি গাং ডাকাতি করছে, লুটপাট করছে, একবারে বদলে গেছে।

কেদারবাবু এটা মানতে চান না, তিনি সবই জানেন, রাজাও মাঝে মাঝে আসে তার কাছে গোপনে। কেদারবাবু বলেন,

—না, না, এসব ভুল ধারণা তোর। বরং রাজা ওদিকের সব ডাকাতি বন্ধ করেছে।

শিখা বলে— না বাবা, সবাইকে হঠিয়ে দিয়ে নিজেই এসব করছে, রতনবাবুর মাল-

লোকদের ধরে নাকি মোটা টাকা মুক্তিপণ আদায় করছে। আবার ক'দিন তারা নৌকায় ডাকাতির চেষ্টা করে পারেনি। তাই মালসমতে নৌকাই ডুবিয়ে দিয়েছে। সে ডাকাত নয়? ভদ্রলোক! কি বলছ তুমি?

কেদারবাবু বলেন, এটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাজা প্রতিবাদ করতে চায়। কিন্তু পথটা তার ভুল তা মানি, তবু বলবো সে এত নীচ হয়নি রে।

শিখা চুপ করেই থাকে, এ নিয়ে বাবার সঙ্গে অযথা তর্ক করতে চায় না, সে মনে মনে আজ রাজার সম্পর্কে একটা ধারণাই করে নিয়েছে। তার দুঃখটা এইখানেই যে সে রাজাকে নিয়ে শহরেই যেতে চেয়েছিল। নিজেও অনেক ঝুঁকি, কলঙ্কের পথেও যেতে চেয়েছিল রাজার জনাই, কিন্তু রাজা শিখার সেই ত্যাগের কোনও মর্যাদাই দেয়নি।

সেদিন তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল রাজা, তার মনে ওই উন্মাদনাটাই বড় হয়েছিল, প্রতিশোধের উন্মাদনাই রাজাব সব মানবিকতাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।

শিখার মন থেকে সেদিনই দূরে সরে গেছে রাজা। আজ শিখা জানে সে ওই অন্ধকারের জগতেই হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে ফেরানোর সাধ্য শিখার নেই। শিখার সব স্বপ্ন, ভালোবাসাকে রাজা পায়ে দলে পিষে চলে গেছে। সব স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে গেছে শিখার।

তাই শিখার কাছে এই শ্যামপুরগঞ্জও যেন শূন্য বোধহয়। এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছে সে। তার চেষ্টাতেই কলকাতায় গেছে শিখা।

ফলে কেদারবাবুকেই হাটবাজার করতে হচ্ছে, সেইজন্যই হাটতলায় হারু পালেব দোকানে এসেছে মালপত্র নিতে। আর ওই ভাষণও শোনেন কেদারবাবু, হারু পাল বলে— এযে ভূতের মুখে রাম নাম গো মাষ্টারমশায়। মহানবাবু রতনবাবুর নামে খেটর গাইছে শোনেন, ডিগবাজী দিলে নাকি এবার? স্কুলের মহানকে কেদারবাবু ভালই চেনেন। এখনও স্কুলের খাতায় মহানের নামটা আছে, কে জানে হপ্তায়, দু'একদিন স্কুলে গিয়ে পুরো মাইনেই নেয় রতনবাবুর জন্য। আর পড়ানোর কাজ না করে নেতাগিরি করে আখেরে গুছিয়েছে। অর্থ প্রতিষ্ঠাই ওদের কাছে সব, কোন দায়বদ্ধতা ওদের নেই, এরাই আজ দেশ নেতা।

কেদারবাবু বলেন—কে জানে বাপু, ওরা কখন কি বলে, কেন বলে তা ওরাই জানে, এটা ওদের হিসাব। তবে ভয় হয় কি জানো হারু?

হারু, দোকানের অন্যরাও চাইল, কেদারবাবু বলে,

—ওর কথায় বিশ্বাস করে এই সহজ সরল মানুষগুলো না ঠকে। মহানকে বিশ্বাস নাই।

নিতাই এদিকেই ছিল, সে বলে— না গো মাষ্টারমশাই, মহানবাবুর ভোট তো চাই,

তাই এবার এদিকেই ঝুঁকেছেন, জমি পাইয়ে দিলে কত ভোট পাবে তা দেখুন।

মাষ্টারমশায় বলেন— হিসাবটা ঠিক বুঝি না নিতাই, কথাটা মনে এলো তাই বললাম, ভালো হলেই ভালো।

নিতাই বলে, এবার দেখবেন মিছিল করে গে ভেড়ির দখল নেবে সবাই, রতনের আড়ত তুলেছি, এবার ভেড়িও তুলে দেবে, মহানবাবু বলেছেন— এটা করবেনই।

চরণ ডাক্তার হা পিত্যেশ করে আছে, এবার মহানকে হটিয়ে সেইই গদি পাবে। তাই রতনবাবুর কাছে ছুটে এসেছে। রতন জানে কাকে দিয়ে কি কাজ হবে, তাই চরণ ডাক্তারকেও সে চটাতে চায় না।

রতনও শুনেছে মাইকে ওদের ভাষণগুলো, মহান সত্যিই মহান, একেবারে ওই ক্রুদ্ধ জনতাকে সে তার ওই বৈপ্লবিক ভাষণ দিয়ে হাতের মুঠোয় এনেছে, ওদের বেশ গরম করে দিয়েছে।

চরণকে দিয়ে রতন এবার গঙ্গাপূজার ব্যাপারটা করাতে চায়।

এর মধ্যে চরণ আরও কয়েকজনকে দিয়ে নতুন পূজা কমিটি তৈরি করেছে। চরণও খুশি, একটা মাতব্বরী করার সুযোগ তাকে দিয়েছে রতনবাবু। ক্রমশঃ আরও সুযোগ পাবে সে।

দু পয়সা ঘরেও আসবে। এর মধ্যে চরণ কলকাতায় গিয়ে নিধু দালালকে ধরে গতবারের সেই কাজলীবাঈকেই বায়না করে এসেছে। অবশ্য এবার চরণ একটু বেশী টাকাতে বায়না করায়। আর নিধু দালাল তার থেকে নগদ একহাজার টাকাই চরণবাবুকে কমিশনও দিয়েছে। এইভাবে চরণ বসিরহাটে প্যান্ডেল, লাইট, মাইক ইত্যাদি বাবদও বেশ কিছু টাকা কাটমানিও রেখেছে। ধাপে ধাপে চরণ ডাক্তার চরণ ফেলতে চায়।

তাই এই মিটিং-এর পরই ছুটে এসেছে রতনবাবুর কাছে।

—শুনছেন মহানটার বক্তৃতা? এটা—যে পাতে খায়, সেই পাতেই থুতু দেয়।

আরে রতনবাবু না থাকলে কে চিনতো তোকে বাদাবনে? আর মিটিং-এ তার নামেই যা তা বলবি? ধম্ম নাই? বেইমান! বিশ্বাসঘাতক, আপনার বিরুদ্ধে লোক ক্ষ্যাপাচ্ছে?

রতনও এখানে নিখুঁত অভিনয় করে। বলে সে,

—শুনলাম তো সব, কিন্তু কার মুখে হাত দিই বলো ডাক্তার?

চরণ বলে— হঠান্ ওটাকে, দুনম্বরী মাল।

রতন বলে— তাই ভাবছি, এবার ভোটে ওকে আর মাথা তুলতে দেব না।

তেমন লোক পেলে তাকেই দাঁড় করাবো।

চরণ এবার বলে ফেলে— আমাকেই পাঠান রতনবাবু, চেনেন তো আমাকে। জান

থাকতে বেইমানি করবো না, ওই ছেলেটার মতো।

রতন বলে—ভেবে দেখি। আর মহানের উপর একটু নজর রাখতে হবে।

চরণ বলে—ও ভাববেন না। ওর নাড়ি নক্ষত্র আমি জানি, ওদের দলে মিশে কি করছে সব খবরই দোব।

রতন বলে—তাই দেবে, তবে কাজটা করতে হবে খুব গোপনে, মহান যেন টের না পায়।

চরণ বলে—ও নিয়ে ভাববেননা। কাকপক্ষীতেও টের পাবে না? আমার মনে হয় মহান তলেতলে রাজার সঙ্গে যোগাযোগও করতে চায়।

রতন একটু চমকে ওঠে ওই কথায়, রতন জানে এ জগতে কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। তার অবস্থা তেমন সুবিধার নয়, এখন এই আবাদে রাজাই এক অদৃশ্য দেবতা। সকলেই ভালোবাসে তাকে, তার কথাতেই ভোটের বাক্সে ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে। মহান যেমন চতুর লোক তাতে তার ওই পথে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

তাই রতন মহানকেও বাজিয়ে নিতে চায়, আর চরণকেও বলে— তাই কড়া নজর রাখো মহানের উপর।

অবশ্য মহান এতটা ভাবেনি তার মামার মত। চরণ কথাটা বলেছিল মহানের উপর রতনের সন্দেহ বাড়াবার জন্য। আর তাতে কিছুটা কাজও হয়েছে।

মহান ওসব জানে না। সে রতনের কথামত ওই সহজ সরল মানুষদের তাতিয়ে দিয়েছে যাতে ওরা জমির দখল নিয়ে একটা ঝামেলা পাকায়, তাতে রতনেরই সুবিধা হবে।

রতনও তাই সেইমত ব্যবস্থাও করেছে, আর মহানকে বলে রতন — প্রাথমিক কাজটা ভালোই করেছ, এবার ব্যাটাদের ওই দখলের মিছিলটা করিয়ে দাও মহান।

মহান বলে—ওসবও হবে, আর মিটিং-এ ঠিক হয়েছে এই সোমবারই ওরা দখল অভিযান করবে।

রতন কি ভাবছে। বলে— তুমিও থাকবে নাকি?

মহান বলে— আমার তো এসেম্বলিতে মিটিং আছে!

— তা ভালো। রতন বলে। মহান জানায়— তবে ওদের মিছিল হবেই।

গোবিন্দ দারোগা রতনবাবুর কাছে প্রণামী নিয়েও রতনের কোন সুরাহা করতে পারেনি। ওদিকে জলদস্যুদের জন্য রতনবাবুর অনেক টাকা জলে গেছে, ওই ব্যবসাও বন্ধ, খেসারতও দিতে হয়েছে প্রচুর টাকা।

গোবিন্দ হাজার হোক বিবেকবান মানুষ, তাই তারও বিবেকে বাধে।

এবার রতনবাবুর জন্য করার কিছু কাজ পেয়েছে, আর এতে আইনগত কোনও বাধাই নেই।

রতনবাবু সন্ধ্যার দিকে দারোগাকে তার বাড়িতে ডেকে এনে প্ল্যানটা বলে। গোবিন্দ দারোগা বলে,

— ওর জন্য ভাববেন না। তবে ওই যে মিছিল আসবে ওদের উপর আড়াল থেকে ঢিল পাটকেল ফেলার ব্যবস্থা করলে ভালো হয়, জনতা মারমুখী হয়ে উঠলেই ভালো।

রতন চুপ করে কথাটা শোনে, বলে সে— ঠিক আছে, তাই হবে, তবে এবার যেন কোনও ভুল না হয় দারোগা।

হাসে গোবিন্দবাবু— না, না। দেখবেন না, কি করি।

সারা আবাদে সাড়া পড়ে গেছে, মহানও গ্রামে গঞ্জে ঘুরে মানুষদের তাতিয়েছে, বাকীটার ভার পড়েছে অলক, মহেশদের উপর। মহান বলে— তোমরা রতনবাবুর কাছে মিছিল নিয়ে যাবে, আমিও সদর থেকে চাপ দেব। সেদিন এসেম্বলীতে তোমাদের কথাও তুলবো, ওপরের চাপ আর তোমাদের চাপ, দু'য়ে রতনবাবু পথ পাবে না জমির দখল দিতে।

মহেশ, অলকরা সেইমত লোকজন জমায়েতে করে হাটতলা থেকে যাত্রা করে। ওদের হাতে পোষ্টার—পতাকা। গ্রামের সাধারণ মানুষ, কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দলও ভিড়ছে ওই শোভাযাত্রায়।

ক্রমশঃ ওদের স্লোগান জোরদার হয়ে ওঠে— এগিয়ে চলে ওরা রতনবাবুর বাড়ি-গদি ঘরের দিকে।

আমাদের দাবি মানতে হবে—

ভেড়ির জমি—ফেরত দিতে হবে—দিতে হবে।

রতনবাবুর কালো হাত—ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।

এসব স্লোগান মহানই ঠিক করে দিয়েছে।

জনতা চলছে, এদিকে ঘর বাড়ি বেশি, একটু গিঞ্জী এলাকা—সামনে রতনবাবুর বড় বাড়ির গেট। ফটিক, মন্টরাও আড়ালে তৈরি ছিল—তারাই দুচারটে ইট, মাটির চ্যাঙড়, ছুড়ে দেয় ওই জনতার দিকে, দু'একজনের কপালেও লাগে।

তারপরই জনতা গর্জে ওঠে—ইট মারছে, মার—মার ওই রতনের চামচাদের।

জনতার উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। গর্জন করে এগোচ্ছে তারা।

তারপরই শুরু হয় গোবিন্দ দারোগার খেল, সেও এবার ওই উত্তেজিত জনতার

ওপর দলবল নিয়ে বীরদর্পে ঝাপিয়ে পড়ে আর তার লোকজন মায় ফটিকের দলও নির্মমভাবে ওই নিরস্ত্র জনতা— ছেলে, মেয়েদের উপর লাঠি চালাতে থাকে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য।

অবশ্য দোল গোবিন্দ এতদিন ধরে শুধু ব্যর্থ হয়েই এসেছে। রাজাকে ধরতেও পারেনি।

আজ সেই রাগটা গিয়ে পড়ে এই নিরস্ত্র জনতার উপর, মহান নেতা তাদের কৌশলে এই জালে এনে ফেলেছে আর এবার রতনের জন্যই দারোগাবাবুও তার পরাক্রম দেখাতে শুরু করে।

লাঠির ঘায়ে ছিটকে পড়ে মানুষজন। কার কপাল ফেটেছে, কেউ পালাতে গিয়ে নয়ানজুলিতে পড়েছে, তার ওপরই পড়েছে বেশ কয়েকজন, হাত, পাও ভেঙেছে কারও।

কাতর আর্তনাদে মুখর হয়ে ওঠে চারিদিক।

রতন আজ বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই তার বাড়ির ছাদ থেকে দেখছে দৃশ্যটা। ব্যাটারা রাজারই লোক, তার আড়তের এমন চালু ব্যবসাকে লাটে তুলে দিয়েছে, এবার তার এই ভেড়ি লুট করতে চায়।

রাজাকে পেলে আজ রতনই তাকে ওইভাবে পেটাতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতা যে যেদিকে পরে পালায়, দুচারজন বেদম প্রহারে ছিটকে পড়েছে রক্তাক্ত অবস্থায়।

বাকী সবাই উধাও।

ঢোল গোবিন্দ জানে এবার এদের এ্যারেস্ট করলে আবার নানা ঝামেলাই বাড়বে। কোর্ট কাছারি হবে। তাই ওদিকে সে যেতে চায় না, ওদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার কথাই দিয়েছিল রতনবাবুকে। সেই কাজটা সুচারুরূপে করে এবার গোবিন্দবাবু তার দলবল নিয়ে অঞ্চলের শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ফিরে যাবে।

ফটিক, মন্টার দল অবশ্য যা করার ওই ভিড়ের মধ্যেই করে আগেই উধাও হয়ে গেছে, এবার দুচারজন করে ভীত ত্রস্ত মানুষ এসে হাজির হয় অকুস্থলে।

চরণ ডাক্তার ভাবতে পারেনি ব্যাপারটা এইভাবে মোড় নেবে। মহান নেতা এদের উত্তেজিত করেছে ভেড়ির জমির দখল এরা পাবে এই কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে, এদের এগিয়ে দিয়েছে রতনের সামনে। অবশ্য মহান নেতাদের মত শ্রীমান মহান আগেই সরে পড়েছে সদর থেকে চাপ সৃষ্টি করার জন্য।

তারপর এমনি জালে আটকানো মাছের মত লোকগুলোকে এভাবে নিকেশ করা হবে তা ভাবেনি চরণ, এবার তারই দমকা রোজকার বেড়ে যায়।

এই অঞ্চলে হাতুড়ে ডাক্তারদের মধ্যে সেই নামকরা। নিজের ওষুধের দোকান আছে,

জিলজিলে একটা ঘোড়াও আছে, তাতে চড়ে গ্রাম গ্রামান্তেরে রোগী দেখতে যায় আর পটাপট ইনজেকশনও দেয়।

বৃক্ষহীন দেশে যেমন ভেরেন্ডাকেই গাছ বলা হয়, এই আবাদের সেই ডাক্তার। সেখানেই এবার ভিড় করে ওই আহত মানুষগুলো।

কারও কপাল ফেটেছে, কারও মাথা, কারোও হাত ভেঙেছে। কার কাঁধে লাঠির দাগ, কোনরকমে অন্যরা তাদের এনে হাজির করেছে হাটতলায় চরণের ডাক্তারখানায়, কাতরাচ্ছে তারা।

চরণ ডাক্তারের জীবনে এত রোগীর ভিড় কখনও হয়নি, সার দিয়ে রয়েছে ওরা, অনেকের ওঠার শক্তি নাই।

চরণ মনে মনে তার ভাগ্নে মহানকেই ধন্যবাদ দেয়। নাহ্, ভাগ্নে বেশ বুদ্ধি করে রতনবাবুকেও জয়ী করেছে, আর তার মামার জন্যও বেশ রোজকারের ব্যবস্থা করে গেছে।

চরণ বলে—আয় বাপ্। এ্যাঁ—এ যে সার পিটে করেছে রে?

—একেবারে তক্তা বানিয়েছে দারোগাবাবু। চরণ তার সহকারী কালীকে বলে, হাঁড়ি ভর্তি গরম জল কর, আর তার সহিস কাম মেডিসিন কেরিয়ার ভুতোকে বলে, একটা হেচাক জ্বালিয়ে আন, ভাড়া করে, এসব মেরামত করতে সময় লাগবে, রাত হয়ে যাবে।

আহতদের বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি করে, চরণ ধমকায়— তখন বীরত্ব দেখাতে গেলি এখন নে আয় টাকা, ওষুধ, ইনজেকশনের দাম।

কেউ বলে— কোথায় পাব এত টাকা? লুকটাকে এমনি করে মারলেক—

চরণ ধমকে ওঠে— থাম, যা ট্যাকা আন, তখন দেখবো।

অন্যজনকে শুধোয়— তোর টাকা আছে তো রে? পঞ্চাশ টাকা চাই।

গোলাবী আগে থেকেই সব ব্যাপারটা দেখেছিল। হাটতলার মিটিংও দেখেছিল সেদিন, শুনেছিল মহানবাবুর কথাগুলোও, ভেবেছিল সত্যি এবার জমি পাবে এরা।

আজ দেখছে সে ওই মিটিং মিছিল, তারপর চমকে ওঠে লোকগুলোকে ওই মিছিলের জন্যই পেটানো হয়েছে। গোলাবী তার সাবধানী বুদ্ধি দিয়ে বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। সেও চটে উঠেছে ওইভাবে এদের মারতে দেখে, জমির দাবি করাই যেন এদের অন্যায়।

সেই ঘটনায় মহেশও আহত, এর মধ্যে কপালে ফেটি বেঁধে মহেশ, অলকরাও এসেছে হাটতলায়। চরণ ডাক্তার তখন আহতদের কাছে টাকার ফিরিস্তি দিচ্ছে।

গোলাবী মহেশদের আসতে দেখে বলে— কইগো তোমাদের সেই পালের গোদাটা কই? সেই মহানবাবু! তোমাদের গাছে তুলে মই কড়ে নিলে, আর তোমরা ধপাস্ করে পড়ে হাত পা ভাঙলে?

এখন শ্যালা শকুনিদেরই লাভ।

চরণ ডাক্তার ওই মুখরা মেয়েটাকে দেখতে পারে না। সর্বত্রই ওর অবাধ গতি আর তেমনি জিবের ধার, চরণ ধমকে ওঠে—থাম্ তো!

গোলাবী বলে, থামবো কেনে? এদিকে মানুষগুলান মার খেয়ে কাতরাচ্ছে, রক্ত পড়ছে, আর তুমি দর করছো, টাকার দরাদরি। ডাক্তার না শকুনি গ?

মহেশ, অলকও ব্যাপারটা দেখেছে, চরণ বলে— খরচা নাই? ওষুধ, ইনজেকশন, ডাক্তারের ফি, যা না অন্য কোথাও নে এদের, কে করে দেখি?

মহেশ বলে, ঠিক আছে, যে টাকা দিতে না পারবে আমরা দোব, এদের চিকিচ্ছে করো ডাক্তার।

অলক বলে—তাই দেবো, মা গঙ্গার পূজা না হয়, নমো নমো করেই হবে। এদের তবু চিকিৎসা হোক।

গোলাবী বলে—মহেশদাদা, সেই মহান ন্যাতাকে এবার গলায় মালা দে বরণ করো। তুমরা না পারো আমাকে বলবা আমিই ত্যানাকে বিছুটির মালা দে বরণ করে নোব। মর এখন তোরা!

গজগজ করে গোলাবী। সারা এলাকায় একটা স্তব্ধতা নেমেছে।

কেদারবাবু শুনেছে ব্যাপারটা। শিখা স্কুল বন্ধ করে এসেছে বাড়িতে, কেদারবাবু বের হচ্ছেন। শিখা বলে, তুমি আবার কোথায় চল্লে বাবা?

কমলাদেবী বলেন, আমি নিষেধ করছি বের হতে, তবু যাবে। তুই বল শিখা।

কেদারবাবু বলেন, ওদের এইভাবে মেরেছে, একবার দেখতেও যাবো না? না গেলে খারাপ দেখায় রে, যাই একবার হাটতলায়,

শিখা বলে—যাবে যাও, সেখানে কোন মন্তব্য করো না।

কেদারবাবু বলেন—না, না।

বের হন তিনি, কেদারবাবু ভয় করেছিলেন সেইদিনই, হাটতলায় এসে দেখেন এই দৃশ্য, মহেশ, অলকরাও আহত হয়েছে, তবু তারাই দেখাশোনা করছে অন্যদের।

হারু পাল বলে— সেদিন আপনি কথাটা বলেছিলেন মাষ্টারমশায়, মহানবাবুরই এসব কারসাজি।

অলক বলে— ঠিক বুঝতে পারিনি এমনি কাণ্ড হবে।

—মহানবাবুও ঠিক সময়ে সরে গেছে। মনে হয় ওকে বিশ্বাস করে ভুল করেছিলাম।

কেদারবাবু চুপ করেই থাকেন। বেশ বুঝেছেন আজকের এই আঘাত এদের মনোবলকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সহজে এরা আর তেমন কোন আন্দোলনে যেতে সাহস করবে না, কিন্তু কথাটা এদের বলা ঠিক হবে না জেনে চুপ করে গেলেন

কেদারবাবু। তবু নিজেকে কেমন অসহায় বলেই বোধ হয়। এতবড় অন্যায় ঘটে গেল, কিন্তু এর কোন প্রতিবাদ করার সাধ্য তার নাই, নীরব দর্শকের মতই দেখছেন এই নির্মম অত্যাচারকে।

রতনবাবুর বাগানে আজ বেশ খুশির হাওয়াই বয়। মহানও এসেছে রাতের লঞ্চে এখানে। গতকালের ঘটনার খবর সে পেয়েছে আগেই। তাই রাতের অন্ধকারে এসেছে, পরিস্থিতি বুঝে সে এবার তার পথ নেবে। মনে হয় মহানের যে ওই লোকগুলো এই ব্যাপারে তার কারসাজিটাকে বোধ হয় ধরতে পারেনি।

এসেছে চরণ ডাক্তার, কাল দুপুর থেকে রাতভোর সে দুহাতে টাকা রোজকার করেছে, আরও কিছুদিন করবে, কারণ অনেকের আঘাত বেশিই। তাদের সেরে উঠতে বেশ ক'দিন লাগবে, আর ততদিন তারও রোজকার হবে।

গঙ্গা পূজার মুখে মা গঙ্গা চরণকেও বেশ কামিয়ে নেবার সুযোগ দিয়েছে।

আজকের আসরে মধ্যমণি ওই ঢোলগোবিন্দ বাবু। মুরগীর মাংস, পানীয় সবকিছুর ব্যবস্থাই হয়েছে।

ঢোলগোবিন্দ বলে, কি রতনবাবু বলিনি, কাজ আমি নিখুঁতই করি, যা ঘা দিয়েছি ব্যাটারা এখন বছরখানেক মাথা তুলতে সাহস পাবে না!

মহান শুনছে কথাগুলো, চরণ বলে,

—তা বটে। আপনার হাতের কাজ বেশ নিখুঁতই! প্রাণে মরেনি, তবে মালুম পেয়েছে।

রতন বলে—দারোগাবাবু, এ ব্যাটাদের তো ঠাণ্ডা করলেন, আবার কেস কাবারি হবে না তো?

দারোগা বলে ওঠে—ওর জন্য ভাববেন না। খাতাপত্র সব ঠিক রেখেছি। কাল দুটো ডাকাতি হয়েছে, পীরখালির গঞ্জে আর সামসেরপুরে। ওই মহেশ, নিতাই আর অলককে বলেন তো দিই ডাকাতির কেসে ঝুলিয়ে, টেনে এনে হাজতে পুরে কচুয়া ধোলাই দিয়ে সদরে চালান করে দেব।

রতন জানে হিসাব করে পা ফেলতে হয়, এসব করলে তারও অসুবিধা হতে পারে। এছাড়া রতন জানে এসব খবর রাজার কাছেও পৌঁছে যাবে, সে কোনদিকে ঘা মারবে কে জানে।

তাই বলে—না, না, এখন ওসব করে কাজ নাই, এইটাই সামলাই।

চরণ বলে—মহেশরা সদরে যাবে না বলেই বোধহয়, এখন এদের নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে।

রতন বলে— বরং রাজাকে ধরার ব্যবস্থাই করুন, রাজাকে পেলেই ব্যস, এদের

ঠাণ্ডা করে দিতে পারবো।

গোবিন্দ দারোগা মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে চিবুতে বলে— এবার তাই করবো, উপর থেকেও চাপ আসছে, সেখানেও নাকি সাড়া পড়েছে জলদস্যুদের ধরতেই হবে। দেখবেন কেমন কম্বিং অপারেশন চালাই আমি, ধরা পড়বেই রাজা।

রাজা ওই বনের নির্জনে মাছ ধরার বেশ বড় ব্যাপার শুরু করেছে। ব্যবসা ভালোই চলছে। ওদিকে মানুষজনও তাকে ভালোবাসে। ওরা দেখেছে আগে ছুটকো ছাট্কা লোক দলবেধে গাং-এ নিরীহ যাত্রী, মালবাহী নৌকার ওপর হামলা করতো, অনেক খুনজখমও হতো।

কিন্তু রাজার দল এদিকে আসার পর আর সে সব ঘটনা ঘটে না। রাজাই এমনি দুচারজনকে ধরে ফেলে এমন মারধোর করেছে যে তারা এসব ছেড়ে রাজার নৌকোতেই মাছ ধরে। নায্য দামও পায়।

ভালই আছে তারা।

তবু রাজার মন পড়ে থাকে শ্যামপুরগঞ্জের দিকেই। তার আসল কাজ এখনওবাকী রয়ে গেছে। রতনবাবুকে এখনও তার হিসাব চুকিয়ে দিতে পারেনি, এক একসময় মনে হয় রাতের অন্ধকারে গিয়ে ওই রতনকে শেষ করে আসবে।

কিন্তু কাপুরুষের মত রাতের অন্ধকারে তাকে শেষ করতে চায় না, এদিকার কাজেও ব্যস্ত থাকতে হয়।

হঠাৎ এমনি দিনে খবর আসে গঞ্জের অসহায় মানুষদের রতন কৌশলে তার বাড়ির কাছে এনে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছে। বেশ কয়েকজন আহত, সারা গ্রামের লোক কম বেশি আহত হয়েছে।

নগার ভাইটারও মাথা ফেটেছে, মহেশ কাকারও চোট লেগেছে। রাজা গর্জে ওঠে। কি ভেবেছে রতন? —সবার সর্বস্ব দখল করবে, উল্টে মারবে গ্রাম শুদ্ধ লোককে? চল নগা, একটু দেখে আসি।

নগা বলে— মাথা গরম করিস না রাজা, এখন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে।

রাজা বলে— আমার মাথা ঠাণ্ডাই থাকে, চল।

দুটো বোট নিয়ে চলেছে তারা দল বেঁধে, নগা বলে

—আগে মাস্টারমশায়ের কাছে চল, তারপর যা হয় করা যাবে।

গঞ্জের ওই মানুষটিকে রাজা শ্রদ্ধা করে, নগার কথায় বলে— তাই চল। তারপর দেখা যাবে।

কেদারবাবুর কাছে এসেছে মহেশ, অলকরা। রাতের অন্ধাকারে আজ ওরা এসেছে

কি করা যায় তার পরমার্শ করতে। কেদারবাবুও ভেবেছেন কথাটা। মহেশ বলে—এইভাবে মারবে, এর বিহিত হবে না?

হঠাৎ ছায়া মূর্তির মত ক'জনকে ঢুকতে দেখে চাইল ওরা। রাজা গিয়ে প্রণাম করে কেদারবাবুকে। রাজাই বলে—হবে মহেশকাকা, ওই রতনকে বাড়ি চড়াও হয়েই এর জবাব দেব। দরকার হয় শেষ করে দোব ওকে।

কেদারবাবু বলেন—না এসব করিস না রাজা। এতে বিপদ হতে পারে।

রাজা বলে—আমার আবার বিপদ হতে বাকী কি আছে মাস্টারমশায়?

লোকে বলে আমি নাকি ডাকাত, বিশ্বাস করুন একজনের সর্বনাশই করতে চাই, তাকে শেষ করা পাপের কাজ যদি হয় সে পাপকে রাজা ভয় করে না।

কেদারবাবু বলেন—অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করা যাবে না রাজা। তাতে অন্যায়কেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

একটু অপেক্ষা কর, ওর পাপের ভারার পূর্ণ হলে ওর সর্বনাশের দিনও আসবে, আর শেষ করে দিলে তো সে মুক্তি পেয়ে যাবে, তাকে তিলেতিলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না।

রাজা বলে—তবে কি এর বিহিত হবে না?

কেদারবাবু বলেন—কথাটা আমি ভেবেছি। অলক তুমি কলকাতায় যাবে, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এখানের সব খবর সেই ভদ্রলোককে জানাবে। খবরের কাগজের নামী লোক, তাদের কাগজেই নয় অন্যত্র তারাই ছাপার ব্যবস্থা করে দেবে। সারা দেশের লোক জানবে সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চল এই স্বাধীনতার পরও লোকজন কিভাবে অন্যায় অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, এতেই টনক নড়বে পুলিশেরও, কর্তাদের।

রাজা চুপ করে শুনছে কথাগুলো, অলকও বলে— তাই ভালো রাজা, নিজেরা আমরা এমন কিছু করব না যাতে ওরা আইন এর দোহাই দিয়ে আমাদের ওপর আবার অত্যাচার করতে পারে।

রাজা বলে—মাস্টারমশায় যখন বলছেন তাই করো। তবে আমার মনে হয় ওই আইন ভাঙে মানুষ সেদিন, যেদিন আইন তাদের কোনও সাহায্যই করে না, আইনকে যখন কেউ কিনে নেয়। নাহলে দারোগা নিরীহ জনতার উপর লাঠি চালালো এভাবে কার জন্য?

কেদারবাবু বলেন—রাজা, শেষ অবধিই দেখব আমরা। এখন এতগুলো লোকের দিন চলবে কি করে? ওরা তো কাজও করতে পারবে না কিছুদিন।

রাজা বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলে মাস্টার মশাই, এ আমার নিজের পরিশ্রমে মাছ এর ব্যবসার টাকা, ওদের কাজে লাগুক।

শিখা জেগেছিল, সে একটু অবাক হয়ে। বাবা যে এখনও ওই মানুষগুলোর জন্য ভাবে তা বুঝেছে। ওদের কথা শুনছিল, তারপর রাজার সতেজ কণ্ঠস্বরও শুনেছে।

সে আজ একটা কিছু করার জন্যই তৈরি হয়ে এসেছে। কিন্তু বাবার কথার উপর কথা বলে না, নীরবে ওদের সিদ্ধান্তই মেনে নেয় রাজা।

এখন বোধহয় তার অনেক টাকা। সেই টাকাই দিতে এসেছে।

রাজা বের হয়ে আসছে।

হঠাৎ বাইরের মাঠে শিখাকে দেখে থামলো।

—কেমন আছো শিখা? রাজাই এগিয়ে আসে ওর দিকে।

শিখা বলে—ভালোই, তুমি কি এদের টাকা দিতে এসেছিলে?

রাজা চুপ করে থাকে।

শিখা বলে—এখন তোমার অনেক টাকা না?

রাজা শুনছে ওর কথাগুলো। বলে সে—তুমি যেন ঝগড়াই করতে চাও?

শিখা শ্লেষভরা কণ্ঠে বলে—ঝগড়া! তোমার সঙ্গে? ওরে বাবা। প্রাণের ভয় আমার নাই?

রাজা বলে—কি বলছ তুমি!

—ঠিকই বলছি, শিখার মনের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বেদনা আজ প্রকাশ পায়। বলে সে—আজ তুমি বদলে গেছে রাজা, ঘরের মায়া ছেড়ে আজ শুধু টাকার জন্য ওই বাদাবনে গিয়ে ডাকাতি শুরু করলে? ছিঃ ছিঃ, —তোমাকে নিয়ে একদিন কত স্বপ্ন দেখেছিলাম একথা ভাবতেও আজ আমার লজ্জা করে।

—শিখা। বিশ্বাস কর, এসব মিথ্যে রটনা। এসব ওই দারোগা আর রতনবাবুর মিথ্যা রটনা। আমি ওসব করি না।

—থামো। আমার সামনে আর মিথ্যা কথা বলে নিজের সাফাই গাইতে হবে না। তোমাকে আর কেউ সাধু বলে বলুক, আমি তোমাকে জানি। তুমি একটা ডাকাত! ডাকাত। তোমাকে ঘেন্না করি—হ্যাঁ। ঘৃণাই করি তোমাকে। সরে যাও তুমি আমার সামনে থেকে — যাও।

কথাগুলো বলে শিখাই কি অসহ্য কান্নায় ভেঙে পড়ে।

রাতের বাতাসে তার মনের হাহাকার জাগে, অন্ধকারময় এক জগৎ— রাজা মাথা নিচু করে ওই অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

শিখা কার ডাকে চাইল।

গোলাবীও এসেছিল এইদিকে তার এক বোনপোর বাড়ি ওষুধ পৌঁছে দিতে।

ছেলেটাও বেদম মার খেয়েছে সেদিন। রাজা এসেছে দেখেছে গোলাবী।

তাই সে ও এসেছিল দেখা করতে।

কিন্তু শিখার সঙ্গে রাজার কথাগুলোও শুনেছে সে। আর চমকে উঠেছে। গোলাবী কেন গঞ্জের অনেকেই জানে রাজার খবর। সে এখন ভালো ব্যবসা করছে। রতনবাবু অবশ্য চেষ্টা করেও তার নাগাল পায়নি।

কিন্তু ডাকাতি সে করে না। ওইদিককার মানুষও ভালবাসে তাকে, তাদের কাছে রাজা বন্ধু, কিন্তু রতনের কাছে সে চরম শত্রুই। তাই রতনই এই রটনা করেছে রাজা ডাকাত।

আজ শিখাকেও ওই কথা বলে রাজাকে ব্যথা দিতে দেখে গোলাবীও অবাক হয়। বলে সে—কাকে কি বলছ দিদি? রাজার মত ছেলে হয় না। এই গঞ্জের মানুষের মুখে সে আজ অন্ন তুলে দিয়েছে। তাদের রতনবাবুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, আজও ওই মানুষগুলোর মুখের গ্রাস দিয়ে গেল, আর ওকেই ওসব বললে তুমি?

শিখা দাঁড়ালো না, সে কোনমতে ভিতরে চলে গেল।

গোলাবী স্তব্ধ হয়ে দেখে মাত্র—রাজাকেও দেখা যায় না। আজ গোলাবীর রাজার জন্যই দুঃখ হয়। জীবনে রাজা পায়নি কিছুই, সবই তার হারিয়ে গেছে, তবু শিখাদির সঙ্গে ওর সম্পর্কটা জানতো গোলাবীই। মনে মনে খুশী হয়েছিল গোলাবী, রাজার শূন্য জীবনে তবু এতটুকু সান্ত্বনার ঠাঁই আছে। কিন্তু আজ বুঝেছে সেই পাওয়াটুকুও নিঃশেষে হারিয়ে গেছে রাজার জীবন থেকে, এই হারানোর ব্যাথা বুকে কত যে বাজে তা জানে গোলাবী। নিজের জীবনের হাহাকারটাকে চেনে সে, আজ বুঝেছে রাজাও তেমনি নিঃস্ব হয়েছে গেছে।

নগা নৌকায় বসেছিল, বাইন কেওড়া গাছ কতকগুলো রয়েছে নদীর ওদিকে। ওখানে কেউ সাধারণতঃ যায় না। ওরই আড়ালে নৌকা দুটো রেখে বসে আছে তারা, নদীর বাঁকের মাথায় রতনবাবুর বড় বাড়িটা দেখা যায়।

নগা রাজাকে এসে নৌকায় উঠতে দেখে চাইল।

নগা শুধোয়—কি হলো?

রাজা বলে—কিছু না, চল, ডেরায় ফিরে চল।

নগার দলবল উন্মুখ হয়েছিল একটা কিছু করতে হবে, তারাও চায় র কিছু শিক্ষা দিতে, কিন্তু সে সব কিছুই হয় না।

নগা বলে—ফিরে যাবো?

রাজা গর্জে ওঠে—কি বললাম তোকে? শুনতে পাস না?

নগা নৌকা ছেড়ে দিল নীরবে, বুঝেছে একটা কিছু ঘটেছে, এখন আর ওসব কথা বলা ঠিক হবে না, পরে শোনো যাবে, নৌকা দুটো কালো বিন্দুর মত আবার রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

রাজা চুপ করে বসে আছে, নগা বলে

—একটা খবর ছিল!

চাইল রাজা! নগা বলে—আমরা এসেছিলাম গঞ্জে সে খবর রতনবাবু পেয়ে যাবে, তবে এখন নয়—কাল বেলাতেই জানতে পারবে।

—মানে? তুই কি গেছলি ওখানে? রাজা শুধোয়।

নগা বলে—তখন বলতে পারিনি যা মেজাজ ছিল তোর, কি হয়েছে।

নগাই ঘটনাটা বর্ণনা করে, ওরা নদীর ধারে নৌকা ভিড়াতে রাজা নেমে চলে যায়। ওরা দু তিনজন রাজার পিছনে এসেছিল, হঠাৎ দেখে ভেড়ির ওদিক থেকে ফটিক আর বুলেটকে। ওরা দেখে ফেলেছে তাদের।

ফটিক বলে—বুলেট, দৌড়ে চল, রতনবাবুকে খবর দিতে হবে রাজাও জালে পড়েছে।

ওরা দৌড়াচ্ছে, নগার দলও বিপদের গুরুত্ব বুঝে দুটোকে ওই পলিকাদার মধ্যে ঠেসে ধরেছে। একজন বলে—দে শেষ করে।

কিন্তু রাজার হুকুম কাউকে প্রাণে মারা যাবে না, তাই ওরা নৌকা থেকে রসি আর পাটের ফোঁসা এনে দুজনের মুখে ঠেসে হাত পা বেঁধে ফেলে।

একজন বলে—দে গাছের ডালে ঝুলিয়ে, মরুক ওরা। তা না করে মোটা শিরীষ গাছের বেশ উঁচু ডালে ধরাধরি তুলে দুটোকে ওই অবস্থায় বেঁধে রেখে এসেছে।

নগা বলে—রাতভোর ওই হিমে থাকুক গাছের ডালে বাঁধা, তারপর দিন যদি কেউ দেখে তা নামাবে বাছাধনদের। তখন বুঝবে অন্যকে মারার মজাটা।

রাজা চুপ করে থাকে, মসৃণ গতিতে নৌকা দুটো চলেছে সি হর্স ইঞ্জিনের একটানা শব্দ তুলে, রাজা তখনও শিখার কথাগুলোকে মন থেকে সরাতে পারেনি, তবু বলে।

—রতনবাবু এবার জোর করেই ধরার চেষ্টা করবে আমাদের।

নগা বলে—থাম তো, ওর সব নড়াচড়ার খবরই পৌঁছে যাবে। রতন জানে না ও বারুদের টিবির উপর বসে আছে।

পরদিন সকালে রতন গদিতে এসেছে। ফটিক, বুলেট তখনও আসেনি, ওরা সকলেই এসে এখানে চা খায়, নন্দ সরকার ধূপ ধুনো দিচ্ছে। মণ্টাকে শুধোয় রতন,

—সে দুটো কোথায়? কাল রাতভোর ধেনো গিলেছে নাকি ফটিক, বুলেট?

মণ্টা বলে—কাল রাতে ওরা কেউ ফেরেনি, সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গেল—তারপর আর আসেনি

—তাহলে গেল কোথায় দুটোতে?

রতনের কথায় মণ্টা বলে—তাতো জানি না, গেছে কোথাও এসে যাবে।

রতন বলে—জরুরী কাজ ছিল, আজই রাতে বেরুতে হবে, কিছু মাল যাবে কলকাতায় আর তাদেরই দেখা নাই।

বেলা অবধিও ফেরে না তারা, গঞ্জের রোজকার কাজকর্ম শুরু হয়েছে, ক্রমশঃ গঙ্গাপূজার দিন এগিয়ে আসছে, লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে হাটে।

ফটিক বুলেটকে ওরা ওই গাছের ডালে হেলান দিয়ে বেঁধে রেখে গেছে, গাছটার প্রধান কাণ্ডটা বারো পনেরো ফিট উপরে গিয়ে কয়েকটা বিরাট ডাল নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। ওই জায়গাটা বেশ প্রশস্থ, সেখানে তুলে ওদের দুটো ডালে দুজনকে বেঁধে রেখে গেছে।

সর্বাঙ্গে পলিকাদা শুকিয়ে গাছের ডালের মত কালচে হয়ে গেছে, মুখে পাটের ফেঁাসা গোজা হাত পা বাঁধা, কিছু করার নাই, দুচারজন মানুষ যাতায়াত করছে কিন্তু ডালের আড়ালে ওই দুই মূর্তিকে ঠিক দেখতে পায় না তারা।

ওরা দেখছে নীচের লোকজনদের, কিন্তু কোনও আওয়াজও বের হয় না। ফলে এরাও কেউ খেয়াল করে না, দুই মূর্তি ওইখানে বিরাজ করছে। শীতে কাঁপছে, ঝিমিয়ে আসে সারা দেয়, ফটিকের সামনে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, এইভাবে তাকে মরতে হবে তা ভাবেনি।

কোথা থেকে একটা শকুন ডানা মেলে উড়ে এসে স্থির দুই মূর্তিকে দেখে গাছের ডালে বসলো।

বুলেট চমকে ওঠে, তার জ্ঞান এখনও রয়েছে, ফটিকের চোখের সামনে ওই শকুনের লাল চোখ দুটো ফুটে ওঠে, এগিয়ে আসছে শকুনটা। ডানার ঝটপটানি শোনে, ও দেখছে এদের।

একটু নাড়াচাড়া দেখেই ডানা ঝটপট করে সরে যায়। আবার এগিয়ে আসে, ধারালো ঠোঁটটা দেখছে ফটিক।

বুলেট কোনমতে নাড়াচাড়া করতে আবার সরে যায় শকুনটা।

গাছের নীচে দিয়ে দুতিনজন হাটুরে যাচ্ছিল, তাদের একজন বলে— শালা শকুনটা উখানে কি করছে গো, গাছের তেমাথানি ডালে?

এদের নজর পড়ে এবার এই দুই মূর্তিকে, কাদা শুকিয়ে মুখ কপাল ঢেকে গেছে,

হাত পা মুখ সব বাঁধা। একজন বলে— গাছের ডালে কি রে? মড়া নয় তো?

অন্যজন নিরীক্ষণ করে বলে— নারে, নড়ছে ওটা, দ্যাখতো—

ওরাই কৌতুহল বশে গাছে ওঠে শকুনটাকে তাড়িয়ে তারপর ওদের বাঁধন খুলে নামাতে এবার মুক্ত হয় ওরা। এবার ওরাও চিনতে পারে— ইযে রতনবাবুর লোক ফটিক গো— হাটে তোলা তোলে দুটোতে, রংবাজী করে।

ওরাই বলে— ওদের থেকে বড় রংবাজ কেউ ওদের সঙ্গে রংবাজী করে গেছে।

ততক্ষণে লোকজন জুটে যায়, ফটিকদের হাঁটার মত অবস্থা আর তখন নেই। গাছতলায় শুয়ে পড়েছে ওই অবস্থাতেই, খবরটা ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ার বেগে।

একটা ভ্যান রিক্সায় দুটোকে চাপিয়ে নিয়ে আসা হলো রতনের গদি ঘরে।

রতনবাবু অবাক হয়— এ দুটো কি রে?

ফটিক তখন চি চি করছে, মুখে চোখে সর্বাঙ্গে জমাট শুকনো কাদার পুলটিশ, পরণে জামাপ্যান্টও ঢেকে গেছে কাদায়।

ফটিক বলে— আমি ফটিক গো—

— এ্যা, ফটকে, তুই! রতন চমকে ওঠে।

বুলেট বলে— রাতে ওই রাজা এসেছিল গঞ্জে, ওকে দেখে ধরতে গেলাম, ওর লোকজন আমাদের কাদায় চটকে তারপর ওই গাছের ডালে টাঙ্গে দে গেল।

রতনবাবু চমকে ওঠে— এ্যাঁ, রাজা এসেছিল গঞ্জে? কোথায়?

—তা জানি না। ভেড়িতে দেখলাম।

গোবিন্দ দারোগাও খবর পেয়ে এসে পড়েছে। রতনবাবুর কেস সরেজমিনে তদন্ত না করলে বিপদ হবে, তাকে দেখে রতনবাবু বলে।

—দ্যাখো দারোগা, রাজা এখানে এসেছিল আমাকেই শেষ করতে, এ দুটোকে পথে দেখে কি হাল করেছে দ্যাখো।

গোবিন্দ বলে—এ্যাঁ, রাজা এসেছিল, এখানে?

—হ্যাঁ। অথচ তুমি তাকে খুঁজে পাচ্ছো না। যেভাবে হোক ওকে ধরতেই হবে, না হলে কোনদিন দলবল নিয়ে এসে আমার বাড়িতেই ডাকাতি করবে. খুনও করতে আসবে আমাকে।

দারোগা গর্জে ওঠে—নেভার। এ হতে দেব না। এবার ব্যাপক কম্বিং অপারেশন চালাচ্ছি। দেখুন ধরবোই ওকে।

দারোগাও এবার আর একবার তার এলেম দেখাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগে।

অলক শহরে এসেছে কেদারবাবুর চিঠি নিয়ে, সে ওই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণও লিখে

এনেছে। আর গঞ্জের হারু পালের ভাইপো ছিদাম মাঝে মাঝে ছবি তোলে, তার একটা ক্যামেরাও আছে, আর ইদানীং গঞ্জে ছিদাম তাদের দোকানের পাশে একটা ফটো তোলার স্টুডিও করেছে।

হাটবারের দিন, লোকের বিয়ে থা, অন্নপ্রাশন—এসব দিনে অনেকে ছবি তোলায়। ছিদাম অবসর সময়ে সে সব কাজও করে।

সেদিন ওই মিছিলের বেশ কিছু ছবি তুলেছিল ছিদাম। পুলিশের দারোগা নিজে ভিড়ে ধরাশায়ী মেয়ে-শিশুদের উপর বীর বিক্রমে লাঠি চালাচ্ছে। পুলিশ পিটছে অসহায় জনতাকে। এসব ছবিও তুলেছিল।

অবশ্য তার ছবি তোলার ব্যাপারটা বিশেষ কেউ লক্ষ্য করেনি, কোনও গুরুত্বই দেয়নি, তাই ছিদাম বেশ কয়েকটা ভালো ছবিই পেয়েছিল।

অলক সেই সব ছবি আর বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে নিয়েই কলকাতায় আসে। কেদারবাবুর এক বন্ধুপুত্র নামী কাগজের সাংবাদিক। সে ওই খবরটা ছবি সমেতই কাগজে বোল্ড হেড লাইন দিয়ে ছাপায়। সুন্দরবনে অরাজকতা— এই লীডার দিয়ে খবরটা ছাপা হয়, তার সঙ্গে মহান নেতা তার পৃষ্ঠপোষক রতনবাবুর কীর্তিকলাপ, স্থানীয় পুলিশের অকর্মণ্যতার অত্যাচারের খবরও ফলাও করে ছাপা হলো।

শুধু তাদের কাগজেই নয়, কলকাতার অন্য কাগজেও প্রকাশিত হলো সেই খবর, আর সেই খবর প্রকাশিত হতে সারা অঞ্চলে হই হই পড়ে যায়। বিরোধী পক্ষ এবার এসেম্বলীতে সাড়া তোলে, বিভাগীয় মন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে।

তিনিও জেলার পুলিশ কর্তাকে তলব করলেন বিশদ খবরের জন্যে।

মহান ভাবেনি যে ওই দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর কলকাতার নামী দামী কাগজে এইভাবে ছবি সমেত বের হবে। এতদিন ধরে তারা ওই অঞ্চলে অবাধে অত্যাচার চালিয়েছে। কিন্তু সে খবর গাং পার হয়ে সভ্যজগতে, রাজধানীতে এসে পৌঁছায়নি।

এবার আর তা হয়নি, মহানকে এবার অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার দলের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে।

আর রতনবাবু এবার ওই কাগজ আর ছবিগুলো দেখে চমকে ওঠে। দারোগার ওই মেয়েদের ওপর লাঠি চালানোর দৃশ্যটাও রয়েছে।

রতন এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়নি। বেশ বুঝেছে যে এবার তাকে শত্রুপক্ষ ঘিরে ধরেছে, সারা গঞ্জের মানুষও জেনেছে এই খবর রতনবাবুর মুখোশ খুলে দিয়েছে।

মহানও এসেছে, সে এবার বুঝেছে ওই সাধারণ মানুষরা তার স্বরূপকে চিনে নিয়েছে,

আজ হাটতলাতে তাকে দেখে কারা আওয়াজ দেয়— রতনের চামচে— শালা নেতা নয় রে, রতনের ঘর পোঁছা ন্যাতা।

মহান শুনেও শোনে না। তখন কয়েকজনকে নিয়ে সে হাটতলায় আর একটা টিউবয়েল বসানোর কথা ঘোষণা করছে, জানায় পাকা জেটিও বানানো হবে।

কে ভিড় থেকে মন্তব্য করে— কবে হবে র‍্যা? ওতো পেথম থেকেই শুনেছি, আবার তাতিয়ে রতনের পুলিশ দিয়ে প্যাঁদানি দেবার মতলব নয় তো র‍্যা!

মহান জানে নেতা হতে গেলে দুকান কাটা হতে হবে, আর পিঠে গণ্ডারের চামড়া বানাতে হবে, তাই ওসব কথা শুনে ও শোনে না, দেশ সেবার কথাই শোনায়, এখনও। এখনও আশা রাখে মহান সামনের নির্বাচনে ভোট পাবেই।

রতনবাবু গর্জে ওঠে মহানকে দেখে।

—কি হচ্ছে এসব? কাগজে কি লিখেছে, ছবি ছেপেছে দেখেছো? কে করলো এই কাণ্ড?

মহান তা জানে না। তবু মনে হয় প্রতিপক্ষের অলক লেখাপড়া জানা ছেলে। কলকাতায় তার যাতায়াত আছে। তাই বলে

—অলকও করতে পারে।

—ছবি কোথায় পেলো?

ফটিকরা এখন আবার সজীব হয়েছিল, তার উঁচু মাথা হেঁট করে দিয়েছে ওই রাজা, সারা আবাদের লোক ওদের দেখলে আড়ালে হাসে। কেউ বলে

—গাছের ডালে বসে গাং এর বেশ হাওয়া খেয়েছিলি, নারে?

ফটিকের রাগও ওদের উপর জমছে আরও ঘনতর হয়ে। ফটিক বলে

—এই ওই ছিদামের কাজ, ওই ফটক তোলে, দোব ওর দফা নিকেশ করে?

দারোগাবাবু ওই ছবি কাগজে দেখে একটু ঘাবড়ে গেছে, সত্যিই সে মেয়েদের ওইভাবে মেরেছে তা বিশ্বাস করতেও পারে না। এনিয়ে তার স্ত্রীও বলছিল।

—মেয়েদের উপরই যত মস্তানি, এই তোমার দারোগাগিরি? ধরতে রাজাকে তবে জানতাম, এবার দেকবে সবাই ক্যামন কাজের লোক তুমি।

ঢোল গোবিন্দ দারোগা ঘরেও কথা শুনছে। এখানেও—

রাজা, ওই একটা ছেলেই যত নষ্টের মূল, আবাদের তার নাকের সামনে আসে, ঘোরাঘুরি করে, অথচ দেখা পায় না সেইই।

আজ ফটিকদের ওই ছিদামের দোকানে হানা দেবার কথায় বলে

—ওসব করো না, হাওয়া গরম, এ খবরও চলে যাবে কলকাতায়, যা করার অন্যভাবে করতে হবে।

রতনের মন মেজাজ ভালো নাই, বলে সে
—ধরো তো রাজাকে, তা নয় ফুটানি।

তাই এবার ঢোল গোবিন্দ দারোগা বোট নিয়ে পুলিশবাহিনী নিয়ে বের হয়েছে গাং-এ। এই দিক কেন—আশপাশ এলাকার গাং-এ ঘুরছে সে। যে কোন নৌকাতেই চড়াও হয়ে তল্লাশী করছে।

দুচার জন নিরীহ বাওয়ালিদেরও ধরে আনছে। তাদের উপরও নিজের অক্ষমতাকে ঢাকার জন্য মারধোর করছে। বলে—কোথায় রাজা, বল!

তারাও জানে না রাজার খবর, মার ধোরই খায় বৃথাই। দারোগা এখন সারা এলাকায় বীর বিক্রমে ঘুরছে রাজার সন্ধানে, কিন্তু সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

খববটা রাজাও পায় সবই, তার লোকজন ছাড়াও স্থানীয় জেলে কাঠুরিয়ার দলও চেনে রাজাকে, নানাভাবে তারা সাহায্য পায় রাজার কাছে।

তারাই রাজাদের দারোগার গতিবিধির সব খবর দেয়। দারোগা যে যাকে তাকে ধবে নিয়ে গিয়ে মারধোর করছে সে খবরও দেয় তারাই। রাজাও এবার দারোগাকেই জব্দ করার মতলব বের করে।

গঞ্জে যে এবার রতনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে আবার সে খবরও পায় রাজা। আর তাতেও সক্রিয় মদত যোগায় রাজাই।

নগার কিছু দলবল সেদিন গাং-এ মাছ ধরছে। ঢোল গোবিন্দ দারোগা সদলবলে এসে হাজির হয় বোট নিয়ে, জেলেদের দেখেই এগিয়ে আসে। পাটাতনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়ে ঢোল গোবিন্দ —

—এ্যাই ব্যাটারা, রাজাকে দেখেছিলি এদিকে?

লোকগুলো এবার বলে কাতর স্বরে—হুজুর মা বাপ, ওই রাজার জুলুমের কথা আর বলবেন না।

—কেন? কি হলো? ঢোলগোবিন্দ দারোগা পাটাতনে এসে ওদের নৌকার কাছে দাঁড়ায়, হুকুম করে

—বল কি করেছে রাজা?

—আর বলবেন না হুজুর মা বাপ, সিদিন বৈকালের দিকে ভর কোটালে ভাবনু গাং-এ মাছ এর ঝাঁক আসবে গোণে। তাই মামু, খুদি ভাইপোকে নে বড় জাল নে বের হলাম। সাত পর্দার জাল—এক্কেবারে নাইলনের, ইয়া বল ফিট করছি, ক্যানিং এর মহাজনের কাছে সাড়ে সাতশো টাকা দে নিলাম, দারোগা ধমক দেয়—জালের

গপ্প রাখ, তারপর কি হলো বল?—তাই তো বলছি হুজুর মা বাপ, তা জাল খান বিদ্যালদীতে ফেলত্যাছি—লম্বা জাল।

ওদিকে দারোগা তখন জাল ফেলার গপ্প শুনছে আর এই ফাঁকে দেখা যায় রাজা তারই বোটের ছই থেকে ওদিকে টেনে টেনে গোটা কয়েক রাইফেলকে নদীর জলে নীরবে ফেলে দেয়, তার সঙ্গে দারোগাবাবুর ক্লান্তি দূর করার বিলাতী পানীয়ের বোতল কটাকেও গাং ডুবিয়ে নিজেও টুপ করে জলে নেমে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জেলেটা তখন জাল ফেলার গপ্প শেষ করে বলে— তারপরই হুজুর রাজার দল নৌকা নে এসে ইয়া তলোয়ার দেখিয়ে ওই জালখান টেনে নে চলে গেল হুজুর।

—কোনদিকে গেল?

লোকটা বলে—ওই বাদাবনের দিকে।

তারপর হাউমাউ করে ওঠে—রাজার হাত থেকে বাঁচান হুজুর মা বাপ, নালি গাং-এ মাছ ধরতি পারবোনি, বালবাচ্ছা নে উপোস দিতি হবে।

দারোগা অভয় দেয়—কোন ভয় নাই, নজর রাখবি, রাজার কোন খবর পেলেই জানাবি আমাদের।

দারোগা এবেলার টহল শেষ করে এবার তার মাঝিদের বলে, — চল।

ওরা চলে যায় এবার দূরের কোনও গ্রামে দিকে। এর মধ্যে দারোগাবাবুব তেষ্টা পেয়েছে, নৌকাতেই তার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রতনবাবুই স্কচ, এমনকি বিয়ারও রেখে দেয়, নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থাও আছে।

দারোগাবাবু এর বিয়ারের বোতল খুঁজতে গিয়ে চমকে ওঠে। একটা বোতলও নাই নৌকাতে। গর্জে ওঠে দারোগাবাবু।

—এ্যাই তেওয়ারি এতগুলো মদের বোতল ছিল, একটা ত নাই। কাঁহা গিয়া ওসব চিজ?

তিওয়ারির নজর পড়ে কোনে রাখা রাইফেলগুলোর দিকে। সাতটা রাইফেলের দুটো রয়েছে, বাকী পাঁচটা উধাও। গুলির বাক্সটাও নাই।

তেওয়ারি বলে—হুজুর, দারুকা বটলিয়া গিয়া সাথ সাথ পাঁচটো রাইফেল ভি গায়েব।

—এ্যাঁ। এবার দোলগোবিন্দ দারোগা চমকে ওঠে। দেখে নৌকাতে ওদিকে জলের দাগ। আর রাইফেল, গুলির বাক্সও নাই।

দারোগা হুঙ্কার ছাড়ে— ক্যা হুয়া। কাঁহা গিয়া রাইফেল?

কিন্তু মাঝি দুজনও জবাব দিতে পারে না। পুলিশরাও পাটাতনে তাস খেলছিল রাইফেল রেখে, ছই এর ভিতরের খবর তারাও কিছু জানেনা।

ঢোলগোবিন্দ দারোগার এবার ঘাম নয়, সত্যকার কালঘামই ছুটছে, বেশ বুঝেছে

কেউ নৌকায় কোন ফাঁকে উঠে তার এই চরম সর্বনাশই করে গেছে। এতদিন কোনওমতে চাকরিটা বজায় রেখেছিল, এবার সেটাই না যায়।

তারই হেপাজত থেকে এতগুলো রাইফেল, গুলি হারিয়ে গেল, সদরেও রিপোর্ট দিতে হবে। তারপরই কি আছে তার ভাগ্যে কে জানে? দোল গোবিন্দ আজ বুঝেছে এসব রাজারই কাজ।

তাই বলে সে— নৌকা, ওই জেলেরা যেখানে ছিল সেখানেই নিয়ে চল, ওই ব্যাটারাই সব জানে, জলদি—

বোট নিয়ে এগিয়ে আসছে দোলগোবিন্দ, বাকী দুটো রাইফেল নিয়ে ওর লোকদের তৈরি থাকতে বলে।

—ব্যাটারা যেন পালাতে না পারে, দরকার হলে গুলিই চালাবে তবু ধরতে হবে ওদের।

কিন্তু ওই গাং-এ এসে দেখে কোন নৌকাই নাই।

সেই জাল ফেলার গল্প শোনানো জেলেদের কেউ নাই, ধূ ধূ করছে গাং— বাতাসে ঢেউ-এর কলধ্বনি, দোলগোবিন্দ হতাশ হয়।

—ব্যাটারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

একজন মাঝি বলে— রাজার খবর পেলেন স্যার?

গর্জে ওঠে দারোগা— চোপ।

এবার কি হবে তাই নিয়ে ভাবনাতে পড়েছে দারোগাবাবু।

সদরেও এবার সাড়া পড়েছে, খবরের কাগজের ওই খবর আর ছবিও নজরে পড়েছে পুলিশ সুপার মিঃ মজুমদারের। এসেম্বলীতে প্রশ্ন উঠেছে ওই রতনবাবুর নানা কারবার নিয়ে।

পুলিশ হেডকোয়াটারেও খবর আছে সুন্দরবন অঞ্চলে বিদেশি মালের বিরাট কারবার চলছে, ওদিক থেকেই সব মালপত্র আসে কলকাতায়। দু'একবার ট্রাকও ধরা পড়েছে বিদেশী মাল সমেত, কিন্তু ড্রাইভার খালাসীরা পলাতক, আর ট্রাকের নাম্বারও ফলস। ফলে কেসগুলোর সুরাহা হয়েনি, ধরতেও পারা যায়নি আসামীদের, তবে একটা দল যে নিয়মিত এই কাজ করছে তা বোঝা যায়।

কর্তাদের নজরও পড়ে রতনের উপর।

কিন্তু প্রমাণ নেই, লোকাল থানাও অনুসন্ধান করে কিছুই পায়নি তাই জানিয়েছে, এখানের দারোগা।

সেই রিপোর্টকে মেনে নিতে পারেন নি সুপার সাহেব, তার খবর আছে এই ব্যবসা

সমানে চলছে। আর ওই দোলগোবিন্দ বাবুকে ওই বাদাবনে পোস্টিং করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে শহরে বেশ কিছু রিপোর্ট আসার জন্যই। কিন্তু লোকটা সেখানে গিয়েও এইভাবে একপক্ষ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারই করছে, তার সাক্ষ্যপ্রমাণ সবই পেয়েছেন পুলিশ সুপার।

এমনি দিনে রিপোর্ট আসে পাঁচটা রাইফেল আর বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি বাক্স সমেত হারিয়ে গেছে থানা অফিসারের কাষ্টডি থেকে।

ওই সুন্দরবন অঞ্চলে সেইসব অস্ত্র যদি জলদস্যুদের হাতে পড়ে বিপদ তো হবেই, আর একজন পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে এভাবে অস্ত্র হারানো গুরুতর অপরাধ।

রতনবাবু এবার বুঝেছে ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ওদিকে দারোগাবাবুই বোকা সেজে ফিরছে। রাজার দলই বোধহয় কোনমতে তাদের রাইফেল গুলি নিয়ে সরে পড়েছে।

একেবারে বেলুন চোপসানো অবস্থায় ফিরে আসে দোলগোবিন্দ।

রতনবাবু এগিয়ে যায়— পেলেন রাজাকে?

দারোগা কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল থানার দিকে, রতনবাবু বেশ বুঝেছে কাজের কাজ কিছুই হয়নি, গজগজ করে রতন।

—ব্যাটা অকম্মার ধাড়ি, কোন কম্মের নয়।

ঢোল গোবিন্দ দারোগা যে এবার বিপদে পড়েছে তা বুঝেছে গঞ্জের মানুষ। রতনবাবুও হতাশ হয়, আর মহান জানে এসময় জনতার সামনে না যাওয়াই যুক্তিসঙ্গ ত কাজ। তাই সে ক'দিন আর এদিকে আসেনি, হাওয়ার গতি নিরীক্ষণ করছে সে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে মহান।

তবে পরিস্থিতি যে দ্রুত বদলাচ্ছে তা বুঝেছে।

শিখাও বুঝেছে সেটা। আগে গঞ্জের যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল এখন ক্রমশঃ জীবনের জটিলতা, মানুষের সচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পরিবেশও বদলাচ্ছে। তাই শিখাও চেষ্টা করছে কলকাতার ওদিকে কোনও কাজের।

আজ শিখার এই গঞ্জের প্রতি আকর্ষণও ফুরিয়ে গেছে।

গোলাবী আসে দুধের রোজ দিতে, মেয়েটি গঞ্জের চলমান গেজেট। অনেকের অনেক গোপন খবরই সে জানে, রতনবাবু, মহানবাবুদের খবরও।

এমন কি চরণ ডাক্তারও মাঝে দু'একবার তার ঘরে এসে রাত দুপুরে দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, গোলাবী বের হয়ে বলে— ডাক্তারবাবু যে গো। এত রাতে?

চরণ বলে— ভিতরে চল, কথা আছে।

গোলাবী জানে ওই লোকটার মতলব, বলে গোলাবী গলা নামিয়ে — ঘরে যে রতনবাবু আছে গো, চলো—

— এ্যাঁ, রতনবাবু। চরণ তাড়া খাওয়া শিয়ালের মত পালায় ভেড়ির উপর দিয়ে।

গোলাবী ওর ভাব সাব দেখে হাসতে থাকে।

সেদিন রতনবাবুও এসেছিল এমনি রাতে, গোলাবী তাকেও সে রাতে ওই চরণের কথা বলে দৌড় করিয়েছিল।

ওই জীবদের সে চেনে।

তাই শিখাকে বলে— এখানে মানুষ তো কটা, হাতে গোনা যায় গো। বাকী তো সব ছাগল।

— তোদের রাজাই মানুষ, না? শিখা বলে।

গোলাবী জানে শিখার ক্ষোভটাকে, সে বলে— মানুষ বলেই তো এখানে ঠাঁই নাই তাব, তুমিও চলে যাবে বলছো। তবে বলছি শিখাদি— তুমি ভুল করছো। আমি মুখ্যু তবু মানুষ চিনি, তুমি এত লেখাপড়া শিখেও মানুষ চিনলে না?

শিখা বলে, আর চিনে কাজ নাই।

গোলাবী বলে—দ্যাখোনা, এবার কি হয়? ওই মহানবাবু তো শুনি কেটে পড়েছে, রতনবাবুর সেনাপতি ওই দারোগা এবার কাবু হয়েছে, ক'খানা বন্দুকই না কি বেচে খেয়েছে— ধরাও পড়েছে। রতনবাবুর হাল কি করে এবার দেখো, মারের বদলা নেবার জন্য মানুষ ফুঁসছে, ইযার বিচার একদিন হবেই।

শিখা বলে— যা হবার হোক, ওসবে আর আগ্রহ নাই রে।

বাবাকেও বলি এখানে আর থাকার দরকার নাই, রতনবাবু যা করছে করুক, নজর দিও না।

রতন জানে দুর্বলতার প্রকাশ করলে শত্রুরা চেপে ধরবে। তাই সে মাথা উঁচু করেই চলতে চায়, এবাব গঙ্গাপূজাও করছে বেশ ধূমধাম করে।

নন্দ সরকার, ফটিকের দলও এবার কিঞ্চিৎ আমদানীর পথ পেয়ে খুশিই হয়েছে। হাটতলায় যথারীতি প্যান্ডেল বাধা হচ্ছে, শহরের সেই নাচউলির দলও এসে পড়েছে।

গঞ্জের ছেলেমেয়ে লোকজন ভিড় করে ঘাটে।

কাজলীবাঈ-এর কাছে এই দূর গঞ্জটা কেমন চেনা বোধহয়। গতবারও সে এসেছিল। তাই রতনবাবু তাকেও এবাব আসার কথা বলেছিল, কারণ অচেনা নাচনেওয়ালীরা এতদূর আসতে চায় না। কাজলী কেন জানে না এবারও আসতে রাজী হয়, অবশ্য নিধু

দালাল এবার বেশি পয়সাই নিয়েছে, রতনও তা দিয়েছে।

পলি কাদায় ভরা নদীর বুক, নৌকা থেমেছে নীচে, অনভ্যস্ত যারা তারা ওই হাটুভোর কাদায় আসতে গিয়ে বিপদেই পড়ে। ঢোলওয়ালা তো একটু বেশি ধ্যানেশ্বরী গিলেছে, বেচারার পা এমনিতেই টলমল, কাদায় ঢোল সমেত সে গড়িয়ে পড়ে, কে ধরে ফেলে তাকে নাহলে গাং এই পড়তো। কাজলী বাঈ কিন্তু বেশ অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই কাদা ঠেলে উঠে আসে। রতন বলে— আরে তুমি যে এখানের চলা ফেরাও শিখে গেছো।

কাজলীবাঈ বলে— বা রে, গতবার আসিনি বাবু? কতদিন থেকে গেলাম, আপনাদের জায়গাটা আমারও ভালো লেগেছে গো।

রতন খুশী হয়— তা ভালো, ওরে ফটিক, এদের বাগান বাড়িতে নে যা, থাকার ব্যবস্থা করে দে।

—চলুন, এসব কাজে ফটিক খুবই পটু।

বলে ফটিক কাজলীকে— আপনাদের সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, ওদিকে পূজার সব কাজ আমার ঘাড়ে।

কাজলী ওর কথাগুলো শুনছে মুখ বুজে, দেখেছে কাজলী রতনবাবু পূজার আয়োজনের ক্রটি রাখেনি, তবু গতবার যে হইচই ছিল তা এবারে যেন নেই।

অলক, মহেশের দলকে এবার পূজাতে ডাকেনি রতন, এ যেন তারই পূজা। তাই মহেশের দল এবার নিজেরাই ইস্কুলের ওদিকে মাঠে তাদের পাড়ায় আলাদাভাবে পূজা করছে, আর সাধারণ মানুষও ভিড় করেছে সেখানে।

রতনের পূজার মত এত আলো, মাইক, দোকানপশার সেখানে নাই, তবু মানুষ সেখানেই বেশি।

সেদিনের ওই মিছিলের ওপর লাঠি চার্জের পর থেকেই এই এলাকার মানুষদের মধ্যে একটা অলিখিত ভেদনীতি চালু হয়ে গেছে, অনেকেই এদিকেই আর অসে না।

তবু রতনের উৎসব ঠিকই হয়, মহানও এসে গেছে, চরণ ডাক্তারও হাজির, চরণ বলে— ব্যাটারা তাহলে আলাদা পূজাই করলো।

রতন বলে— মা তো সকলেরই। পূজা করার অধিকার তো সকলেরই। করুকনা পুজো, কি বলেন দারোগাবাবু?

দারোগার মনে শান্তি নাই, পাঁচটা রাইফেল হারিয়ে গেছে, তাদের পাত্তাও নাই। উপর থেকে কি হুকুম আসে কে জানে, তবু নাচের আসরে এসেছে সে, মহানবাবুকেই আড়ালে বলে— কেসটা একটু সামাল দিতে হবে মহানবাবু। হোম মিনিস্টারকে বলুন।

মহান-এর মধ্যে নেতাগিরির মজা বুঝে গেছে, সে জানে দারোগা প্রচুর কামিয়েছে,

এবার তাকে কিছু খসাতে হবে।

মহান বলে, ওর পি-একে চিনি, তবে লোকটার বদভ্যাস ওই একটাই। কিছু না খেলে কাজ করবে না, তবে যদি খায়, কাজ সে ঠিক উদ্ধার করে দেবে।

ঢোলগোবিন্দও জানে এই জগতে খাওয়াটাই বড় কথা, আর শুধু হাত মুখে যেমন ওঠে না, তেমনি এ সংসারে কিছু না খাওয়ালে কোন কাজই হবে না, কথাই দেবে মাত্র।

তাই গোবিন্দ বলে—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে মহানবাবু, হাজার পঁচিশ—মহান ভেবে নেয় কথাটা, বুঝেছে মোচড় মারলে আরও জল ঝরবে। তাই বলে—ওতে কি হবে? টাকা যায় যাক ও টাকা চাকরীতে থাকলে এক দাঁওতেই রোজকার করে নেবে, তাই বলে—আপনি কথা বলুন।

মহান বলে—বলছি, নিন, একটু মুড আনুন তো, মেয়েটা নাচে ভালোই, বেশ লচক্ আছে।

মদের আসর জমে ওঠে ওদের। গোবিন্দ দারোগা স্বপ্ন দেখছে নেশার ঘোরে কোন জলদেবী যেন জল থেকে কাঠুরিয়ার হারানো কুঠার, সোনার কুঠার, রূপোর কুঠার তুলে দেওয়ার মতই তার হাতেও ক'টা রাইফেল তুলে দিচ্ছে।

কাজলীবাঈ তখন দ্রুতলয়ে নেচে চলেছে আগুনের ফুলকির মত।

গোবিন্দবাবু বেশ মেজাজ নিয়ে ফিরছে কোয়াটারের দিকে, গাং-এর হাওয়া বেশ আমেজ আনে, মনে হয় গিয়ে শুনবে রাইফেলগুলো মালখানায় সব ঠিকঠাক এসে গেছে।

মহানবাবুও টাকা দিয়ে উপর মহলে ম্যানেজ করে ফেলেছে। ফাইলও আর পাওয়া যাচ্ছে না।

গোবিন্দ মুক্ত মন নিয়ে ফিরছে, ক'দিন থাকছে নাচওয়ালী, বাদাবনের নীরস পরিবেশে এই ক'টা রাত বেশ রঙীন হয়ে উঠবে। জিতা রহো রতনবাবু! শ্যামপুরগঞ্জই আজ যেন গোবিন্দর কাছে রোশনীভরা শহরে পরিণত হয়েছে, খাও-পিও আর মৌজ করো।

থানায় আলো জ্বলছে, দু চার জন কনেস্টবল মেলাতেও ডিউটি দিচ্ছে, না হলে জুয়োর ছকে গোলমাল বাঁধাবে ব্যাটারা। অবশ্য বেশ কয়েকটা জুয়া পার্টি বসেছে, গোবিন্দের প্রনামীও মন্দ আসবে না।

—স্যার, হঠাৎ কার ডাকে চাইল গোবিন্দ, ভালো করে চাইবার শক্তি নাই, দ্রব্যগুণে চোখ বুজে আসছে, বিরক্তিভরে বলে গোবিন্দ—কি হলো?

ডিউটি অফিসার বলে—সদর থেকে রেডিওগ্রাম এসেছে কালই আপনাকে সেখানে রিপোর্ট করতে বলেছেন।

—ঠিক আছে! দারোগা চলে যেতে গিয়ে এবার থমকে দাঁড়ায়। তার রঙ্গীন নেশা

এবার ছুটে গেছে, দারোগা ফিরে চাইল।

—কি বললে?

ডিউটি অফিসার রেডিওগ্রামটা ধরিয়ে দিয়ে বলে

—কালই হেডকোয়টারে রিপোর্ট করতে বলেছে।

কথাগুলো যেন গোবিন্দবাবুর বুকে এক একটা বুলেটের মত বেঁধে, অর্থাৎ কাল সদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে সুপার সাহেবই স্বয়ং আড়ং ধোলাই এর ব্যবস্থা করবেন।

গোলাপী নেশাই বরবাদ হয়ে যায় দারোগাবাবুর। ওই রাতেই দারোগা হন্ত দন্ত হয়ে ছুটলো মহানের ওখানে, ওই এখন ওর একমাত্র আশ্রয়। ওকেই অবলম্বন করে যদি এই বৈতরনী পার হতে পারে সে—সেই চেষ্টাই করবে।

সব অন্যায়েরই একটা সীমা আছে, তারপর প্রাকৃতিক নিয়মেই আর কিছু মানুষের শুভবুদ্ধিতেই সেই অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, এই করেই মানব সমাজের স্থায়িত্ব শত বিপদের মধ্য দিয়েও টিকে আছে।

পুলিশ সুপার মি. মজুমদার তরুণ আই পি এস। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র আর খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তিনি জানেন এই বিভাগে কিছু সৎ কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসার এখনও আছে। তার অফিসেই এমন দু দশজনকে দেখেছেন।

কিন্তু কিছু সামান্য লোভী অসৎ মানুষদের জন্য সহজেই সাধারণ মানুষ সারা পুলিশ বিভাগের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। ওই ঢোল গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধেও তিনি খবরাখবর নিয়েছেন, তার সার্ভিস রেকর্ডও দেখেছেন। শাস্তিমূলক ভাবেই তাকে ওই দূর দুর্গম বাদাতে বদলি করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানেও নিজেকে শোধরানো দূরের কথা—তার অযোগ্যতার প্রমাণই দিয়েছে।

তাই ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি।

মি. মজুমদার দেখেন মহানবাবুকেও। মহান এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বসলো। বলে—ওদিকে খুবই গোলমাল ছিল আগে স্যার।

—এখন? মি. মজুমদার শুধোন—এখন আপনার এলাকার অবস্থা কি?

এই সময়ই মি. মজুমদার গোবিন্দের স্লিপটা পান, বেয়ারাকে বলেন—ওকে আসতে বলো।

গোবিন্দ মহানকেই যে এনেছে তার উকিল হিসাবে তা বুঝেছেন মি. মজুমদার, অর্থাৎ স্থানীয় এম এল একেই এনেছে ওই গোবিন্দবাবু তার হয়ে সাফাই গাইতে, আর মি. মজুমদারও অবাক হন মহানের কথায়। মহান বলে

—এখন ওই এলাকা একেবারে শান্ত স্যার, নো প্রবলেম।

গোবিন্দবাবুকে ঢুকতে মহান বলে—আরে দারোগাবাবু যে! স্যার—ওই এলাকা উনি যাবার পর একদম পিসফুল হয়ে গেছে।

মি. মজুমদার সেই কাগজ-ছবি ফেলে দিয়ে বলেন

—তাহলে এসব মিথ্যা? উনি রতনবাবুর অনেক বেআইনী কাজকে সমর্থন করেন, তার স্বার্থে নিরীহ জনতার উপর লাঠি চার্জ করেন। বেআইনী বিদেশী মাল আসে, ওর কাস্টডি থেকে আর্মস চুরি হয় উনি তবুও একজন অনেস্ট—যোগ্য অফিসার?

দারোগা এবার বুঝেছে তাকে সহজে ছাড়বেন না সুপার সাহেব। মহান সকালেই মোটা টাকা পেয়েছে দারোগার কাছে, তাই এইভাবে এসে সুপার সাহেবের কাছে হাজির হয়েছে। মহান বলে—একটা ভুল হয়তো করেছে, কিন্তু পাবলিক সার্ভিস খুব ভালোই দেন গোবিন্দবাবু।

পুলিশ সুপার শুনছেন এই নেতার কথা, তার ক'বছরের চাকরী জীবনে তিনি এইরকম কিছু নেতাকে দেখেছেন যারা বিশেষ কারণে সব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, প্রশ্রয় দেয় মার্কামারা সমাজ বিরোধীদের যারা জনসাধারণকে চমকে, শাসিয়ে ছাপ্পা ভোট দিয়ে তাদের জেতায়। আর অন্যায়ভাবে জোর করে সর্বত্র তোলা আদায় করে ও ভাগাভাগি করে নেয়। মি: মজুমদার তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, তিনি বলেন

—গোবিন্দবাবু আপনি আজই থানার চার্জ মিঃ বোসকে বুঝিয়ে দেবেন।

মি. বোস একটি তরুণ অফিসার স্যালুট করে এগিয়ে আসে, মিঃ মজুমদার বলেন, —আজই ওই শ্যামপুর গঞ্জের থানার চার্জ টেকওভার করবেন আপনি।

—ইয়েস স্যার, মিঃ বোস স্যালুট করে। গোবিন্দবাবু ভাবতে পারেনি যে তার সব কিছু অন্যায়ের খবর এখানে পৌঁছবে আর তার জন্য ওইভাবে তিরস্কৃত হতে হবে, সে বলে

—স্যার, আমি নির্দোষ স্যার।

মিঃ মজুমদার বলেন—ইউ আর প্লেসড় আন্ডার সাসপেনসন, আপনাকে সাসপেন্ড করা হলো।

এবার মহানও বুঝেছে তাদেরও অসুবিধা হবে, ওই নতুন দারোগা যে গোবিন্দের ইস্কুলের ছাত্র নয় তা বুঝেছে মহান। রতনবাবুর অবস্থাও খারাপই হবে, তারও ভোটে জেতা মুস্কিল হবে, তাই নিজের স্বার্থেই বলে ওঠে মহান।

—কাজটা কি ঠিক করলেন স্যার?

মিঃ মজুমদার চমকে ওঠেন ওর কথায়, মহান বলে—একজন সুযোগ্য অফিসারকে সামান্য ভুলের জন্য অন্যায়ভাবে শাস্তি দিলেন, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি এর প্রতিবাদ করছি, দরকার হলে এ নিয়ে এসেম্বলীতেও কোশ্চেন তুলবো।

এবার মিঃ মজুমদার স্থির কণ্ঠে বলেন—

—মিঃ এম এল এ আপনি আপনার অধিকারের সীমা পার হয়ে যাচ্ছেন। এসেম্বলীতে কি হয় জানি না, সেখানে আপনাদের ক্ষমতা কি তাও জানার দরকার আমার নেই।

আমি জানি আমাকে কি করতে হবে, তাই করেছি। আর বলছি আপনাদের মত অযোগ্য-অসাধু কিছু নেতা আর এর মত কিছু অসৎ অযোগ্য পুলিশ কর্মচারীর জন্যই আজ সারা পুলিশ বিভাগের উপর জনসাধারণের মন বিষিয়ে যাচ্ছে।

মহানের আত্মসম্মানে লাগে, সে বলে ওঠে—কি বলছেন আপনি?

—আপনি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আর শেষবারের মত বলছি আমার ডিউটিতে আপনি বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না, এটা পুলিশ হেডকোয়াটার, কর্তব্যে বাধা দেবার অপরাধে আপনাকে এ্যারেস্ট করার অধিকার আমার আছে।

মহানও বুঝেছে এখানে তার নেতাগিরির হম্বিতম্বি চলবে না, তাই বলে—ঠিক আছে।

বের হয়ে যায় সে একাই গোবিন্দ দারোগাকে এই তোপের মুখে ফেলে। গোবিন্দ বুঝেছে তার শ্যামপুরগঞ্জের দিন শেষ হয়ে গেলো।

... রতনবাবুও সব শুনেছে, খবরটা তার কাছে আনে নন্দ সরকারই। সে থানায় গিয়ে দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে এসেছে, দেখেছে বৈকালের লঞ্চেই ওই গোবিন্দ দারোগা মালপত্র নিয়ে চলে গেল। রতনও অবাক হয়—সেকি! ব্যাটা জালা পেটা চলে গেল এখান থেকে? এক কথায় বদলি হয়ে গেল, মহান সেই শ্যালা ন্যাতা কোথায়?

মহান সেই যে গেছে, কাল আর ফেরেনি।

চরণ ডাক্তারও বানের আগে খড়কুটোর মত ভেসে এসেছে রতনের গদিতে। সেও দারোগাকে চলে যেতে দেখেছে। গোবিন্দবাবুই বলেছে তাকে—অফিস আমাকে ছাড়বে না ডাক্তারবাবু, রতনবাবুকে বাঁচাতে গে আমিই শেষ হলাম, এবার রতনবাবুকে সাবধান হতে বলবেন।

রতন কথাটা শুনে একটু ভাবনায় পড়ে, রতন বলে—মহান বলে মন্ত্রীদের সঙ্গে ওর ওঠা বসা, তা এই দারোগাকে রাখতে পারলে না এখানে? নতুন দারোগা কেমন হবে কে জানে?

চরণ বলে—মহানই এসব করিয়েছে কি না দেখুন, মিছিলে ওইভাবে ওদের তাতালে আপনার বিরুদ্ধে, তারপরই ফাঁসিয়ে দিল, বুঝলেন নিজে এবার এখানের

পাবলিকের কাছে ভোট পাবার জন্যই এসব করেছে।

রতনবাবুও ভাবছে কথাটা, বলে—সে এল না কেন?

চরণ বলে—না আসুক, সে যা সর্বনাশ করার করেছে, তবে আমরা তো আছি। কিন্তু নিজের দুঃখ হয় কেন জানেন! খাল কেটে ওই কুমীরকে আমিই এনেছিলাম। কথায় বলে—যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা, ছিঃ ছিঃ! আপনার কাছে আমার মাথা নুইয়ে দিল।

রতন ভাবছে মহানকে এবার ভরসা করা যাবে কিনা? সে থাকলে তবু তাকে নিয়ে নতুন দারোগার কাছে যেতো। এখন ও অবশ্য সে অঞ্চল প্রধানের গদি দখল করে আছে, সেই সুযোগেই একদিন আলাপ করে আসতে হবে, আর দেখেও আসবে নতুন দরোগাকে, কেমন সুরে বাজে সেটাও দেখতে হবে।

অলক, মহেশের দলও এবার বসে নেই। তারাও জেনেছে যে ওই খবরের কাগজে খবর ছবি সব বের হবার পর অবস্থাটা বদলে গেছে। রতনও চুপচাপ রয়েছে। এসব কেদারবাবুর জন্যই হয়েছে, আর একটা কথাও বলেছিলেন কেদারবাবু, রতনের জমি দখল করে ভেড়ি করা নিয়ে কাগজেও খবর বের হয়। আর অলকরা সারা অঞ্চলে গরীব চাষীদের দিয়ে এ বিষয়ে একটা গণ দরখাস্ত করে বহুলোকের সই, ছিপছাপ সংগ্রহ করে সদরে পাঠিয়েছে, তাতে আবেদন করা হয়েছে ওদের জমি ভেড়ি মালিকের কবল থেকে ফেরৎ দিতে হবে। নাহলে তাদের আন্দোলন থামবে না, এটা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে সদরে, আর অলকরাও বুঝেছে একটা জোর আন্দোলন করার এই সময় এসেছে।

মহেশও বলে—আমরা ওই ভেড়ির বাঁধ কেটে নিজেদের জমি দখল করবো।

নিতাই বলে—সেবার মিছিল করে মার খেয়েছি, আবার?

অলক বলে—সেই দারোগাকে ওইভাবে অন্যায় করার জন্যই শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এবার ভেড়ি দখল করি না করি একবার মিছিল করে যাবোই ওদিকে, শান্তিপূর্ণ মিছিল করার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই আছে।

কথাটা অনেকের মনে ধরে, এতে আর কিছু না হোক রতনবাবুর উপর একটা চাপ দেওয়া হবে, ওদিকে সরকারী বিভাগেও এ নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত হবেই।

সাধারণ মানুষ সেদিন ওইভাবে নিগৃহীত হয়ে রতনের উপর উত্তেজিত হয়েই ছিল, তাই এবার তারাও মনে মনে তৈরী হয়, মিটিং মিছিল তাদের থামবে না, তারা এসব চালিয়েই যাবে, তারই প্রস্তুতি শুরু হয়।

রাজাও খবর পায় সবকিছুই, এখানের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে, এদের গঙ্গা পূজোয় সেও সারা অঞ্চলের মানুষকে দুদিন ধরে খাওয়াবার টাকা দিয়েছে।

রতনও অবাক হয়, তার পূজোতে গান—যাত্রা সবই হয়েছে, মেলাও বসেছে, কিন্তু মানুষ আসে আর যায়। আর দেখেছে মহেশদের ওখানে বিরাট অন্নসত্র চলেছে। লোকজনের ভিড়, ফটিক, মন্টারাও গেছে সেখানে। রাতের বেলায় দেখে রাজাও এসেছে, ওরা আর এগিয়ে যায়নি।

সেই রাতে শিরীষ গাছে তাদের বেঁধে রেখেছিল মাত্র, এবার ধরা পড়লে ডালে ঝুলিয়ে দেবে, তারা দূর থেকেই রাজাকে দেখে মহেশদের সঙ্গে। আর তাই দেখে ছুটে আসে রতনবাবুর কাছে।

কাজলীবাঈও দেখেছে এবার গঞ্জের অবস্থা, সেবারের পূজোর প্যান্ডেলে তার নাচের আসরে যা ভিড় জমেছিল এবার তেমন ভিড় হয়নি।

পরদিন গঞ্জে বের হয়েছিল কাজলী, দেখেছে এবার একটা নয় আর একটা পূজোও হচ্ছে, আর সাধারণের ভিড় সেখানেই। বহু বুভুক্ষু মানুষ সেখানে খেতে পাচ্ছে, ওদের মুখেই শোনে,

—এসব হচ্ছে রাজার জন্যই। গরীবের মা বাপ রে ছেলেটা। আর তাকে কি না রতনবাবু গঞ্জ ছাড়া করলে।

একজন বলে—দেখবে রাজাই ওই রতনবাবুকে গঞ্জ ছাড়া না করে!

তারা সকলেই তাই চায়, চায় তাদের রাজা ফিরে আসুক। তাদের উপকার হবে।

কাজলি কথাগুলো শোনে মাত্র। বেশ বুঝেছে সে রাজাকে এরা সকলেই ভালোবাসে, এদের চোখে রতনবাবু একটা লোভী শিয়াল মাত্র।

রতনবাবু অবশ্য পরদিনই গেছে থানায়। তার অভ্যাসমত বেশ বড় সাইজের একটা ভেটকি— আর শহর থেকে আনানো ফল, দামী আনাজপত্র আর বসিরহাটের উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা এক হাড়ি সাজিয়ে গেছে থানায়।

মিঃ বোস থানাতে এসে দেখেন কেস রেকর্ড বলেও তেমন কিছুই নেই। অর্থাৎ এখানে কোনরকম অশান্তি ঘটেনি, কোন অপরাধই হয়নি, গোবিন্দবাবু সব বেমালুম চেপে গিয়ে এলাকায় যে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান তাই প্রমাণ করেছে।

আর মিঃ বোস দেখেন কনেস্টবলরাও এখানে বেশ তবিয়তেই আছে, মাছ আসে আড়ত থেকে, হাট থেকে তরকারী আনাজপত্র এমনিই দিয়ে যায় ফটিকের দল।

আর সন্ধ্যার পর ভেড়ির ওদিকে হাটতলার মাঠে সার সার টেমি জ্বেলে মদের দোকানী, তাড়ির দোকানীরা বসে। তেলেভাজার দোকান, চাটও বিক্রি হয় সঙ্গে

মদ, তাড়ি সবই।

মিঃ বোসকে এরা চেনে না, তিনি সাধারণ পোষাকে সারা গঞ্জ নিজে ঘুরে দেখেন মাত্র, রতনবাবুর বাড়ি, ওদিকে সার বন্দী গুদামের শেডও দেখেন।

রাস্তার লোকই তাকে এখানে নতুন দেখে বলে—এসব রতনবাবুর।

ভেড়িটাও দেখেন মিঃ বোস, বিস্তীর্ণ জলাধার, দিগন্ত প্রসারী জলের বিস্তার, কয়েকশো বিঘের ভেড়ি, মিঃ বোস এ নিয়ে গোলমালের কথাও জানেন।

এবার তাকে তার কর্মপন্থা নিতে হবে, থানায় বসে কাজ করছেন মিঃ বোস, হঠাৎ বিদেশী সেন্টের গন্ধে ভরে ওঠে চারিদিক, চাইলেন তিনি।

দ্যাখেন একটি যৌবন অতিক্রান্ত বয়স্ক শক্তসমর্থ লোক ঢুকছে, পরণে দামী ধুতি পাঞ্জাবী, হীরের বোতাম বসানো তাতে, হাতে ঝকঝকে বেশ কয়েকটা দামী পাথর বসানো আংটি। বেশ সৌখিন ভদ্রলোকই, দামী বিদেশী সেন্ট ব্যবহারও করে, পায়ে চকচকে জুতো, যা এখানের সাধারণের পায়ে কোনদিন ওঠে না।

পিছনে দুজন লোক ওই মাছ, ঝুড়িতে নধর সাইজের দামী বাগদা, সন্দেশের হাড়ি, ঝুড়িতে ফল আনাজপত্র নিয়ে শোভাযাত্রা করে ঢুকছে।

ভদ্রলোক তার লোকদের বলে—নামা ওসব।

তারা নামাতে দেখেন মিঃ বোস। ওই দামী, এখানে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসম্ভার, ভদ্রলোক বিনীত নমস্কার করে বলে—আমি রতন নস্কর, এখানে পঞ্চায়েত প্রধান, হুজুর এলেন আমাদের এখানে তাই আলাপ করতে এলাম।

মিঃ বোস বলে—বসুন, বসুন।

বসে রতন, ওর বিনম্র কণ্ঠস্বরে যেন কিছু আশ্বাস পায় রতনবাবু। মিঃ বোস বলেন, —তা আলাপ করতে এলে কি ওইসব আনতে হয়?

রতনবাবু বলে—বাদাবন, কিছুই তো এখানে মেলেনা স্যার।

তবে আমার ভেড়ির মাছ, আর কিছু ক্ষেতের আনাজপত্র

মিঃ বোস বলেন ওই মিষ্টির হাড়ি দেখিয়ে বলে।

—ওটাও কি ক্ষেতে হয় নাকি? দেখছি বসিরহাটের কোনও দোকানের লেবেল মারা।

রতন বলে—কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন, প্রথম এলেন—

মিঃ বোস দেখছেন ভদ্রলোককে, তার নজরে ওর বাইরেটা নয়, ভিতরটাই ধরা পড়েছে, লোকটার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে অনেক খবরই সে সংগ্রহ করেছে, আজ তাকে এভাবে আসতে দেখে বুঝে গিয়েছে যা শুনেছে সত্যিই। ওই গোবিন্দবাবুকেও লোকটা এইভাবেই বশীভূত করেছিল, আজ এসেছে তার কাছে।

রতন দেখছে নতুন দারোগাবাবুকে, বয়স বেশী নয়। একে দলে টানতেই হবে, বোধহয় পথে এসেছে, একটু ভেবেই বোধহয় রাজী হবে টোপ গিলতে।

মিঃ বোস বলেন—রতনবাবু আপনার বাড়ি গেলে মিষ্টিমুখ করাবেন, থানায় তো এসব হয় না।

রতন খুশীই হয়, অর্থাৎ টোপ গিলেছে, তাই বাড়িতে গিয়ে দরাদরি করতে চায়, তাই বলে।

—গরীবের কুটিরে পায়ের ধুলো পড়লে ধন্য হবো স্যার। আসুন বাগানবাড়িতে। মন্ত্রীরা, নেতারাও এদিকে এসে ওখানেই ওঠেন।

মিঃ বোস বলে— তাই যাবো, এখন এসব উঠিয়ে নিয়ে যান।

—মানে? রতন একটু ঘাবড়ে যায়।

মিঃ বোস বলেন—মানেটা বুঝলেন না? এসব নিতে পারবো না।

এত সুখাদ্য খাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। আপনি এখন আসুন, নমস্কার।

কথাগুলো বলে নিজেই মিঃ বোস উঠে চলে গেলেন। যেন নীরব অবহেলায় এসব প্রত্যাখানই করে গেলেন।

রতনবাবু চাইল সরসীবাবুর দিকে, সরসীবাবু পুরোনো লোক, রতনবাবুর বশংবদই, সারা থানাই তার বশংবদ হতে বাধ্য হয়েছিল গোবিন্দবাবুর আমলে। রতনও প্রায় আসতো, খোসগল্প হতো, আজ সেই পরিবেশই বদলে গেছে, সরসীবাবু বলে।

—একে ঠিক এখনও চিনতে পারিনি রতনবাবু, তবে কাজে খুব কড়া। আপনি এখন আসুন। হ্যাঁ— ওসব উঠিয়ে নিয়ে যান, ভাবগতিক সুবিধার বুঝছি না।

বতনও সেটা বুঝেছে। আর কিছু ভাবনাও বেড়েছে তার।

মহেশরাও শুনেছে খবরটা। থানার খবর এখানে হাওয়ায় ওড়ে। অলক বলে —ওই নতুন দারোগা বেশ কড়া লোক।

মহেশ বলে— রতনবাবু ওখানে খাপ খুলতে পারেনি। সব ভেটপত্র ফেরৎ নিয়ে আসতে হয়েছে।

কেদারবাবুর কাছে এসেছে ওরা, ওই লোকটা তাদের বুদ্ধি যোগায়, আর রাজাও তাদের যুগিয়েছে অর্থ, সাহস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজার এই সর্বত্যাগী প্রতিবাদ এখানের নিপীড়িত মানুষকে উৎসাহিত করেছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কেদারবাবু সব শুনেছেন, পুরোনো দারোগাকে বদলি করেছে নয় শাস্তিও দিয়েছে শোনেন। আর নতুন দারোগাকে দেখেননি তিনি। কিন্তু এর মধ্যেই তার সম্বন্ধে যা শুনেছে তাতে তার আশা হয়েছে যে অন্যায়ের প্রতিকার হবেই।

রাজার ওপর যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিকার হলে তিনিও খুশিই হবেন।

অলক বলে— ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন পরিচয় করতে যাবো।

কিন্তু ভয় হয় গেলে আবার উল্টো কিছু না ভাবেন।

মহেশ বলে— সে পরে হবে, তাহলে কালই মিছিলটা করা যাক, রতনবাবু চুপসে গেছে, এসময় আমাদের দাবী নিয়ে মিছিল করার দরকার।

কেদারবাবু বলেন— করছো করো, তবে সাবধানে যাবে, মিছিল যেন শান্তিপূর্ণ হয়।

ওরাও বলে— তাই হবে দেখবেন।

খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর ঠিক চরণের কানেও পৌঁছে যায় খবরটা, খবরটা এরা বাইরে প্রচার করেনি।

কিন্তু চরণের কানে ঠিক উঠে যায়, এখন মহান নাই, সে একটু বিপদ বুঝেই এখন গা ঢাকা দিয়ে আছে, তাই চরণ ডাক্তারই এখন রতনের কাছের লোক।

চরণই ছুটে যায় রতনবাবুর কাছে।

—শুনেছেন খবরটা?

রতন চাইল, ওর সামনে এখন অনেক ভাবনা। রাতের কারবারের অনেক মাল, মায় অস্ত্রশস্ত্র ও গুদামে পেটি বন্দী পড়ে আছে, সেগুলো পাচার করা দরকার, কিন্তু এই দারোগা রাতে গঞ্জের গাং-এ মটর ফিট করা বোট নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। ভাবনায় পড়েছে সে। আবার চরণকে ভগ্নদূতের মত এসে পড়তে দেখে বলে— আবার কি হলো হে ডাক্তার?

চরণ চায় মারপিট বাধুক, সেবার মারপিটে সে কয়েক হাজার টাকা ঘরে তুলেছিল, এবার বাধলে তারই আমদানী হবে। তাই বলে— ওই ব্যাটারা আবার নাকি মিছিল করে গিয়ে ভেড়ির বাঁধ কেটে ভেড়ি লুট করে তাদের জমির দখল নেবে। সব পাকাপাকি ব্যবস্থাই করে ফেলেছে ওই মহেশের দল, খবরটা শুনে চমকে ওঠে রতনবাবু, গর্জায়।

—সেকি! এত বড় হিম্মৎ! সেবারে মার খেয়েও সিধে হয়নি ব্যাটারা?

চরণ ব্যাপারটা আরও ঘোরালো করার জন্যই বলে— এসবের পিছনে এবার রয়েছে রাজা নিজে, তার লোকজনদেরও পাঠাবে, নিজেও আসতে পারে।

কাজলীবাঈ শুনেছিল কথাগুলো ওঘর থেকে।

রতন গর্জে ওঠে— রাজা, রাজা আর রাজা। ওই একটা ছেলেই আমার সবকিছু তিলে তিলে শেষ করে দেবে। ওকে এবার আমিই জবাব দেব। মুখের মত জবাব! ওই ব্যাটাদেরও চরণ উসকে দেবার জন্য বলে—ফৌজদারী করবেন? মানে ওই দারোগা তো শুনি বেয়াড়া ধরনের মানুষ।

রতন বলে— ও আছে থাক। আমার সীমানায় এলে আমি ওদের ছাড়বো না। তারপর থানা পুলিশ, ফৌজদারী যা হয় দেখা যাবে।

ফটিক, মণ্টা— আরও লোকজন নে আয়। ওদের রুখতেই হবে, রতন নস্কর এখনও মরেনি।

ফটিকও তাই চায়। গোলমাল বাধলেই তাদের লাভ। তাই ফটিক বলে— ওর জন্য ভাববেন না রতনদা। এবার জান লড়িয়ে দোব। রাজাকে পেলে আর

তাকে ফিরে যেতে দোব না।

ওঘর থেকে কথাগুলো শুনছে কাজলীবাঈ। এসব হাঙ্গামার কথা শুনে সেও ভয় পায়, কিন্তু তার করার কিছুই নাই। ওদের যুদ্ধের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায়। রতনবাবুকে এ লড়াই জিততেই হবে।

ওদিকে অলক মহেশের দল মিছিল নিয়ে চলেছে থানার দিকে। নতুন অফিসারকে তারা এই ভেড়ির জমির ব্যাপারে আবেদন জানাবে, স্মারকলিপি দেবে। সেই স্মারকলিপিতে বহু চাষী, সাধারণ মানুষ যাদের জমি গেছে তারা সই করেছে।

মিছিলেও এসেছে তারা, আরও অনেকেই যোগ দিয়েছে, মেয়েরাও শামিল হয়েচে, গোলাবীও একটা পোস্টার হাতে গাছ কোমর করে এদের দলে শামিল হয়েছে।

গঞ্জের প্রধান পথ একটাই, হাটতলা থেকে সেটা বসতির মধ্যে দিয়ে ওদিকে থানার দিকে গেছে, ওই পথের ধারেই রতনবাবুর বাগানের শুরু। অবশ্য বাগানের জায়গা অনেক, এখান থেকে নদীর ধার অবধি বিস্তৃত এই বাগান।

আর এপাশে কিছু দূরে রতনবাবুর বাড়ি, গদিঘর পিছনে গুদামগুলো অবস্থিত নদীর ধারে। বিরাট এলাকা এদিকেও তার দখলে, মিছিল চলেছে।

আজকের মিছিলের কথা রাজা জানতো, সেও ভুক্তভোগী। তার সব জমিও গেছে ওই ভেড়ির মধ্যে, তার বাবা মথুর ওই জমি দেয়নি, তাই তাকে মরতে হয়েছিল।

মাও দিতে চায়নি, তাই রতন তাকেও শেষ করেছে। বোনটাকেও বোধ শেষ করে দিয়েছে, তারও পাত্তা আর মেলেনি। আর সেই সব জমি রতনবাবু দখল করে ভেড়ি করেছে, তাই রাজা বলে—আমিও যাবো মিছিলে।

রাজা এখন বনের সীমান্তে মাছের খুঁটি করেছে, ওই এলাকার জেলেরা সব মাছ ওকেই দেয়। নিজেও দলবল নিয়ে মাছ ধরে। তবে মৌকা পেলেই শুধু রতনের নৌকায়, তার চোরাচালানের বোটে হানা দেয়।

এছাড়া আর কোন নৌকাতে সে হানা দেয় না, বরং ওই জলপথকে সেই বিপদমুক্ত করে রেখেছে সকলের জন্য।

রাজাকে ওই মিছিলের কথা বলতে দেখে নগা বলে

—আবার তুই যাবি?

রাজা বলে—আমারও তো সর্বস্ব গেছে, ওরা মিছিল করছে আমি কেন যাবো না?

নগা বলে—ওদের কথা আলাদা। রতন তোকে দেখলে একটা কিছু করার চেষ্টা করবে।

—করুক। তার জবাব দেব। রাজা বলে

নগা শোনায়—আর বিপদে পড়বে ওই মানুষগুলো, তাদের বিপদে ফেলতে চাস?

রাজা চুপ করে যায়। কথাটা মিথ্যা নয়, রতন তার জন্যই ওদের উপর চড়াও হবে, একটা অকারণ সংঘাতে সে যেতে চায় না, তাই চুপ করে যায়।

নগা বলে—আমাদের লোকজন দলে থাকবে, তুই যাস না এখন।

রাজা তাই আসেনি, কিন্তু কিছু ছেলেদেরও পাঠিয়েছে, এবার রতন অক্রমণ করলে আর মুখ বুজে মার খাবে না, তারাও রতনের লোকদের উপরই আক্রমণ করবে।

মিছিল চলেছে, রতন আজ মতলব ঠিক করে রেখেছে, পুলিশের সাহায্য এবার পায়নি, সেই দারোগা আর নেই, তবু রতন ফটিক, মণ্টাদের তৈরী রেখেছে, তারা আরও ভাড়াটে লোক এনেছে।

বাগানের বাড়ির ছাদ থেকে কাজলীবাঈ দেখছে ওই মিছিলকে, তার দুচোখ কাকে খুঁজছে, কিন্তু দেখতে পায় না। কয়েকশো মানুষের মিছিল চলেছে, হঠাৎ রতনের ইঙ্গিতে ফটিকের দল একটা খড়গাদায় আগুন লাগিয়ে দেয়, ধূ ধূ আগুন জ্বলছে, বিভ্রান্ত জনতা আর তাদের উপর এবার ফটিকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি নিয়ে।

প্রথমে ওই মিছিলের মানুষ ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, রতনবাবুও চায় ওদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে, যাতে থানায় গিয়ে তার নামে অভিযোগ জানাতে না পারে এরা।

কিন্তু এবার মিছিলের সামনে রয়েছে মহেশরা ছাড়াও রাজার কিছু সাকরেদ, তারাও তৈরী ছিল, ফলে ফটিকের দলকে তারাই ঘিরে ফেলে এবার তারাও ঝাণ্ডাকে ডাণ্ডায় পরিণত করে বাধাই দেয়।

শুধু বাধাই নয়, তারাও এসব কাজে বেশ পটু, ফলে ফটিক, মণ্টাদেরই তারা বেশ দুচার ঘা বসিয়ে দেয়, ফটিক ছিটকে পড়েছে কার লাঠির ঘায়ে, বুলেটও মাথায় চোট পেয়ে পালায় গুদামের ওদিকে।

রতনবাবু এবার বেগতিক বুঝেছে, জনতার উপর প্রথমে সেই চড়াও হয়েছিল। এবার জনতাও সেটা বুঝেছে আর রতন তার বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত হতে দেখে ভয় পেয়েছে, জনতা এবার তার বাড়িই না চড়াও হয়।

তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবার ফেটে পড়বে তার উপরই। রতন বন্দুক বের করে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করে শূন্যে। জনতা তাতেই গর্জে ওঠে—গুলি করবে? চালাক গুলি—এগিয়ে চল, জনতা চীৎকার করে ওঠে।

এমন সময় কার কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে চাইল ওরা। দেখে বাঁধের উপর এসে দাঁড়িয়েছে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা বলিষ্ঠ একটি তরুণ, সঙ্গে কয়েকজন রাইফেলধারী পুলিশ।

নতুন থানা অফিসার মিঃ বোস ব্যাপারটা সবই দেখেছেন, তার কাছে মিছিলের খবর ছিল, কথা ছিল শোভাযাত্রা করে থানায় এসে স্মারকলিপি দেবে ওই ভেড়ির জমির ব্যাপারে।

সেইমত তিনিও থানাতেও ছিলেন, দেখেছেন ওই মিছিলকে আসতে, নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ

মিছিলই। হঠাৎ রতনবাবুর খামারে একটা ঘড়ের গাদায় আগুন দিয়েছে রতনবাবুর লোকরাই। আগুন জ্বলে উঠতে বিভ্রান্ত জনতার উপর তারাই আক্রমণ করে, তারপর জনতা প্রতিরোধ করেছে। এবার রতনবাবুকে গুলি চালাতে দেখে মিঃ বোস এগিয়ে আসেন, তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়—থামো, নাহলে লাঠি চার্জ করবে পুলিশ, থেমে যাও—

অলক মহেশের দল দেখছে নতুন দারোগাকে, রতন এই অবসরে দৌড়ে গিয়ে মিঃ বোসের সামনে হাজির হয়ে বলে

—রক্ষা করুন স্যার! ওরা দলবেঁধে দিন দুপুরে আমার বাড়ি এ্যাটাক করতে চায় স্যার! গোলায় আগুন দিয়েছে, আমার লোকদের মেরেছে স্যার দেখুন—

মিঃ বোস শুনছেন লোকটা মিথ্যা সাজানো কথাগুলো অনর্গল বলে চলেছে, অলক, মহেশরা বলে

—আমরা শোভাযাত্রা নিয়ে থানায় যাচ্ছিলাম, ওর লোকজনই হামলা করলো, খড়গাদায় আগুন দিয়েছে ওর লোকই, আমাদের কেউ আগুন দিলে ওর বড় গাদাতেই আগুন দিত, বাইরে রাস্তায় খড় সাজিয়ে আগুনের নাটক করছেন উনিই।

রতন গর্জে ওঠে—খবরদার, গুলি করে মুখ বন্ধ করে দোব—রতনবাবুর এতদিনের সেই রাজাগিরির মেজাজ ফুটে ওঠে ওর গর্জনে, বন্দুকই তুলেছে সে।

মিঃ বোস ধমকে ওঠেন—রতনবাবু! আমি সব দেখেছি প্রথম থেকেই। কি সত্য আর কি মিথ্যা তা আপনাদের বলতে হবে না।

রতন বলে, তাহলে বিচার করুন স্যার, ওই ডাকাতগুলো দিনে ডাকাতি করতে এসেছিল, প্রাণে মারতো আমাকে।

মিঃ বোস বলেন—প্রাণে তো আপনিই মারতে গেছলেন ওদের রতনবাবু?

—মানে! কি বলছেন স্যার? রতন কাতর কণ্ঠে কি বলতে যায়, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন মিঃ বোস,

—আপনার ওই লোকরাই খড়গাদায় আগুন দিয়ে ওদের উপর প্রথম আক্রমণ করে, আর তাদের পিছনে আপনি এসেছেন গুলি করেছেন, আমার সামনে ওদের দিকে বন্দুক তাক করেছেন—

জনতা আজ পুলিশের এই ভূমিকা দেখে খুশীতে ফেটে পড়ে, তারা বলে—এই কাজ এতকাল ধরে উনি করেছেন স্যার, কত লোককে শেষ করেছেন তার হিসাবও দেব।

মিঃ বোস বলেন—রতনবাবু, আপনার লোকদের থানায় যেতে হবে আপনাকেও, আর যে মানুষ তুচ্ছ কারণে জনতার দিকে গুলি চালায়, এতটুকু মতবিরোধই বন্দুক তাক্ করে তাকে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হবে কি না সেটা ভেবে দেখতে হবে, ততদিন এ বন্দুক আপনাকে থানায় সারেন্ডার করতে হবে।

আর এদের অভিযোগের কপি সদর থেকে আমার কাছে এসেছে। সেইমত ওদের

জমির সব দলিল যার বলে আপনি ওদের জায়গা দখল করে রেখেছেন সবও দেখাতে হবে।

একটার পর একটা বুলেটই যেন ছুঁড়ছে ওই দারোগা রতনের দিকে, এভাবে বিপর্যস্ত হবে ভাবেনি রতন, বন্দুকও জমা দিতে হবে, অবশ্য বন্দুকের অভাব রতনের নাই, কিন্তু লাইসেন্সও জমা দিতে হবে, এ চরম অপমানই।

তার চেয়েও সর্বনাশের কথা ওই সব জমির অধিকাংশেরই কোন দলিল তার নাই, মিথ্যে ঋণের দায়ে জবর দখল করেছে, কারো জমি এমনিই কেড়ে নিয়েছে, এবার সেসব জমি চলে গেলে ভেড়িও বন্ধ হয়ে যাবে। লাখ লাখ টাকার আমদানীও বন্ধ হয়ে যাবে।

রতন বলে—এসব অন্যায় স্যার, জমির দখল আমার—

মিঃ বোস বলেন—থানায় চলুন, সেখানে কথা হবে।

অলক, মহেশরা বলে—ওর জুলুম অত্যাচার এতদিন মুখবুজে সহ্য করেছি স্যার। আগেকার দারোগাও এসবের কোনও বিচার করেননি। ওই রতনবাবু যা ইচ্ছা তাই করেছেন স্যার।

মিঃ বোস বলেন—আপনারা শান্ত হয়ে ফিরে যান, এবার বিচার ঠিকই হবে।

সহকারীদের বলেন মিঃ বোস রতনবাবুদের দেখিয়ে—এদের থানায় নিয়ে যান।

রতনবাবু জীবনে এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি, সারা গঞ্জের মানুষের সামনে আজ পুলিশ তার কথা শোনেনি, উল্‌টে তাকেই থানায় নিয়ে যেতে চায়। মহানও নাই, চরণ ডাক্তারও কাছেই ছিল, বেগতিক দেখে চরণও কখন সরে গেছে বুঝতে পারেনি রতন।

সেকেন্ড অফিসার বলেন—চলুন রতনবাবু, তখনই বলেছিলাম দিন বদলেছে, তখন শুনলেন না। গোলাবী বলে—শ্বশুর বাড়ি যান গো রতনবাবু।

রতন চাইল ওর দিকে, ওদের নিয়ে চলে যায় সেকেন্ড অফিসার।

মিঃ বোস তখন মহেশদের কাছে শুনছে ওদের অভিযোগের কথা, পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে কি কি অপকর্ম করে চলেছেন রতনবাবু সে সব কথা আজ ভুক্তভোগীদের অনেকেই বলে।

কেদারবাবু শুনেছেন আবার মিছিলের উপর হামলার কথা, কিন্তু এবার ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায়নি, নতুন পুলিশ অফিসার এসে পড়ে থামিয়েছেন।

কেদারবাবু বের হচ্ছেন, শিখা ক'দিন বাড়িতে নেই, কলকাতায় গেছে। কমলাদেবীই বলে—গোলমালে আবার বের হবে?

একটা ছেলে খবর এনেছিল সেই বলে —গোলমাল কিছু নাই মাস্টারমশায়, পুলিশের দারোগা এসে রতনবাবুদেরই থানায় নে যাচ্ছে।

—সেকি! কেদারবাবুও অবাক হন, তাই বলে—একটু আসছি।

কেদারবাবু এসে পড়েন, তখনও মিঃ বোস এদের সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ কেদারবাবুকে ঢুকতে দেখে মিঃ বোস চাইলেন। কেদারবাবুকে দেখে লোকজন পথ দেয়। কেদারবাবু বলে

—অলক, জখম টখম কেউ হয়নি তো? শুনলাম আবার কি গোলমাল হয়েছে?

—স্যার, আপনি! মিঃ বোস কেদারবাবুর দিকে এগিয়ে আসেন, এসে প্রণাম করেন কেদারবাবুকে, শুধোন—আপনি এখানে?

কেদারবাবুর বয়স হয়েছে, চোখের নজরও কমে আসছে, তাই ওই ইউনিফর্ম পরা তরুনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—আপনি! ঠিক চিনলাম না তো?

মিঃ বোস টুপিটা খুলে বলেন—স্যার আমি বসন্ত। সোনারপুর স্কুলের বসন্ত বোস, হাবলু!

কেদারবাবুর মুখটা খুশীতে ভরে ওঠে, মনে পড়ে এখানে আসার আগে প্রায় দশবছর তিনি সোনারপুর স্কুলে টিচার ছিলেন। সেখানের কত কিশোর মুখ তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে, কেদারবাবু মিঃ বোসকে বুকে জড়িয়ে ধরেন—হাবলু! তুই! তুই তাহলে এখানেই এসেছিস, জানতাম একদিন ঠিক বড় হবি তুই।

—আপনি এখানে?

মিঃ বোসের প্রশ্নে কেদারবাবু বলেন—এখানের স্কুলেই ছিলাম এতদিন, রিটায়ার করে এখানেই রয়ে গেছি বাবা, ওই বাঁধের ওপাশে ছোট একটা আস্তানাও করেছি।

মিঃ বোস বলেন—একদিন যাবো স্যার, আজ থানায় জরুরী কাজ আছে।

কেদারবাবু বলেন—একদিন এসো হাবু, কথাবার্তা হবে।

—নিশ্চয়ই যাবো স্যার, এখানে আপনাকে পেয়ে আমিও ভরসা পেয়েছি স্যার।

চলে যান মিঃ বোস। এবার গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষও খুশী হয়। এতদিন ধরে তারা অন্যায় অবিচারের শিকারই হয়েছে, মনে হয় এবার তাদের কিছু সুরাহা হবে।

অনেকেই বলে—মাস্টারমশাই জমিগুলান ফেরৎ পাবো এবার?

কেদারবাবু বলেন—দ্যাখো কি হয়।

মহেশ বলে—দারোগা তো আপনার ছাত্র।

কেদারবাবুর মনে পড়ে আর একজন ছাত্রের কথা, সে রাজা! রাজাও হাবলুর মতই তেজস্বী, সাহসী, সৎ ছেলে, কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর রসিকতায় সে আজ সমাজেও ঠাঁই পায়নি, ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে বিনাদোষে, তার কি কোন সুরাহা হবে না?

কেদারবাবুর মনে বারবার এই প্রশ্নই জাগে, সেই দরদী বঞ্চিত রাজাকে তিনি ভুলতে পারেন না, রতনের বিরুদ্ধে তার জেহাদ নয়, তার জেহাদ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, রতন নস্কর তার প্রতীক মাত্র।

আর রাজাই আজ সারা আবাদের মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার এনেছে, এদের

মুখে অন্ন যুগিয়েছে, বাঁচার পথ দেখিয়ে নিজে আজও বঞ্চিতই রয়ে গেল।

রতনবাবু থানায় আজ এসেছে অপরাধীর ভূমিকা নিয়ে, এতদিন থানার লোকজন তাকে মান সম্মান দিত। সমীহ্ করে কথা বলতো, চেয়ার এগিয়ে দিত। আজ ওকে এনে বাইরের বারান্দার একটা বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছে। আশপাশে নানা ধরনের মানুষ, ফটিকদেরও রেখেছে এখানেই। থানার ওই লোকগুলোও আজ ওকে চেনে না। এইভাবে অপমানিত আগে হয়নি রতন।

মিঃ বোস এবার তার ঘরে ডেকে পাঠান রতনবাবুকে, এর আগে তার বন্দুকও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, ফটিকদের হাজতে পুরে রেখে এবার মি: বোস রতনকে নিয়ে পড়েন। অবশ্য মিঃ বোস তাকে চেয়ারে বসিয়েছেন, চাও আনিয়ে দেন, লোকটি ভদ্র, কিন্তু কোথায় যে খুবই কঠিন তা বুঝেছে রতনবাবু।

মিঃ বোস বলেন—আপনি এলাকার নামী মানুষ, অঞ্চলের প্রধান, এসব কাজ আপনার শোভা পায় না। ওই ভেড়ির জমির মালিকদের সঙ্গে একটা আপোষ যদি করে নেন, তাহলে আমিও এসব কেস নিয়ে এগোব না।

রতন ভাবছে কথাটা, চতুর লোক সে, বেশ জানে এই করে কিছুদিন সময় পেলে একটা পথ সে বের করতে পারবে। তাই বলে

—আপনি যখন বলছেন তাই করবো স্যার, ওদের সকলকে ডাকিয়ে এনে একটা মীমাংসা করে নেব, জোর করে ওদের জমি নিইনি—নেব না স্যার, ওরা তখন দিয়েছিল ভেড়ি হয়েছে, এখন না চায় ভেড়ি থাকবে না।

মিঃ বোস বলেন—তাই করুন। মাসখানেক সময় দিলাম, এর মধ্যে মীমাংসা না হলে ওদের অভিযোগ এর তদন্ত করে ব্যবস্থা করতে হবে, আর কথা দিতে হবে এর মধ্যে কোন গোলমাল করবেন না।

রতন বলে—স্যার, ওরা যদি করে?

—ওরা করবে না আমাকে কথা দিয়েছে, আপনি ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন।

রতন বুঝেছে কিছুদিন সময় পাবে সে, তার মধ্যে ভেড়ির কয়েক লাখ টাকার মাছ সব ধরে বিক্রীও করে দিতে পারবে। আর যদি কোন পথ পায় ভেড়ি তারই থাকবে, তাই রাজী হয়ে যায় সে।

থানা থেকে বীর দর্পে বের হয়ে আসে রতনবাবু। বাইরে গ্রামের কৌতুহলী লোকজন অপেক্ষা করছে। রতনবাবু তাদের জানাতে চায় থানা অফিসার তাকে ডাকিয়ে এনে তার পরামর্শই নিয়েছেন। রতন তার সরকার নন্দকে বলে,

—এ দারোগা কাজকর্ম আইন কানুন তেমন জানে না, তাই ওকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, তবে ছেলেটার বুদ্ধি আছে, মানসম্মানও দিতে জানে।

গোলাবী পাশেই ছিল, সে বলে—দারোগাকে তো অনেক গেয়ান দিলে গো রতনবাবু। তুমার হাতের বাঁশী—সেই যি বন্দুকটা কোথায় গো? কেড়ে নিয়েছে বুঝি? তখন তো ওটা নে ঢুকলে—সেটা গেল কোথায়?

রতন চাইল গোলাবীর দিকে, মেয়েটা সব খবরই রাখে, বন্দুকটা দারোগা ছাড়নি, পরে মেয়েটা সেই অপমানের কথা প্রকাশ্যে বলতে চায়। রতন ধমকে ওঠে।

—থামতো! তুই এসবের কি বুঝবি? চলে যায় রতন, মনে হয় তার পিছনে সারা গঞ্জের মানুষ আজ চেয়ে আছে, তারা বুঝেছে রতনের দিন এবার বদলাচ্ছে।

রতনবাবু জানে যুদ্ধের সময় কিছু রীতিনীতি মানতেই হয়, লড়াই এ দরকার মত এগিয়ে যেতে যেমন হয়, প্রয়োজনে পিছিয়েও আসতে হয়।

এখন তাকে পিছিয়ে আসতে হবে, আপোসও করতে হবে। ঝড়ের মুখে বড় বড় গাছকেও নীচু হতে হয়, রতনও ভেবেছে কথাটা, আর এইভাবেই সে সমস্যার সমাধান করতে চায়, সে জানে আজকের এই আন্দোলনের মূলে রয়েছে একজনই, সে ওই রাজা।

রাজাই তার সর্বনাশের মূল, বলে পারেনি তাকে, রাজাই তাকে আড়াল থেকে বিপর্যস্ত করেছে। তাই ছলে কৌশলে সে রাজাকে শেষ করবেই, রতন বুঝিয়ে দেবে তাকে হারানো সহজ কাজ নয়, কঠিন—কষ্টসাধ্য সেই কাজ।

রতন তাই এবার তার রণকৌশলও বদলাবে।

কেদারবাবু বাগানে কয়েকটা গাছের পরিচর্যা করছেন, শিখা এর মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করে সেখানে নাকি একটা কাজের ব্যবস্থাও করেছে, সামনের মাসেই সেখানে জয়েনও করবে।

কেদারবাবু শিখাকে বলেন—চলে যাবি এখান থেকে? সত্যিই!

শিখা বলে—হ্যাঁ বাবা, আমার মনে হয় এদের এই নোংরা ঝগড়াঝাটির মধ্যে তোমারও না থাকাই ভালো। গড়িয়ার বাড়িতেই ফিরে চলো।

কমলাদেবী বলে—ও ফিরে যাবে? এই বাদাবনেই থাকবে।

শিখা স্কুলে চলে যায়। একটা মাস এখানের স্কুলে থেকেই চলে যাবে সে।

কেদারবাবু মিঃ বোসকে এদিকে আসতে দেখে চাইলেন,—হাবুল! এসো, এসো।

—ওগো দ্যাখো কে এসেছে? আমাদের সোনারপুরের সেই হাবুল, কমলাদেবীও বের হয়ে আসেন, মিঃ বোস প্রণাম করে ওকেও।

কমলাদেবী বলেন—ওমা, এখন যে চেনাই যায় না!।

কেদারবাবু বলেন—আমিও চিনতে পারিনি প্রথমে দেখে, এখানের থানার চার্জ নিয়ে এসেছে।

কমলাদেবী বলেন—বসো বাবা, তোমরা কথা বলো, শিখাও স্কুলে চলে গেল, আমি চা নিয়ে আসি।

হাবুলের ভালো নাম বসন্ত, বসন্ত বোস, সেও ওই মাস্টারমশায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, খুবই গরীব ঘরের ছেলে। সেদিন কেদারবাবুই তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন, বুদ্ধিমান, নিষ্ঠাবান সৎ বসন্ত, আজ এখানে উঠেছে।

তাই সে মাস্টামশায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, কেদারবাবু একথা সেকথার পর রাজার কথাটাই শুরু করেন। তার সেই ছেলেবেলার কাহিনী, ওর বাবার মৃত্যু, ঘর জ্বালানো—তার মা বোনের অর্ন্তধানের কথা সবই বলেন।

আজকের এই আন্দোলন, জনজাগরণের ইতিহাস, তার মূলে রাজার অবদান সবই জানান, বসন্ত বোসও সব শোনে।

সেও অবাক হয় রতনবাবুর ব্যবহারে, বলে—একটা মানুষ এত লোকের সর্বনাশ করতে পারে?

কেদারবাবু বলেন—তাই তো দেখছি!

মিঃ বোস বলেন—রাজার নামে পুলিশেও কোন প্রমাণই নেই, এদিকে বিদেশী জিনিসপত্র, অন্যকিছুর চোরাই ব্যবসা জোরই চলছে, কিন্তু রাজাই করে এসব তার কোন রেকর্ডও নাই। মনে হয় এসব মিথ্যা রটনা।

কেদারবাবু বলেন—হয়তো অন্য কেউ করে, তারাই পুলিশের নজর অন্যদিকে ফেরাবার জন্য রাজার নামেই এসব দায় চাপাচ্ছে।

বসন্ত বোস বলেন—হতেও পারে, তবে রাজা এখানে প্রকাশ্যে আসছে না কেন?

—হয়তো ওই রতনবাবুর জন্যই, সে চায় না এখানে কোন গোলমাল হোক। তাই দূরেই রয়েছে, ওর বাড়িটা এখন ধ্বংসস্তূপ, ওই ভেড়ির লকগেটের ধারে পড়ে আছে। ওখানে মাঝে মাঝে আসে, আর সব জমি তো ভেড়ির তলে, বেচারা।

বসন্ত বোস বলে—একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন, কেদারবাবু বলেন—আগেকার সেই দারোগার জন্যই পুলিশকেও আর সে বিশ্বাস করে না। কোনদিনই তো তাদের কাছে সে ন্যায় বিচার পায়নি।

বসন্ত বলেন—তা সত্যি, কিন্তু মাস্টারমশায় পুলিশেও অনেক ভদ্রলোক আছে, রাজা সবাইকে যেন ভুল না বোঝে।

কেদারবাবু বলেন—দেখছি, খবর পাঠাই তাকে, ও এলে ওকে বুঝিয়ে বলো, ও ফিরে আসুন, ঘরবাসী হোক, এই আবাদের মানুষের ভালোই হবে তাতে।

মিঃ বোস কথাটা ভাবছেন, তার কাছে খবর আছে এখানে অন্ধকারের ব্যবসা বেশ জোরদারভাবেই চলে, কিন্তু পুলিশও কিছু করতে পারেনি এতদিন। এবার তিনিই চেষ্টা করবেন।

গঞ্জের পথ দিয়ে আসছেন, হাটতলার ধারের সেই সন্ধ্যার মোমবাতি জ্বালা মদের

ঠেকও আর নেই, বসন্তবাবু নিজে লোকজন এনে ওসব ঝুপড়ি ভেঙ্গে মাঠ করে দিয়েছেন। বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন আটকে রেখে ছেড়েছেন, তারা এখন ওই পথও ছেড়েছে ভয়ের চোটে।

মিঃ বোস দেখে রতনবাবুর বাড়িতে আলো জ্বলছে, সন্ধ্যায় এখানে জেনারেটর চালিয়ে আলো জ্বালানো হয়, তাই এখানে অন্ধকার নেই।

রতন ওদিকে বসার ঘরে কি সব হিসাবপত্র করছে, মহানও এতদিন পর এসে হাজির হয়েছে, মহানও জানে সবই, বলে সে—ক'দিন জন্ডিসে ভুগলাম, তাই খবর নিতে পারিনি, ডাক্তার কমপ্লিট বেডরেস্ট নিতে বলেছিল।

রতনবাবু শোনে ওর কথাগুলো চুপ করে। মহানকে এখন চটাতে চায় না, রতনবাবুর সময় খারাপ যাচ্ছে। মহান বলে—আমি কলকাতায় মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছি রতনদা, একটা পথ হয়ে যাবে।

এমন সময় হঠাৎ নতুন দারোগাবাবুকে এখানে আসতে দেখে রতন অবাক হয়। তবু সেটা চেপে রেখে খুশীর ভাবই দেখায় রতন,—আসুন, আসুন স্যার, গরীবের বাড়িতে তাহলে পদধূলি দিলেন। কি আনন্দ যে হচ্ছে, কি নেবেন স্যার? চা-কফি, না হয় ...

রতন নিজেই আলমারি থেকে একটা স্কচের বোতল নামায় মিঃ বোস দেখছেন ওর ঘরখানা, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করে বলেন—আরে ব্বাস! মেজেতে দেখি পার্শিয়ান কার্পেট, ওদিকে বিলাতী কোম্পানীর সিগ্রেট, বেনসন হেজ, জাপানী কালার টিভি সোনী, খাস হলান্ডের ফিলিপস্ কোম্পানীর মিউজিক ডেক—বেলজিয়াম আয়না, বাদাবনে বাস করেও সব বিদেশী সেরা জিনিসের ছড়াছড়ি!

রতন বলে—বাদাবনে পড়ে আছি, একটু গান বাজনার সখ আছে, তাই—দারোগাবাবু গানটান ভালোবাসেন নিশ্চয়ই?

মিঃ বোস বলেন—গান!

রতন এগিয়ে আসে—আজ্ঞে একেবারে বন্দেগী ঠুংরি গজল তাও পাবেন, তাহলে আজ রাতে দয়া করে আসুন বাগানে। কলকাতার নামী বাঈজী কাজলিবাঈ এখানেই রয়েছে, রাতে ওখানেই খাওয়া দাওয়া হবে, নাচগানের ব্যবস্থাও থাকবে স্যার।

মহান বলে—তাই আসুন, ভালো লাগবে।

মিঃ বোস মহানের দিকে চাইল, এই নেতাকে সেও দেখেছিল পুলিশ সুপারের ঘরে, আজ এখানে দেখে বুঝেছেন মিঃ বোস এদের মধুর সম্পর্কের গভীরতা।

মনে হয় আজকালকার নেতারাও এই ধরনের অসৎ ব্যবসায়ীদের কাছে টাকার লোভে মাথা বিকিয়ে দিয়েছে, নেতারাই ধান্দা বাতলে দেয় রোজকারের আর এই ব্যবসায়ীরা সেই ফর্মূলা অপারেটর করে, ফলে দুজনেরই লাভ হয় প্রচুর এই অশুভ আঁতাতের ফলে।

এরা চায় পুলিশ প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় আনতে, এই তিন পেশার ত্রিবেনী সঙ্গম ঘটার জন্য আজ সমাজের বুকে এই লুণ্ঠনপর্ব শোষণ, নিরাপদেই চলছে।

মিঃ বোস বলেন—রতনবাবু, ওসবে তো আমার স্পৃহা নেই, সুতরাং আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম না, চলি।

রতন, মহান একটু অবাক হয়, ঘাবড়েই যায়। মিঃ বোস চলে গেলেন, যা দেখার তা তিনি দেখে নিয়েছেন, যা বোঝার তা বুঝেছেনও।

মহান বলে—ব্যাটা যে জাল কেটে বেরিয়ে গেল রতনবাবু?

রতনও বুঝেছে সেটা, আর বেশ ভয়ও পেয়েছে, কিছু দেখতেই এসেছিল ওই দারোগা। রতন মহানের কথায় বলে,

—ব্যাটা গভীর জলের মাছ মনে হচ্ছে, মহান যে ভাবে হোক উপরে ধরা করা করে ওই দারোগার বাচ্চাকে এখান থেকে বদলির চেষ্টাই করো। নাহলে আমার বিপদ হলে তোমার গদিও জন্মের মত চলে যাবে।

মহানও ভাবছে কথাটা, বলে সে—সেই চেষ্টাই করছি, একটা গণদরখাস্ত-টাস্থ যদি যেতো ওর নামে।

রতন বলে—ওই গণ দরখাস্ত, গণমিছিল করেই তোমাদের মাথা বিগড়েছে, আরে গণ দেবতারা সব করে দেবে আর ফায়দা লুটবে তোমরা এ চিরকাল চলে না। নিজে এবার কিছু করার কথা ভাবো।

রতন খুব সাবধানী লোক, সে জানে এসবের মূল কারণ ওই রাজার উপর অত্যাচার, একটি ছেলেই আজ কৌশলে তার গদি কেড়ে নিতে চলেছে।

এখন মাছের আড়ত বন্ধ, হাটের আয়ও সীমিত হয়ে এসেছে, জুলুম করে বেশী টাকা তোলার উপায় রাখেনি এই দারোগা, আর কড়া পাহারা রেখেছে চারিদিকে রতনের রাতের আসল ব্যবসাই বন্ধ হয়ে এসেছে।

অঞ্চল প্রধান এর পদ নিয়েই কিছু আমদানী আর প্রতিষ্ঠা। এবার তাও চলে যাবে, কারণ বেশ বুঝেছে সে সামনের ভোটে এবার নাকি রাজাকেই দাঁড় করাবে ওরা। রাজার সামনে রতনবাবুর দল খড়কুটোর মত উড়ে যাবে, কারণ তাদের মুখোস খুলে গেছে।

রতন অবশ্য যা সঞ্চয় করেছে তাতে তার কেন পরের প্রজন্মের দিন আরামেই কাটবে, তবু প্রতিষ্ঠা আর অর্থের মোহ মানুষ কোনদিনই ছাড়তে পারে না, খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার সেটা।

তাই রতনও চায় যেভাবেই হোক এই প্রতিষ্ঠা অর্থের প্রবাহকে চালু রাখতে, রাজাকে যেভাবেই হোক থামাতে হবে।

আর একটা পথের কথাই মনে হয় তার, জানে রতন এই আবাদের একটি মানুষকেই রাজা সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করে, শ্রদ্ধা করে, তিনি কেদারবাবু, সৎ—সহজ সরল

পরোপকারী মানুষ, রতন জানে একমাত্র তিনিই পারেন এই কাজ করতে।

কেদারবাবু সেদিন খবরের কাগজ পড়ছেন, এখানে সেই দিনের কাগজ আসে ক্যানিং হয়ে লঞ্চে পৌঁছতে প্রায় দুপুর হয়ে যায়।

খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় বসে কেদারবাবু কাগজ পড়ছেন, হঠাৎ রতনবাবুকে আসতে দেখে অবাক হন।

—আসুন রতনবাবু, বসুন।

রতন আজ ভক্তি ভরে কেদারবাবুকে প্রণাম করে নীচেই বসলো, আজ সে যেন অন্য মানুষ, বিনয়ী নম্র সংযত, আগেকার সেই উদ্ধত রতন নস্কর কেমন বদলে গেছে।

—কি ব্যাপার? কেদারবাবুর প্রশ্নে রতন বলে—ক'দিন থেকেই ভাবছি কথাটা মাস্টারমশাই। গুরুদেবের আশ্রম শিমূরালীতে গেছলাম, গুরুদেবও খুবই তিরস্কার করলেন। নিজেও ভাবলাম কথাটা,

কেদারবাবু শুধোন—কি কথা?

রতন গদগদ কণ্ঠে বলে—নিজের বহু পাপের কথা, গুরুদেব বললেন—দিন তো ফুরিয়ে এলো, আর পাপের বোঝা বাড়াস নে, ধর্ম-পরকাল এসব যদি মানিস শান্তি পাবি, নাহলে নরকেও গতি হবে না তোর।

কেদারবাবু যেন ভূতের মুখে রাম নাম শুনছেন, কিন্তু লোকটার কথায় একটা আন্তরিকতার সুরই ফুটে ওঠে।

রতন বলে—তাই ভাবলাম মাস্টারমশায়, জীবনে অনেক ভুল, অনেক পাপ করেছি, লোককে ঠকিয়েছি, কিন্তু কি পেলাম? অশান্তি আর ওদের অভিশাপ!

কেদারবাবু বলেন—সত্যিই বলছেন?

রতনবাবু বলে—জানি, আমার মত লোককে সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না, না করাই স্বাভাবিক, জীবনে তো ভালো কাজ কিছুই করিনি, করেছি শুধু অকাজ আর পাপ। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে চাই মাস্টারমশায়। এবার ভাবছি ওই ভেড়ি তুলে দিয়ে সকলের জমি ফিরিয়ে দেব, এই আবাদ অঞ্চলের মানুষের জন্য কিছু ভালো কাজ করতে চাই।

রাজার উপরও অনেক অবিচার করেছি, ওর সব জমি, বাড়ি ফিরিয়ে দোব, ওকে বলুনও ফিরে আসুক। ওর সাহস আছে, শক্তি আছে, আমি যথাসাধ্য টাকা যোগাবো এখানে একটা হাসপাতাল খুলুক, ওর কথা সারা আবাদের মানুষ শুনবে, ও আর আমি দুজনে এক হয়ে কাজ করতে পারলে আবাদের মানুষের মঙ্গল হবে।

কেদারবাবু ভাবছেন কথাটা, ওরা দুজনে এক হয়ে কাজ করতে পারলে বিরাট কিছু করা যাবে এখানে, কলেজ হবে—হাসপাতাল হবে, মানুষের রোজকারের পথ হবে।

রতন বলে—আপনিই রাজাকে আসতে বলুন, আমার সঙ্গে কথা বলুক, ঘর বাড়ি জমি জায়গা সব ফিরিয়ে দিয়ে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। শান্তিতে বাকী জীবন পরের মঙ্গলের কাজেই কাটাতে চাই, রাজা থাকবে এখানে আমার ছোট ভাই-এর মতই।

শিখাও ফিরেছে স্কুল থেকে, সে ও ঘরে বসে রতনবাবুর কথাগুলো শুনছে, রতনবাবু যে অন্তর থেকেই কথাগুলো বলছে তা বুঝেছে শিখা। মানুষের পরিবর্তন ঘটেই, রতনবাবুরও ঘটবে না এটা কে বলতে পারে?

রতনবাবুর কথাগুলো আজ কেদারবাবুর মনে একটা প্রতিক্রিয়া আনে, রতন বলে,—সারা আবাদে আপনিই একটি মানুষ যার কাছে এই যন্ত্রণা প্রকাশ করা যায়, তাই আপনার কাছেই এসব জানিয়ে গেলাম। আপনিও ভেবে দেখুন, যদি ভাবেন এতে ভালো হবে তাহলে কিছু করতে পারেন আপনিই, আজ চলি মাস্টারমশাই। তেমন বুঝলে ডাকবেন, আমি আসবো।

রতনবাবু চলে যায়। কেদারবাবু কথাটা ভাবছেন, যদি রতনবাবু আর রাজা দুজনে এক হতে পারে আবাদে শান্তি আসবে, মঙ্গল হবে সকলেরই। রাজাও আবার এখানে এসে বাস করতে পারবে, ওই যাযাবর জীবন থেকে সেও নিষ্কৃতি পাবে।

বসন্ত বোসও আগে মাঝে মাঝে এখানে মাস্টারমশায়ের খবর নিতে, এর মধ্যে সে তার স্ত্রী মনিমালাকেও নিয়ে এসেছে, তাদের ছোট একটি ছেলে সেও আসে এখানে বাবা মায়ের সঙ্গে।

কেদারবাবু কমলাদেবীও খুশী হন বসন্তের বৌ ছেলেকে পেয়ে, খোকন এর মধ্যে মাসীমনির সঙ্গেও ভাব জমিয়ে নিয়েছে।

শিখারও সঙ্গী হয়ে ওঠে মণিমালা।

মণিমালাও চলে আসে এখানে, বলে সে

—বাদাবনে আসতে হবে শুনে ভয়ে মরি কাকীমা! যা ধূ ধূ গাং কুমীর কামটের রাজ্য, কথা বলার লোক নাই, আপনার ছেলেকে বলি—কোথায় নে চল্লে? ও হেসেছিল, বলে—চলো না, শহরে তো এতকাল ঘুরলে, একটু অন্যত্র চল।

এখানে নেমে তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া, তবু এখানে এসে কাকাবাবু, আপনি, শিখাকে পেয়ে বাঁচলাম, খোকন তো মাসীমনিকে পেয়ে সব ভুলেছে।

বাগানে শিখা আর খোকন তখন একটা রঙীন প্রজাপতির পিছনে ঘুরছে। খোকন চীৎকার করে—ধরো, ধরো মাসিমনি, নাঃ তুমি কোন কম্মের নও, উড়ে গেল তো অমন সুন্দর প্রজাপতিটা।

শিখা বলে—আবার আসবে, এখানে কত প্রজাপতি—খোকন হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে একটা পাখীর ডাক শুনছে, এ যেন নতুন এক সুন্দর জগৎ। ওরা ওদের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত।

বসন্ত শুনছে কেদাবরবাবুর কথাগুলো, রতনবাবু যা যা বলে গেছে সবই বলেন কেদারবাবু বসন্তকে। বসন্ত সব শুনে বলে—অবশ্য ওই সব মানুষের হঠাৎ এমন পরিবর্তন হতেও পারে! জীবনে ক্লান্তি আসে ওদেরও, আর বলছেন রাজার মত ছেলে যদি এখানে আসে, রতনের সঙ্গে একত্রে কাজ করে তাহলে সত্যিই ভালো কাজ হবে এখানে, আবাদে শান্তি ফিরে আসবে, সমাজের কল্যাণ হবে।

কেদারবাবু শুধোন—কিন্তু পুলিশ রাজার উপর কোন জুলুম করবে না?

বসন্ত বলে—সব রেকর্ড আমি পাইনি, অভিযোগ যে কেউ কারো নামে করতে পারে, কিন্তু প্রমাণ না থাকলে সে সব অর্থহীন, তেমন কোন প্রমাণ নেই, সুতরাং রাজা এলে তার কোন ক্ষতি হবে না।

কেদারবাবুও চান রাজা ফিরে আসুক, ঘর বসত করুক।

বসন্তবাবুও বলেন—রাজাকে সেটলড্ দেখলে আমিও খুশী হবো, তার মত ছেলে সমাজের এ্যাসেট।

কেদারবাবুও ভাবছেন কথাটা, রতনবাবুকেও এবার বিশ্বাস করেন তিনি।

সেইমত খবরও যায় রাজার কাছে, রাজা এখন বনবসতের বাইবে মাছের আড়ত, বনের পারমিট নিয়ে কাঠের ব্যবসা চালু করেছে, ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু মানুষের জন্যই রুজি রুটির ব্যবস্থাও করেছে।

গঞ্জের খবরটা যেতে ওরা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করে, নগা বলে—

—রতনবাবু হঠাৎ সাধু হতে চায় কেন রে? এ্যাঁ বিড়াল বলে মাছ খাবো না, বোস্টম হয়েছি!

ভূদেব জাল বুনতে বুনতে বলে—গঞ্জের মানুষের ভালো করবে উ শালা! খবরদার ওর কথায় কান দিও না রাজা!

নগা বলে—রতন মলেও শান্তি দেবে না, কথায় আছে না—

রতন মরে জলে ভাসে,

কাক বলে কুন ছলে আসে। ও মলে কাকও ভয়ে ওকে ঠোকরাতে যাবে না।

রাজা ভাবছে কথাটা, এই যাযাবর জীবন তার ভালো লাগে না। গঞ্জের মানুষদের জন্য যথাসাধ্য করেছে, রতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে তাদের।

আজ ওই হিংসা— হানাহানি তার ভালো লাগে না। তবু অন্য মন এখনও সেই অত্যাচারের কথা ভোলেনি, তার বদলা নেওয়া হয়নি সঠিকভাবে।

কিন্তু মাষ্টারমশাই ডেকেছেন তাকে, এ নিয়ে আলোচনা করতে চান, নতুন দারোগাও চায় রাজার সঙ্গে আলাপ করতে। তিনি এসে রতনের অত্যাচার, বেআইনি ব্যবসা সবই বন্ধ করেছেন, শাসিয়েছেন রতনকে। রতনের প্রধানগিরিও চলে যাবে এবার, শাস্তি তার

কম হয়নি। বাধ্য হয়েই সে এবার সকলের জমিও ফিরিয়ে দিয়ে আপোষ করতে চায়।

রাজার জমি, ঘরও আবার তারই হাতে ফিরে আসবে। রাজার মনে পড়ে শিখার কথা, মানুষের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চায় রাজা— শিখাকে নিয়েই সে আজও স্বপ্ন দেখে, শিখাও চায় সে ফিরে আসুক।

রাজা বলে—মাস্টারমশাই ডেকেছেন রে, যেতেই হবে।

নগা বলে—তা চলো ত্যানার কাছে, কিন্তু ওই রতনের ব্যাপারে কিছু করবে না রাজা, যা করার ভেবেচিন্তেই করতে হবে।

রাজাও তা জানে, রতনবাবুর কথাগুলো সেও ভাবছে।

কেদারবাবু জানতেন রাজা আসবেই। কমলাও তার পথ চেয়ে আছে, শিখা দেখেছে মা গোলাবীকে দিয়ে হাট থেকে পাবদা, ইলিশ মাছ আনিয়েছে। পায়েসও তৈরি করেছে, কমলাদেবী বলেন—রাজা এসব খেতে খুব ভালবাসে, বাদাবনে পড়ে আছে এসব কি পায়?

শিখা বলে—শুনি এখন বিরাট মাছ, কাঠের ব্যবসাপত্র তার।

কমলাদেবী মেয়ের দিকে চাইল।

বসন্তের স্ত্রী মণিমালাও আসে।

সেও এর মত এখানের গেজেট গোলাবীকে চিনে ফেলেছে। গোলাবী সেখানেও দুধ, মাছের যোগান দেয়, আর বেশ জমিয়ে বসে গঞ্জের নানা কাহিনী শোনায়, মণিমালারও সময় কেটে যায়।

গোলবীর কাছেই মনিমালা রাজার কাহিনী শুনেছে, শুনেছে রাজার সঙ্গে শিখার ঘনিষ্ঠতার কথা, এককালে ওরা দুজনে ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ।

—এখন? মনিমালা শুধোয় গোলাবীকে

—এখন! শিখা দিদিমণির কি হয়েছে জানি না, বলে রাজা একটা ডাকাত, ওকে সে ঘেন্না করে। তারপর গোলাবীই মনিমালাকে মধ্যস্থতা মানে।

—বলো দিদিমনি? রাজা ওই রতনবাবুর মত হাড় শয়তান লোকের টাকা নে সারা গঞ্জের জেলেদের বাঁচিয়েছে, তাদের খাইয়েছে। তাদের উপর জুলুম থামিয়েছে, এত ভালো কাজ যে করলে সে হল ডাকাত! তালে ওই রতন যে সকলের সর্বস্ব মায় ইজ্জৎ অবধি লুটেছে সে কি গো?

এই প্রশ্নের জবাব মনিমালা জানে না, তবে জেনেছে সে শিখার মনে কোথায় একটা নীরব অভিমানের জ্বালাই রয়েছে, তাই রাজার উপর এইভাবেই যেন ঘৃণা করে দুঃখ ভুলতে চায়।

সেদিন মনিমালাও এসেছে শিখাদের বাড়িতে। কেদারবাবু খুশী, বোধহয় রাজা এবার ফিরে আসবে, সে আসছে আলোচনা করতে।

মনিমালা বলে শিখাকে—তাহলে রাজা ফিরছে?

শিখা আজ ও নিয়ে আর ভাবতে চায় না, সে এর মধ্যে কলকাতা যাতায়াত করে ওদিকের একটা স্কুলে চাকরীর ব্যবস্থা করেছে, কোনমতে এম এ টাও করবে।

শিখা বলে—কে ফিরছে না ফিরছে তা জানি না বৌদি, সে খবরও রাখি না। নিজে এখান থেকে চলে যাচ্ছি তাই জানি।

মনিমালা অবাক হয়— সেকি? চলে যাবে এখান থেকে?

—হ্যাঁ, মা বাবাও জানেন, কলকাতার কাছে সোনারপুরে একটা মাস্টারির কাজ পেয়েছি।

মনিমালা বলে—কেন চলে যাচ্ছো তা জানি, কিন্তু মনে হয় একজনের উপর ভুল বুঝে, বৃথা অভিমান করেই চলে যেতে চাও তুমি।

শিখা চুপ করে থাকে। এ নিয়ে কোন কথা বলে না, রাজাকে নিয়ে তার মনেও অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু রাজার ওই যাযাবর জলদস্যুর কাজকে সে কোনমতেই সমর্থন করে না।

মনিমালা বলে—তোমার দাদাও তো বলেছেন রাজার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণই নাই, বরং সে ওই এলাকাতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে, বহু মানুষের রুজি রোজকারের ব্যবস্থা করেছে।

শিখা বলে—সে একটা ভণ্ড, চতুর, সে জানে আইন বাঁচিয়ে তার আড়ালে কি করে ওসব করতে হয়,

মনিমালা বলে—না, শিখা, অন্যায় করলে সে খবর মানুষ জানতোই।

রাজা এসেছে রাতে কেদারবাবুর কাছে, আজ কেদারবাবু তাকে রতনের কথাগুলো জানান। বলেন—রতন সত্যিই একটা শান্তি চায়, আমিও চাই রাজা, তুমি এখানে এসে আবার ওই ভিটেতে ঘর বসত করো, বাড়িঘর তোলো, তোমার জমিও ফিরিয়ে দেবে।

রাজা বলে—একা আমার জমি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চায়?

কেদারবাবু বলেন—না, না, সকলের জমিই একসঙ্গেই ফিরিয়ে দেবে বলেছে। রাজা আমি বলি ঢের হয়েছে, রতন তার স্বভাবই বদলেছে, এইটাই তার চরম শান্তি। এবার দুজনে মিলে আবাদের মানুষদের জন্য কিছু ভালো কাজ করো।

রাজা বলে—তা তো করতে চাই মাস্টামশায়, করবোও, কিন্তু ওই রতনবাবু জাত শয়তান, ওকে বিশ্বাস নাই, কখন কি করে বসে তা কেউ জানে না, তাই সন্দেহ হয় ওকে।

শিখা শুনছে ওদের কথাগুলো, রতনবাবুর কথাগুলোও সেদিন শুনেছে শিখা, আজ রাজার কথাও শোনে। কেদারবাবু বলে

—রতনবাবু আজ অন্য মানুষ, মানুষ বদলায় রাজা, আজ সে অনুতপ্ত, সে চায় সব বিবাদ মিটিয়ে এখানের মানুষের জন্য কিছু করতে, সে চায় তুমিই পঞ্চায়েতে দাঁড়াও,

প্রধান হও—কিছু ভালো কাজ হবে, সেও সাহায্য করবে। তুমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলো, তারপর যা ভালো বোঝো করবে।

রাজা কি ভাবছে, তার কাছে এসব যেন মিথ্যা বলেই মনে হয়, বলে সে—ওকে বিশ্বাস করি না মাস্টারমশায়, এ তার কোন চালই।

—না রাজা।

শিখা বের হয়ে আসে, সে বলে ওঠে

—কাকে এসব বোঝাতে চাইছ বাবা? রতনবাবু অসৎ লোক—সে যদিও বদলাতে পারে কিন্তু তোমার এই সৎসাহসী সাধু রাজা একটুকু বদলায়নি। এতকাল গাং-এ বাদাবনে ডাকাতি করে সে এখন পাক্কা ডাকাতই হয়ে গেছে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা না করাই ভালো।

রাজা চমকে ওঠে, কেদারবাবু ধমক দেন মেয়েকে,

—কাকে কি বলছিস শিখা?

—ঠিকই বলছি বাবা, ওর মতিগতি এখন বদলে গেছে। ও রক্তের স্বাদ পাওয়া একটা হিংস্র জীব এখন, তাই ভালো কথা শুনবে না, পণ্ডশ্রমই করছো।

শিখা কথাগুলো বলে ভিতরে চলে যায়, কেদারবাবু চুপ করে যান, শিখা যা বলছে তা সত্যি কি না কে জানে। তাহলে রাজা এতদিন তার মুখের উপর জবাবও দেয়নি, আজ কথা বলছে।

রাজা দেখছে মাস্টারমশাইকে, তিনিও চুপ করে যাচ্ছেন,

—মাস্টারমশাই!

কেদারবাবু চাইলেন বেদনাভরা চাহনিতে। বলেন—তুমি যা ভালো বোঝো করো রাজা। আমি জোর করব না, এটা তোমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

মাস্টারমশাই এর কথায় বেদনা, পরাজয়ের সুর বাজে, রাজাও মনস্থির করে নেয়, বলে সে

—মাস্টারমশাই জীবনে বাবার স্নেহ, মায়ের ভালোবাসা আমি তেমন পাইনি, অকালেই তাদের হারিয়েছি, আপনিই সেদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য, পরম শ্রদ্ধেয় জন, আপনার কথাই আমার কাছে আদেশ, আমি রতনবাবুর সঙ্গে সব মিটিয়ে নিতে চাই।

মাস্টারমশাই এর ম্লান মুখ আনন্দে ভরে ওঠে।—রাজা!

—হ্যাঁ মাস্টারমশাই আমিও চাই ব্যক্তিগত সব বিরোধ ভুলে গিয়ে আবাদের মানুষদের জন্য কিছু ভালো কাজ করতে, তাই আপনার কথামত আমি রতনবাবুর ওখানে গিয়ে আলোচনা করবো, ওকে জানিয়ে দিন।

কেদারবাবুও খুশী হন, বলেন

—আমি জানতাম তুমি যাবে রাজা, আমিও চাই তুমি ফিরে এসো, সুখী হও, অন্যের জন্যও আরও কিছু কাজ করো।

রাজা মাস্টারমশাই এর কথাতে অমত করতে পারেনি।

রতনবাবুর ওখানে গিয়ে একটা মীমাংসার সূত্রই বের করবে তারা।

নগা নৌকার পাটাতনে বসে একটা ছোট পাইট গলায় ঢালছে, রাজার সঙ্গেই এসেছে সেও, রাজাকে ফিরতে দেখে চাইল—কি হলো?

রাজা ওর কথায় বলে—মাস্টারমশাই এত করে বল্লেন, ওর কথা অমান্য করতে পারলাম না, কথা দিলাম রতনের ওখানে যাবো, একটা মীমাংসা যদি হয় ভালোই।

নগা বলে ওঠে—ওই শয়তানের কাছে যাবি তুই? ওই ব্যাটাকে এতটুকু বিশ্বাস করি না, যদি একলা পেয়ে তোর কোন ক্ষতি করে?

রাজা সে কথাটাও ভেবেছে, কিন্তু সে ভীরু কাপুরুষ নয়। বিপদে পড়লে তার থেকে উদ্ধার পাবার পথ সে বের করতে জানে। তাই বলে

—ওর কোন সাধ্যই হবে না রাজার কিছু করে, সকলেই জানে আমি ওখানে গেছি, আর বিপদ যদি কিছু ঘটাতে চায় সেই বিপদ থেকে রাজা ঠিকই বের হয়ে আসতে পারবে। ওর ইঁদুরের দলের মুরোদ কত তা আমি জানি, আর যাবো বলেছি তখন যাবোই।

রাজার কথা নড়চড় হবে না, কাল সন্ধ্যাতেই যাবো ওখানে খবর পাঠিয়েছি।

নগা কথাগুলো শুনছে, জানে সে রাজা যখন কথা দিয়েছে তখন সে যাবেই, এবার নগা ভাবছে কথাটা। তাঁদেরও একটা কিছু করতেই হবে, নগা তার চ্যালা জগাকে বলে—আজ রাতেই তুই চলে যা, বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে তৈরী হয়ে আসবি কাল দুপুরের মধ্যে। রাজা যা করার করুক, আমাদেরও কিছু করতে হবে।

নগাও বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে, জগা রাতের ভাঁটাতেই রওনা হয়ে গেল দলের সবাইকে খবর দিতে।

রতনবাবু ভাবতেই পারেনি যে রাজা সত্যিই আসতে চাইবে তার বাগান বাড়িতে, কেদারবাবুকেও রতন বেশ নাটকীয়ভাবে আবেগ কম্পিত সুরেই কথাগুলো বলে তার মন ভিজিয়েছিল। আর তাতে যে এমনি ফল ফলবে তা ভাবেনি।

রাজার আসার কথা শুনেই এবার রতনও তার কর্মপন্থা ভেবে নিয়েছে, এবার শেষ সুযোগ সে ছাড়বে না। যেভাবে হোক রাজাকে শেষ করতে হবে, তার আসার খবর গোপনই রাখতে বলেছে কেদারবাবুকে।

কারণ রাজাও চায় না এ খবর প্রকাশ পাক, রতনও চায় না এ খবর কেউ জানুক। রাতের বেলায় রাজা আসবে তার বাগানে আর ফিরে যাবে না, সে কৌশলে রাজাকে

শেষ করে ওর লাশই গায়েব করে দেবে।

কাজটা করতে হবে খুব কৌশলে, কারণ রাজাও এত বোকা নয়, সে তার জালে পা দিলেও তাকে সামলানো কঠিন কাজই। তাই সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করতে হবে তাকে।

বাইরে সে রাজার আসার জন্য ভালোরকম অর্ভ্যথনার আয়োজনই করবে, আর গোপনে আসল কাজই সারবে।

কেউ জানবে না সেটা।

রতন ফটিকদের বলে—কাল একটু নাচগানের আয়োজন করতে হবে, তোর চেনাজানা ছেলে মেয়েদের আনবি, একজন অতিথি আসবে, তার একটু মান খাতির করতে হবে, তোরাও আশপাশে থাকবি।

ফটিকরা জানে এমন নামীদামী মেহ্মান অনেক আসে এখানে, তাদের আপ্যয়নের বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়।

ফটিক বলে—ওর জন্য ভাববেন না। সব ব্যবস্থাই হয়ে যাবে।

রতনও খুব খুশী, গঙ্গাপূজার জের এখনও কাটেনি, তাছাড়া রতনের বিশেষ অতিথিদের আনাগোনাও আছে, তাই কাজলীবাঈ রয়েছে এখনও।

রতন এবার কাজলীবাঈকেই কাজে লাগাতে চায়, বলে রতন—কাজলীবাঈ কাল একজন মানী অতিথি আসবে, এখানের রাজা!

কাজলী নামটা শোনে; রতন বলে—ছোড়াটা মহা ত্যাঁদড়, বুঝলে আমার পিছনে ছিনে জোঁকের মত লেগেছে, ওটার আমিই ব্যবস্থা করে দোব।

কাজলীবাঈ শোনে কথাটা, এর মধ্যে কাজলীবাঈও দেখেছে রতনবাবুর এলেম। লোকটা মহা ধুরন্ধর তা জেনেছে, ও নিশ্চয়ই একটা কিছু কাণ্ড ঘটাতে চায়। সব জেনেও কাজলীবাঈ বলে—আমাকে কি করতে হবে?

হাসে রতন—না-না। তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না। শুধু একটু নাচগান করবে। আর ব্যাটা মদ যদি খেতে না চায় একটু কায়দা মানে ছলাকলা করে মদ গেলাতে হবে, যাতে একটু নেশা টেশা হয়, এই আর কি! অবশ্য তার জন্য তোমাকেও খুশী করে দোব।

কাজলীবাঈ এর মনে কেমন সন্দেহ জাগে, রতনবাবু নিশ্চয়ই মদ গিলিয়ে রাজার কোন চরম সর্বনাশ করতে চায়, তাই তাকেও নজর রাখতে হবে রতনের উপর।

কাজলীবাঈ খুব উছলভাবেই বলে—ওমা, এই কাজ, এতো কাজলীবাঈ বাঁ হাতের খেলা রতনবাবু, ও আপনি ভাববেন না।

রতনও খুশী হয়, বলে—তা জানি কাজলীবাঈ, তাই তো তোমাকে এত ভালোবাসি, তাহলে কাল তৈরী থেকো রাতে।

কাজলীবাঈ তখন থেকেই নজর রেখেছে রতনের উপর। রতনও বসে নেই, এর মধ্যেই সে তৈরী হয়েছে, একশিশি বিষও আনিয়ে রাখে ওর মদের আলমারীর ড্রয়ারে।

কাজলীও নজর রাখে গোপনে, সে এবার বুঝেছে মদের সঙ্গে ওই বিষ মিশিয়েই রাজাকে খাইয়ে তাকে শেষ করতে চায় রতনবাবু।

কাজলীও এবার বুঝেছে তার কি কর্তব্য, মেয়েটাও গোপনে ওই ড্রয়ার খুলে শিশির তীব্র তরল বিষটাকে ফেলে দিয়ে ওর মধ্যে জল পুরেই রেখে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে সাবধানে।

রাজা আসার জন্য তৈরী হচ্ছে, সে চায় সবকিছুর একটা সুষ্ঠ মীমাংসা হোক, সেও খুশী হবে।

কিন্তু নগা তখনও বলে—ভেবে দ্যাখ রাজা, ওখানে যাচ্ছিস, এটা ঠিক হবে?

রাজা যাবেই, সে বলে—কথা যখন দিয়েছি যাবোই, তোরা সব সময় ভালো কাজে বাগড়া দিস কেন?

চুপ করে যায় নগা, রাজা চলে যাবার পর নগা বলে—জগা ছেলেদের এনেছিস?

জগা এর মধ্যে রাতারাতি গিয়ে তাদের ডেরা থেকে ছেলেদের নিয়ে এসেছে, তারাও তৈরী।

নগা বলে—রাজা ওখানে গেছে, আমাদেরও তৈরী থাকতে হবে।

এর মধ্যে গোলাবীদিও এসে পড়ে, সে জেনেছে যে রাজা রতনবাবুর ওখানে যাচ্ছে। অবশ্য ফটিকের দলই গোলাবীকেও তার পাড়ার কয়েকজন মেয়ে ছেলেকে নিয়ে বাগানে নাচের আসরে আসতে বলেছে। গোলবীর এমন একটা দলও আছে, গঙ্গাপূজোর সময় তারাই মহাসমারোহে নাচগান করে মেলায়, গোলাবী সেই খবর পেয়েই এসেছে নগার কাছে।

নগা বলে—হ্যাঁ গোলাবীদি, রাজা গেছে রতনবাবুর ওখানে, কোন কথা শুনলো না, কিছু যদি হয়?

গোলাবী কি ভেবে বলে

—তোমরা ক'জন আমাদের নাচের দলে মিশে চল ওখানে, তেমন দেখলে তখন অন্য ব্যবস্থা করা হবে, কথাটা নগারও মনঃপূত হয়।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামছে গঞ্জের বুকে। হাটবার আজ নয়, তাই হাটতলাও শুনশান, দু'চারটে দোকানে বাতি জ্বলছে, তারাও এবার দোকান বন্ধ করে যে যার বাড়ি চলে যাবে।

দূরে বাঁধের ওদিকে থানাতে অলো জ্বলছে। বাকী সব ক্রমশঃ আঁধারে ডুবে যায়,

নদীতে শুরু হয়েছে জোয়ার আর বাতাসও এখন গাছপালা কাঁপিয়ে নদীর বুকে ঢেউ তোলে, গঞ্জ ক্রমশঃ স্তব্ধ হয়ে আসে, আঁধার নামে।

রতনের বাগানে আজ উৎসবের আয়োজন চলেছে, বাতাসে ওঠে মাছ রান্নার সুবাস। ওদিকে বাগানে ফটিকরা ব্যস্ত, বিস্তৃত বাগান, দূরে গাছপালার মধ্যে অন্ধকার জমেছে, ওদিকে আলো নেই।

সেই অন্ধকারের মধ্যে দুতিনজন লোক তারার ম্লান আলোয় গর্ত কেটে চলেছে, ফটিক তদারক করছে সেই কাজের, ফটিক গর্তের গভীরতা পরীক্ষা করে বলে—

—আরও খানিক নীচে খোঁড়, বেশ গভীর কর গাড্ডাটা। ওরা মাটি খুঁড়ছে, ফটিক বলে—গর্ত কেটে ফ্যাল, পরে আসছি।

রতন এখন ব্যস্ত, ওঘরে সে মদের বোতল গ্লাশ বের করেছে, কাজলীবাঈ তার উপর নজর রেখেছে। এমন সময় নন্দ সরকার এসে খবর দেয়,

—রাজা এসে গেছে বাবু, রতন ওর আসার অপেক্ষাতেই ছিল। সে বলে

—নন্দ, ওদিকের আয়োজন সব ঠিক আছে তো? তোদের ওইসব নাচগানের ব্যাপার?

নন্দ বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওদের বলেছি, সবাই এসে পড়বে।

রতন বলে—ওদের বাগানের ওদিকেই নাচগান করতে বলবি, পরে যাচ্ছি আমরা।

রাজা অনেকদিন পর এই বাগানবাড়িতে আসছে, ছেলেবেলায় নগাদের সঙ্গে দলবেঁধে এখানে এসেছে, অবশ্য পাঁচিল টপকে। বিরাট বাগানটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, রতনবাবু অনেক হেপাজত করে এই নোনামাটির নূন ভাব মেরে এখানে নানা ধরনের কলমের আমগাছ এনে পুঁতেছিল, আম, কাঠাল, পেয়ারা, জামরুল, সবেদা নানা গাছ লাগিয়েছে, নারকেল গাছও করেছে অনেক।

ছেলেবেলায় রাজা পাঁচিল টপকে আসতো আমের সময়, দু'চারটে আম পাড়ার পরই তাড়া খেয়ে আবার ডালে পা দিয়ে পাঁচিলের ওদিকে যাওয়া ডাল ধরে বাইরে লাফিয়ে পড়ে দৌড় মারতো।

সেই বাগানটায় নতুন বাড়ি করেছে রতন, সামনে ফুলের গাছ, বাড়িটা সুন্দরভাবে সাজানো, তার রুচি আর অর্থের প্রাচুর্যের কথাই চোখে পড়ে, জেনারেটার চালিয়ে আলো জ্বালানো হয়েছে বড় ঘরটায়, একদিকে কয়েকটা সোফা, মাঝে কার্পেট পাতা, রঙীন আলোর বাহার।

রতনবাবু এগিয়ে আসে।

—আয়, আয় রাজা।

রতনবাবুই রাজাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরে,

—আয় বোস।

রাজাকে সমাদর করে বসায় সোফায়। রতন বলে,

—এতদিন শুধু ভুলই করেছি রাজা, ভেবেছিলাম দুনিয়ায় টাকাটাই সবচেয়ে বড়। তাই পাগলের মত টাকার পিছনেই ছুটেছি কোনদিকে না চেয়ে, ওই টাকা, জমির জন্য কত ভুল, কত অন্যায় না করেছি।

সেদিন স্বপ্নে গুরুদেবকে দেখলাম।

রাজা অবাক হয়ে শুনছে রতনের ওই আবেগমথিত কথাগুলো, বলে সে—গুরুদেবকে দেখলেন, স্বপ্নে?

রতন বলে—হ্যাঁরে, স্বয়ং গুরুদেবকেই দেখলাম, উনি বললেন—রতন, ইহকালের কাজ নিয়েই থাকবি? পরকালের কথা ভাব, এই সব তো সব অনিত্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না, এসব কি কাজে লাগবে তোর? এখনও সময় আছে।

বিষয় পাপ ছেড়ে পরের মঙ্গলের কথা ভাব, মন থেকে দম্ভ, লালসা, অহংবোধকে তাড়া, নাহলে যে পরজন্মে দুঃখের অবধি থাকবে না, তাই সাবধান করছি—

স্পষ্ট শুনলাম ওর কণ্ঠস্বর, দ্যাখ রাজা—মনে করলে এখনও গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে।

রাজাকে দেখায় তার রোমশ হাতটা, রতন বলে—তাই ভাবলাম, এসব লোভের পালা শেষই করবো এবার, তোকে তাই ডেকেছি রাজা।

রাজা বলে—আমাকে? কেন?

রতন বলে—অনেক কথা আছে রে, দাঁড়া একটু গলা ভিজিয়ে নে, কথা হবে।

রতনকে লক্ষ্য করছিল কাজলীবাঈ ওদিকের ঘর থেকে। দেখছে সে রাজাকেও। ওকে আগেই দেখেছে কাজলী, কিছুদিন আগে নদীর ধারে একটা ধ্বংসস্তূপের কাছে, ওর কর্কশ কথাগুলো আজও ভোলেনি কাজলীবাঈ।

তবু ওই নিষ্পাপ তরুণটির জন্য তার মনের অতলে একটা নীরব সহানুভূতির স্পর্শ রয়ে গেছে, তার জন্য ভাবনা হয়। ও জানে না রতনবাবুর ওই মিষ্টি কথাগুলোর অতলে কি এক হিংস্র মনোবৃত্তি লুকোনো আছে, রাজাকে বলে দেবে সতর্ক হতে।

কিন্তু সে সুযোগও পায় না, নন্দ সরকার এর মধ্যে টেবিলে খাবার, মুরগীর রোস্ট, শহর থেকে আনানো চীজ দিয়ে পকৌড়া বানিয়ে এনে রাখছে।

ওদিকে রতন এখন সেই বিষের শিশিটা বের করে রাজার মদের গ্লাশে ঢেলে দেয় এদিক ওদিক চেয়ে। অনেক ভেবে চিন্তেই এ তীব্র বিষটা আনিয়েছে রতন, এতে পাকস্থলীতে বিষের চিহ্ন থাকবে না, কিন্তু বিষ ঠিকই তার কাজ করবে ধীরে ধীরে অজ্ঞান করে দেবে, আর সেই জ্ঞান কোনদিনই ফিরবে না রাজার।

তারপর রতন ওর ব্যবস্থা করে দেবে। বাগানের নিভৃত কোনে মাটির অতলে রাজা চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে, ওই বাগানের মাটির তলেই রয়েছে রাজার মায়ের মৃতদেহ,

বেশ কয়েকবছর আগে রতনই তাকে শেষ করে পুঁতে দিয়েছিল। মায়ের দেহের পাশেই রাজাকে রেখে দেবে।

রাজা বলে—সরকার মশাই, এত খাবার?

রতন ঢুকছে তার হাতে দুটো গ্লাশ। রতন বলে

—আরে খাও রাজা, কতদিন পর এলে, আজ আমাদের মিলনের দিন, তুমি আমার কত আপনজন, তাই সামান্য আয়োজন করেছি, নাও।

মদের গ্লাশটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়, রাজা বলে

—ওসব তেমন খাই না।

রতন বলে—আমিও তো খাই না এসব, মানী লোকজনদের জন্যই রাখি, খাঁটি স্কচ হে। খুশীতে একটু খেতে ইচ্ছে করল, খাও, হ্যাঁ নন্দ, ওদের নাচগানের ব্যবস্থা করতে বল। বুঝলে রাজা, গ্রামের সকলেই কত খুশী আমাদের এই মিটমাটে। তাই তারাও এসেছে বাগানে নাচগান করতে, এসো কাজলীবাঈ।

কাজলীবাঈ এগিয়ে আসে। রাজা দেখছে সেই অতীতের দেখা মেয়েটিকে, একে দেখেছিল সেদিন রাজা নদীর ধারে।

রতন বলে—রাজা, এ কাজলীবাঈ, কলকাতার নামী নাচনেওয়ালি, কাজলী এ রাজা। এই বাদাবনের মুকুটহীন রাজাই বলতে পারো, খুব ভালো ছেলে, পরোপকারী, হ্যাঁ—রাজা, বলছিলাম—ওই ভেড়ির জমি আমি ছেড়ে দোব।

রাজা শুধোয়—সত্যি।

—হ্যাঁ হে, দলিলপত্রও সবার ফেরৎ দেব, তুমিই ওদের সকলের জমি ফেরৎ দেবে। তারপর আবাদে একটা হাসপাতাল গড়ে তোলো, টাকার ব্যবস্থা আমিই করবো, তোমাকেই সব দেখা শোনা করতে হবে—

বুঝলে রাজা, তুমি আর আমি একত্রে কাজ করলে আবাদ অঞ্চলের চেহারাই বদলে যাবে, মানুষের মঙ্গল হবে।

রাজা আজ যেন রতনকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

কেদারবাবু খবরটা শোনেন গোলাবীর কাছে, তিনি জানতেন রাজা কোনদিন হয়তো রতনের ওখানে যাবার কথা ভাববে।

কেদারবাবু জানতেন হাটতলায়, না হয় তার এখানেই রাজা রতনের দেখা হবে, আলোচনা হবে, কিন্তু তড়িঘড়ি রাজা রতনের ওখানেই চলে যাবে তা ভাবেননি।

গোলাবী বলে—আজ রাতেই রাজা যাবে ওখানে মাস্টারমশাই, গঞ্জের অনেকেই থাকবে আশপাশে, তবু ওই রতনবাবুকে বিশ্বাস নাই।

কেদারবাবুও খবরটা শুনে যেন কিছু অনুমান করে নেন।

গোলাবী বলে—চলি গো।

চলে যায় গোলাবী, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কেদারবাবু রতনের এই বিশেষ আগ্রহে সন্দীহান হন, আরও একটা কথা তার মনে সংশয় আনে। কথাটা রাজা গোলাবীর মারফৎ তাকে জানিয়েছে, কিন্তু রতন এসব কথা ঘূণাক্ষরেও তাকে জানায়নি, জানাতেও চায়নি। কেদারবাবু কি ভেবে উঠে পড়েন, লাঠি আর টর্চ নিয়ে বের হতে যাবেন।

শিখা ওদিকে তার জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। বই, কাপড়চোপড় সুটকেশ পুরছে, কলকাতার ওদিকের কোন স্কুলে সে কাজ পেয়েছে, বাবারই পরিচিত সেই সোনারপুর স্কুলে এখন গার্লস সেকশন চালু হয়েছে। বাবার চিঠিতেই সেখানের সেক্রেটারী শিখাকে কাজ দিয়েছেন।

কাল সকালের লঞ্চে চলে যাবে শিখা এই আবাদ অঞ্চল ছেড়ে।

এখানে সব আকর্ষণই ফুরিয়ে গেছে, রাজার খবরও সে আর রাখার আগ্রহ বোধ করে না, শিখার মনে হয় সেই শান্ত, সৎ রাজা আজ বদলে গেছে, বাদাবনের নিষ্ঠুর নির্মমতা তাকে বদলে দিয়েছে।

আজকের এই রাজাকে শিখা চিনতে চায় না, রাজার সেদিনের প্রত্যাখান শিখার সব স্বপ্ন, ভালোবাসাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

তাই সে চলে যাচ্ছে এখানের সব সম্পর্ক মুছে দিয়ে। ওখানে থিতু হলে বাবা মাকেও নিয়ে যাবে, একদিন অপরিচিতের মত এসেছিলেন এখানে কেদারবাবু, আবার হারিয়ে যাবেন এই শ্যামপুর গঞ্জের জীবন থেকে।

এরা থাকবে এদের সংঘাত অভাব আর কষ্ট নিয়ে।

শিখা বাবাকে এই রাতে বের হতে দেখে শুধোয়,

—কোথায় চল্লে বাবা?

কেদারবাবু বলেন—একটা জরুরী কাজে বের হচ্ছি মা। কমলাদেবীও এসে গেছেন, বলেন—কি এমন জরুরী কাজ পড়লো যে এখুনিই যেতে হবে, বাঁধ এর পথ, চোখেও ভালো দ্যাখো না, ছিটকে পড়বে শেষকালে?

শিখা বলে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ ঢের তাড়িয়েছ বাবা, এবার থামো।

কেদারবাবুর সময় নেই, থানাতে গিয়ে বসন্তকে খবরটা দিতে হবে, যাতে বসন্ত দরকার হলে রাজার বিপদে সাহায্য করতে পারে, তাই কেদারবাবু বলেন—দেরী হবে না, আসছি।

বের হয়ে যান তিনি ওই অন্ধকারেই থানার উদ্দেশে।

ভেড়িপথ, একদিকে নদী, বাঁধের উপর বড় শিরীষগাছ ছায়ান্ধকার পরিবেশ গড়েছে, ওর নীচে দিয়ে টর্চের আলোয় চলেছেন কেদারবাবু, রাজার জন্য আজ সত্যি তার ভাবনা হয়, তিনিই জোর করে রাজার মত করিয়েছিলেন এই মিটমাটে।

কমলাদেবী তখন গজগজ করছেন,

—এসব হাঙ্গামায় ওকে যেতে নিষেধ করি, তবু যাবেই।

শিখা বলে—তাই বলছি মা, বাবাকে রাজী করাও, শহরেই ফিরে চলো, এখানে যতদিন চাকরী ছিল বাবা ছিলেন, আর এখন কিসের জন্য থাকা?

কমলাদেবী বলেন,

—এবার তাই ভাবছি রে, তুই যা, তারপর আমরাও চলে যাবো, কি হবে এই গাং-এর দেশে পড়ে থেকে।

রতন এর মধ্যে নিজেও তিনচার পেগ খেয়েছে, এখন বেশ গোলাবী নেশা জমছে তার, কিন্তু জাতে মাতাল হলেও রতন তালে ঠিকই থাকে। রাজার দিকে নজর রেখেছে সে সন্ধানী দৃষ্টিতে, রাজাও তিনচার পেগ মদ গিলেছে, কিন্তু অবাক হয় রতন ওই তীব্র বিষ মেশানো মদেও রাজার কিছুই হয়নি। সে স্বাভাবিক রয়েছে, ওর মধ্যে কোন বিষের লক্ষণই নাই।

ওদিকে বাগানে তখন গোলাবীর দলের নাচগান শুরু হয়েছে ওদের দলের সঙ্গে নগার ছেলেরা, নগা নিজেও এসেছে। তার নজর ওই রতনের ঘরের দিকে, রাজা ওখানেই রয়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে।

ওরা নাচতে নাচতে ওই ঘরের সামনেই এসেছে, যাতে ওরা ঘরের মধ্যেও নজর রাখতে পারে। দেখে ওরা রাজা আর রতনকে।

রতনের মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছে, বেশ বুঝেছে যে ওই বিষের শিশিতে বিষ নাই, ঘরের ভিতরে দুধ ছিল, রতন বাকী কয়েক ফোটা বিষ দুধে মিশিয়ে একটা বেড়াল বসেছিল তার দিকে এগিয়ে দেয়।

বিড়ালটাও এসে দুধটাকে শেষ করে আরামসে থাবা চাটতে থাকে। অবাক হয় রতন, বেশ বুঝেছে বিষ এতে নাই, আড়াল থেকে কাজলীবাঈও দেখে ব্যাপারটা।

রতন গজগজ করে—বিষেও ভেজাল! না বিষের বদলে কেউ জলপুরে রেখেছে?

বের হয়ে আসে সে, সময় হাতে নেই, রতন জানে এই সুযোগ আর সে পাবে না! রাজাকে আর হাতে পাবে না, বরং রাজা কেন সারা আবাদের মানুষ তার চালাকি ধরে ফেলবে আর এবার তারাই ভেড়ি কেটে লুট করে নেবে। রাজাকে শেষ করতেই হবে।

ফটিকরা আশপাশেই ছিল, রতন ওদের কাছে ডেকে বলে—রাজাকে তো হাতে পেলাম, এবার আর ওকে ছাড়া যাবে না।

রাজাও রতনকে ছটফট করতে দেখে কিছু আঁচ করেছে। এতক্ষণ ধরে রতন অনেক ভালো ভালো কথাই বলেছে, তারপর সে সব কথা শেষ হয়ে যেতে রতনের ছটফটানি শুরু হয়েছে, আর রাজার সাবধানী চোখেও সেটা ধরা পড়েছে।

রাজাও বুঝেছে সেটা, তাই রতনকে ভিতরে যেতে দেখে রাজাও তার অজান্তেই পিছনের জানলা দিয়ে বিষের শিশি আর বিড়ালকে দুধ খাওয়ানো দেখেছে। বুঝেছে ব্যাপারটা। একটা সন্দেহই হয় রাজার। সে তাই কান পেতে শোনে রতনের সঙ্গে ফটিকের কথাগুলো।

রাজা চমকে ওঠে, সে আজ শুনছে রতনের কথাগুলো। রতন ফটিকদের বলে চাপা স্বরে—ব্যাটা রাজাকে খতম করে ওই বাগানে ওর মা যেখানে পোঁতা আছে—তার পাশেই পুঁতে দে, ব্যাটার ঘুম যেন না ভাঙ্গে। খতম করে দে আজই।

ফটিক বলে—ঠিক আছে, ব্যাটাকে আজ জালে পেয়েছি এতদিন পর, আমাদের ওপরও কম জুলুম করেনি, শেষই করে দোব ওটাকে, মণ্টাদের ডাকি।

রতন বলে—তাই কর।

কাজলীবাঈও ওদিকের ঘর থেকে শুনেছে ওদের এই মতলবের কথা, সে ভেবে নিয়েছিল একটা কিছু ঘটবে, রাজাকে ওরা ছেড়ে দেবে না। কৌশলে জালে ফেলে এইভাবে গুম খুন করে দেবে তা ভাবেনি।

রাজাও ভাবনায় পড়ে।

ওদিকে বাগানে নাচগান চলেছে, নগা-গোলাবী অন্যরাও রয়েছে, ওরাও অনুমান করে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে।

রাজাও বের হয়ে এসেছে বারান্দায়, ফটিকরা ভাবে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই তারাও ঘিরে ফেলে রাজাকে, আর নগার দলও এবার গান নাচ ছেড়ে স্বমূর্তি ধরে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ফটিকরা ভাবেনি যে রাজার সঙ্গে ওইভাবে ওরাও এসে ঢুকবে বাগানে, এবার নগারাই উলটে চড়াও হয় ফটিকের দলের উপর। ফটিকরা দলে কম, ফলে নগা, জগার দলের মারের চোটে তাদেরও অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে।

রাজাও ওদের আসল উদ্দেশ্য জানতে পেরে আজ নির্মম হয়ে ওঠে। রতনকেই ধরেছে সে। রাজা গর্জায় —শয়তানি করতে গেছলে রাজার সঙ্গে?

রতন আজ বিপন্ন, রাজা তার ঘরে এসেই তার দলবল এমনকি রতনবাবুকেও নির্দয়ভাবে প্রহার করছে, ছিটকে পড়েছে রতন।

কাজলীবাঈও স্তব্ধ, নির্বাক দর্শকের মত দেখছে সে, আহত রতন বুঝেছে রাজাই এবার তাকে শেষ করবে, শিকার করতে গিয়ে শিকারীরই এখন প্রাণ সংশয়।

রতন তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যই রিভলবারটা কোনমতে বের করে ড্রয়ার থেকে, টলছে সে—রাজা ওর হাতে রিভলবার দেখে থেমে যায়। থেমে যায় নগার দলও।

রতন গর্জে ওঠে, তোমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখে নিজের অনেক সর্বনাশ

করেছি, আর না, রাজা, আজ তোর শেষ দিন, রতন নস্কর কোনদিন মাথা নীচু করেনি করবে না, বাদাবনের সেই হবে শের—

রতন গুলি করেছে অসহায় রাজাকে লক্ষ্য করে, চীৎকার করে ওঠে নগা,—রাজা

রাজার চোখের সামনে মৃত্যুর পদধ্বনি, রিভলবারের শব্দ—দেখে সামনে এসে পড়েছে ওই কাজলীবাঈ, রাজাকে আড়াল করতে গিয়ে গুলিটা ওর বুকেই লাগে।

নগাও ততক্ষণে লাফ দিয়ে এসে ধরেছে রতনকে।

রাজা ধরে ফেলে আহত নাচনেওলিকে, একদিন তাকেই সে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করেছিল, যা তা বলেছিল সেই নাচনেওলীই আজ ওকে বাঁচিয়েছে।

মেয়েটাকে ধরে ফেলে রাজা, রক্ত ঝরছে—আর মেয়েটার গলার হারের লকেটা এসে পড়ে রাজার হাতে। ধাতব স্পর্শে চমকে ওঠে রাজা।

এই হার, এই লকেট তার খুব চেনা। ছোটবেলার স্কুলের বৃত্তি পাবার পর রাজা সেই পয়সাতে হাটতলা থেকে তার বোন কলিকে এই হার কিনে দিয়েছিল, ছোট্ট মেয়েটা খুশীতে উচ্ছল হয়ে বলেছিল,

—এই হারটা চিরকালই পরে থাকবো দাদা, সুন্দর হার। তারপর কলিও হারিয়ে গেছল, আর তার কোন খবরই পায়নি রাজা।

আজ এতদিন পর ওর গলায় সেই হার দেখেই চীৎকার করে ওঠে রাজা,

—কলি! কলি! তুই!

কাজলীবাঈ আজ অস্ফুট কণ্ঠে বলে

—দাদা! দাদা—

—কলি! আজ রাজার চোখে জল, আহত কলির বেদনা ক্লিষ্ট মুখে ম্লান হাসি, এতদিন পর আজ দাদাও তাকে চিনেছে জেনেছে কাজলীবাঈ ও নয়—এ তার হারানো বোনই

—এ কি!

হঠাৎ জোরালো টর্চের আলো, বুটের শব্দ চাইল রতনবাবু, দারোগা বসন্তবাবু কেদারবাবুর কাছে খবর পেয়ে তিনিও এতে কিছু সন্দেহের গন্ধ পান।

তাই দলবল নিয়ে তৈরী হয়েই এসেছেন রতনবাবুর বাগানে, রিভলবারের শব্দ শুনে এসে দেখেন রতনের হাতে রিভলবার, এরা তা কেড়ে নিচ্ছে কিন্তু তারমধ্যেই ও কাজলীবাঈ-এর বুকে গুলি লেগেছে, মারাত্মক আহত সে।

কেদারবাবুও এসেছেন, রাজা বলে

—দেখুন মাস্টারমশাই, কেমন রাজার সঙ্গে মিটমাট করে গঞ্জের মানুষের ভালো করতে চেয়েছিল ওই শয়তান রতন নস্কর, আসলে আমাকে শেষ করার জন্যই জাল পেতেছিল, আর দারোগাবাবু, ও আমার বাবাকে মেরেছে, মাকে মেরে এই বাগানে পুঁতেছে, তার পাশে আমাকে শেষ করে পুঁতে দেবার আয়োজনও করেছিল। পারেনি

গবে মাস্টারমশাই, এই আমার হারানো বোন কলি, ও গুলিতে প্রাণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে গেল।

দেখুন মাস্টারমশাই—দেখুন রতন নস্করের কীর্তি।

রতন কি বলার চেষ্টা করে।

নগা বলে—বাগানের ওদিকে রাজাকে পুঁতবার জন্য গর্তও খোঁড়া হয়েছে হুজুর, দেখুন গে।

কেদারবাবু অবাক, নিজের চোখে দেখেছেন তিনি রতনের শয়তানির পরিচয়, বলেন তিনি।

—তুমি আমাকেও মিথ্যা কথা বলে রাজাকে হাতে পেতে চেয়েছিলে রতন! ছিঃ ছিঃ! কিন্তু ভুলে গেছলে সব অন্যায়ের শেষ একদিন হয়ই, সব রাত্রিরই শেষ হয়, অন্ধকার মুছে আলো জাগে।

বসন্তবাবু আজ বুঝেছেন রতনবাবুর সব কীর্তিকলাপ। ওদের সব কটাকে আটকে গুদাম সার্চ করে বের হয় প্রচুর বিদেশী মাল, আর বেশ কিছু বিদেশী বন্দুক রিভলবারও। এসব অস্ত্রের চোরকারবার করতো লোকটা, বাইরে বিক্রী করতো প্রচুর দামে।

বাগানের মাটির তলে সেই কঙ্কালের নিশানাও পাওয়া গেছে। বসন্তবাবু বলেন

—এতদিন পর তোমার খেল খতম হয়েছে রতনবাবু।

রাত্রি শেষ হবার আগেই সারা গঞ্জে, সারা আবাদের মানুষ, ছেলেমেয়েরা ভিড় করে আসে।

রতনবাবুর রাজত্ব এখানে যে কোনদিন শেষ হবে তা এরা ভাবেনি, রাজা আসাতে এরা কিছু আশার আলো দেখেছিল, কিন্তু তাকেও চলে যেতে হয়।

ফলে এদের মনে ওই ধারনাটাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে রতনবাবু এখানে এইভাবেই অন্যায় অত্যাচার চালাবে, জুলুম এর রাজত্ব চালিয়ে যাবে চিরকালই।

কিন্তু ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে।

হাটতলা গ্রাম আশপাশের গ্রাম বসত থেকে ছুটে এসেছে মানুষজন, থানার চারিদিকে জটলা। রতনবাবুদের দেখার জন্য জনতা উদগ্রীব, বসন্তবাবু ওদের কেসপত্র লিখিয়ে সদরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছেন এই সকালের লঞ্চেই।

কেদারবাবু পথ চেয়ে বসে আছেন কমলাদেবী, শিখা।

—এখনও ফিরল না, এত রাত হয়ে গেল।

শিখাও ভাবছে, এমন সময় মহেশ, নিতাইদের সঙ্গে কেদারবাবুকে ফিরতে দেখে বের হয়ে আসে ওরা, গোলাবীও রয়েছে।

—কি ব্যাপার? কমলাদেবী শুধোয়—এত দেরী! এবার গোলাবীই বলে

—এতদিন পর কংস বধ হলো গো। শ্যামপুর গঞ্জের মানুষ এবার সুদিনের মুখ

দেখবে। তবে রাজার বোনটাকেও শেষ করে গেল।

—মানে!

গোলাবী এবার তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সব ঘটনাটাই বিবৃত করে। কেদারবাবু বলেন

—রতনকে চিনেছিল রাজাই, আমাকেও সে মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়ে রাজাকে শেষ করতে চেয়েছিল, ওর বাবাকেও মেরেছিল ওই, ওর মাকেও খুন করে পুঁতে রেখেছিল বাগানে, আর রাজার বোনটা—

—সে তো হারিয়ে গেছল! কমলাদেবী বলেন।

—না, সে ওই নাচলেওয়ালী মেয়েটাই। গাং-এর জলে পড়ে গেছল সেই রাতে, কারা তুলে নিয়ে গেছল, সেই কলিই নাচনেওয়ালী হয়েছিল। আজ তাকেও শেষ করেছে রতন। রাজার সব হারিয়ে গেল আজ।

শিখা শুনছে কথাগুলো, কি ভাবছে সে, রাজা তাহলে ঠিকই বলেছিল, ওই নর-পিশাচের হাত থেকে সে এখানের মানুষদের বাঁচিয়েছে হারিয়ে গেছে তার সব কিছু।

গোলাবী বলে—ছেলেটার কি বরাত গো, তিনকুলে কেউ নাই, হারানো বোনটাকে পেল, তাকেও শেষ করলো শয়তান। অভাগা, ওর মত অভাগা আর কেউ নাই গো।

শিখা ভিতরে চলে গেল, তার মনের অতলে যেন একটা ঝড় উঠেছে।

রাত কেটে যায় নানা ভাবনায়। সকালে লঞ্চঘাটে জনতার ভিড়, লঞ্চ ছাড়তে দেরী নাই, যাত্রীরাও লঞ্চে উঠেছে, পথে পুলিশের কড়া বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা করে আসছে ওই রতনবাবু পিছনে ফটিক, মণ্টার দল।

বসন্তবাবু ওদের সদরে নিয়ে চলেছেন, ওদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, আর সেই সব থেকে মুক্তির কোন আশাই নেই তাও বুঝেছে রতনবাবু।

লোকজন এর কণ্ঠ এখন সোচ্চার, রতনবাবু দেখেছে ওদের চোখে কি তীব্র ঘৃণা। পুলিশ না থাকলে জনতাই ওকে এর যোগ্য শাস্তি দিত, এতদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ আজ ওদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে।

গঞ্জ থেকে সকালে দুখানা লঞ্চ ছাড়ে, একটা যায় এখানের মহকুমা শহর বসিরহাটে, অন্যটা যায় ক্যানিং, কলকাতার যাত্রীরা ওই ক্যানিং এর লঞ্চেই যায়, ওইদিকে তাড়াতাড়ি ট্রেনে কলকাতা পৌছানো যায়।

বসিরহাটের লঞ্চে তুলে বসন্তবাবু রতনদের নিয়ে চলে গেলেন, লঞ্চ ঘাটের জনতা ক্রমশঃ হালকা হয়ে যায়।

এবার ঘাট ফাঁকা, ক্যানিংএর লঞ্চে যাত্রীরা উঠছে, দেখা যায় কেদারবাবু, কমলাদেবীও এসেছেন, শিখা চলে যাচ্ছে এখান থেকে।

এবার গঞ্জে শান্তি ফিরেছে, মানুষজন সবাই খুশী। রাজার কাজ শেষ, নগাও রয়েছে

আজ রাজার কেউ নাই। নগা বলে,

—রাজ, চল।

রাজা বলে—কোথায় যাবো? চল বাদাবনেই ফিরে চল।

চাইল নগা—সেকি, এখন গঞ্জেই থাকবি, বাড়ি ঘর তোল।

—বাড়ি! যার কেউ নাই, কিছুই নাই, ডাকাতির বদনাম যার মাথায় তার মানুষের জগতে ঠাঁই হয় না রে। নগা তুই না যাস—আমিই ফিরে যাবো, তোরা সুখী হ, শান্তিতে থাক।

রাজা নৌকার দিকে এগোবে।

হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল, শিখা এগিয়ে আসছে।

—তুমি! রাজা অবাক হয় ওকে দেখে, বলে—তুমি তো চাকরী নিয়ে কলকাতা চলে যাচ্ছো, তাই যাও শিখা।

শিখা তার মনস্থির করে ফেলেছে।

ওই রাজার উপর এতদিন ভুল বুঝে একটা মস্ত অবিচারই করেছিল, আঘাতও দিয়েছিল বার বার। রাজা তার কোন প্রতিবাদও করেনি, কিছু চায়নি তার কাছে।

শিখা দেখেছে একটি সম্পূর্ণ মানুষকে, দুঃখ বেদনা যাকে পুড়িয়ে খাঁটি সোনায় পরিণত করেছে, তাই আজ সে এগিয়ে আসে রাজার দিকে। বলে

—আমার যাওয়া আর হবে না রাজা, গঞ্জের মানুষের রাহুমুক্তির যে নায়ক তাকে চিনতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করো রাজা।

রাজা অবাক হয়—কি বলছো শিখা, আমি একটা ডাকাত!

—না-না রাজা! আসল মানুষকে চিনতে পারিনি, আজ চিনেছি, তাই এই গঞ্জ ছেড়ে আর যাবো না রাজা, যেতে পারবো না।

লঞ্চটা ছাড়বার ভোঁ দিচ্ছে, যাত্রীরা সবাই উঠে গেছে, ওঠেনি শুধু একজন—সে শিখা।

লঞ্চটা চলে গেল, দূরে—নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেল, তখনও শূন্য জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে রাজা আর শিখা।

শিখা বলে—চলো, ঘরে চলো।

—ঘর! রাজা অবাক হয়—আমার ঘর!

শিখা বলে—আবার সব পেয়ে নতুন করে বাঁচবে রাজা। বাঁচবো আমরা সবাই একসঙ্গে এই নতুন পরিবেশে।

চলেছে ওরা, আজ বহুদিন পর বাতাসে ফুলের সুবাসের সন্ধান পায় রাজা, শিরীষ গাছের পাতা ছাপিয়ে সাদা গোলাপী চন্দন রং-এর ফুলগুলো ফুটেছে। অজস্র ফুল। তারই সৌরভে জাগে আকাশে বাতাসে।